বাংলাদেশ
এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা

ISSN 1609-4409

বিয়াল্লিশতম খণ্ড	শীত সংখ্যা	পৌষ ১৪৩১/ডিসেম্বর ২০২৪

সম্পাদক
ভীষ্মদেব চৌধুরী

সহযোগী সম্পাদক
সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ
৫ পুরাতন সচিবালয় রোড (নিমতলী)
রমনা, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ

সম্পাদকীয় পর্ষৎ

সভাপতি	:	অধ্যাপক ইয়ারুল কবির
সম্পাদক	:	অধ্যাপক ভীষ্মদেব চৌধুরী
সহযোগী সম্পাদক	:	অধ্যাপক সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ
সদস্য	:	অধ্যাপক আবদুল বাছির
		অধ্যাপক শুচিতা শরমিন
		অধ্যাপক মোহাম্মদ সেলিম

মূল্য	:	২০০.০০ টাকা
Price	:	Tk. 200.00
		US$ 10.00

প্রকাশক	:	সাধারণ সম্পাদক
		বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

Bangladesh Asiatic Society Patrika (Bengali Journal of the Asiatic Society of Bangladesh) edited by Professor Bhishmadeb Choudhury, published by Professor M. Siddiqur Rahman Khan, General Secretary, The Asiatic Society of Bangladesh, 5, Old Secretariat Road, Nimtali, Ramna, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 02-9513783, E-mail: asbpublication@gmail.com

সূচিপত্র

কাজী নজরুল ইসলামের নন্দনতাত্ত্বিক দর্শন
মুনিরা সুলতানা ১৭১

পূর্ববাংলায় লবণ সংকট (১৯৫০-১৯৫১)
সাজেদা বেগম ১৮৭

অবাচনিক সাংস্কৃতিক ট্যাবু : সমাজ প্রভাবিত প্রজ্ঞানমূলক আচরণ বিশ্লেষণ
নাদিয়া নন্দিতা ইসলাম ২০৩

রবীন্দ্রনাথের 'ঠাকুরদা' ও বাউলদর্শন
মাহফুজা হিলালী ২১৯

শহীদুল জহিরের *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল* : উত্তর-আধুনিক পাঠ
নিপা জাহান ২৩৩

শাহীন আখতারের ছোটগল্প: নারীর স্বর ও স্বরায়ণ
খন্দকার ফারহানা রহমান ২৪৭

শিশুদের অঙ্কন বিশ্লেষণ : বোধ ও সৃজনশীলতার পারস্পরিক সম্পর্ক অন্বেষণ
জেনিফার জাহান ২৭৩

***রসপুরাণ* : অষ্টবিধ নাট্যরসে প্রযোজনা নিরীক্ষা**
আহমেদুল কবির ২৮৯

গ্রন্থ-পর্যালোচনা

মুহম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক, *নিদ্রিত শিলার মুখরিত লিপি : বাংলায় আরবী-ফার্সী*
ওয়াকিল আহমদ ৩১১

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকায় এশিয়ার সমাজ, ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে রচিত মৌলিক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধকারদের জ্ঞাতার্থে পত্রিকায় প্রবন্ধ জমা দেওয়ার নিয়মাবলি নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য এক কপি পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে জমা দিতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজ করার নিয়ম নিম্নরূপ:
   - বাংলা বিজয় সফট্ওয়্যারের সুতন্বি-এমজে ফন্টে প্রবন্ধটি কম্পোজ করতে হবে। প্রবন্ধটির মোট শব্দসংখ্যা ৩০০০ থেকে ৫০০০-এর মধ্যে সীমিত হতে হবে;
   - কাগজের সাইজ হবে A4। প্রতি পৃষ্ঠায় মার্জিন থাকবে উপরে ১.৫ ইঞ্চি, নিচে ১.৫ ইঞ্চি, ডানে ১.৫ ইঞ্চি এবং বামে ১.৬ ইঞ্চি।

২. প্রবন্ধের সাথে প্রবন্ধকারের পেশাগত পরিচয় ও ঠিকানা জানিয়ে এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে যে:
   - জমাকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি;
   - এটি একটি মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ;
   - প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোনো পত্রিকা বা গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেওয়া হয়নি;
   - এই প্রবন্ধে প্রকাশিত মতের সকল দায়িত্ব লেখক বহন করবেন।

৩. প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে প্রবন্ধকার পত্রিকার একটি কপি ও প্রকাশিত প্রবন্ধের দশ কপি অফপ্রিন্ট বিনা মূল্যে পাবেন।

৪. কোনো প্রবন্ধ প্রকাশের বিষয়ে সম্পাদনা পর্ষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

৫. বাংলা একাডেমির *প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম* অনুসরণে অথবা *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, *চলন্তিকা* প্রভৃতি অভিধানের বানান অনুযায়ী প্রবন্ধটি রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোনো ভুক্তিতে (entry) একাধিক শীর্ষশব্দ (headword) থাকলে প্রথমটির বানান গ্রহণ করতে হবে। তবে গবেষক কোনো বিশেষ বানান-বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তাও অক্ষুণ্ন রাখা যাবে।

৬. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না।

৭. প্রবন্ধের শেষে টীকা ও তথ্যনির্দেশ সংখ্যানুক্রমে উপস্থাপন করতে হবে। মূল পাঠের মধ্যে টীকা ও তথ্যনির্দেশ সংখ্যা সুপারস্ক্রিপ্টে (যেমন বাংলাদেশ[১]) ব্যবহার করাই নিয়ম।

৮. মূলপাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি তিন লাইনের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উপস্থাপন করতে হবে। কবিতার উদ্ধৃতিতে মূলের পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস রক্ষা করতে হবে।

৯. তথ্যনির্দেশের ক্ষেত্রে লেখকের পূর্ণ নাম, বইয়ের নাম, প্রকাশস্থান, প্রকাশক, প্রকাশকাল এবং পৃষ্ঠা নম্বরের উল্লেখ করতে হবে।

১০. বই ও পত্রিকার নাম বাঁকা (italics) অক্ষরে হবে (যেমন, বই : *বৃহৎ বঙ্গ;* পত্রিকা : *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*)।

১১. প্রবন্ধের সূচনায় একটি সারসংক্ষেপ অবশ্যই দিতে হবে। আনুমানিক ২০০ শব্দের সারসংক্ষেপ এবং চাবি শব্দ (Key word) (৩-৭টি) থাকতে হবে।

১২. একাধিক লেখকের নামযুক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য গ্রহণ করা হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: পাণ্ডুলিপির সঙ্গে পৃথক পৃষ্ঠায় বাংলা ও ইংরেজিতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সংযোজনী হিসেবে জমা দিতে হবে:

(ক) প্রবন্ধের শিরোনাম, (খ) সারসংক্ষেপ, (গ) চাবি শব্দ, (ঘ) সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি।

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

কাউন্সিল : ২০২৪ ও ২০২৫

সভাপতি	:	অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ
সহ-সভাপতি	:	অধ্যাপক হাফিজা খাতুন অধ্যাপক সাজাহান মিয়া অধ্যাপক ইয়ারুল কবির
কোষাধ্যক্ষ	:	ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ
সাধারণ সম্পাদক	:	অধ্যাপক মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান
সম্পাদক	:	অধ্যাপক মো. আবদুর রহিম
সদস্য	:	অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন (ফেলো) ব্যরিস্টার শফিক আহমেদ (ফেলো) অধ্যাপক এ কে এম গোলাম রব্বানী অধ্যাপক মাহবুবা নাসরীন অধ্যাপক মোঃ লুৎফর রহমান অধ্যাপক সাদেকা হালিম অধ্যাপক আশা ইসলাম নাঈম অধ্যাপক আবদুল বাছির অধ্যাপক নাজমা খান মজলিশ অধ্যাপক মো. আবদুল করিম অধ্যাপক শুচিতা শরমিন অধ্যাপক সাব্বীর আহমেদ

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বিয়াল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩১/ডিসেম্বর ২০২৪

কাজী নজরুল ইসলামের নন্দনতাত্ত্বিক দর্শন

মুনিরা সুলতানা*

সারসংক্ষেপ

নন্দনতত্ত্ব মূলত দর্শনেরই একটি প্রাচীন শাখা। নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসায় সৃজন, সৌন্দর্য ইত্যাদি বিষয়ক ধারণা ও তার বৈচিত্র্য রয়েছে। প্রত্যেক শিল্পীর স্বতন্ত্র নান্দনিক চেতনা এই বৈচিত্র্যের মুখ্য কারণ। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সৃষ্টিজগতের মধ্য দিয়ে নির্মাণ করেছেন এক স্বতন্ত্র নন্দনতাত্ত্বিক দর্শন। প্রসঙ্গক্রমে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য নন্দনতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা উপস্থাপিত হয়েছে এখানে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পভাবনার ক্রম-উৎকর্ষ ও রূপান্তরের ইতিহাসের সাথে কাজী নজরুল ইসলামের নন্দনভাবনার সম্পর্ক কিংবা বিলগ্নতার অধ্যয়ন এই প্রবন্ধের অন্যতম অন্বেষা। সেই সঙ্গে নজরুলের নন্দনচিন্তার স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য অনুসন্ধানও এ রচনার লক্ষ্য।

চাবি শব্দ: কাজী নজরুল ইসলাম, নন্দনতত্ত্ব, দর্শন, শিল্প, সমাজ, মানববাদ, উত্তর-উপনিবেশবাদ।

সৌন্দর্যতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্ন শিল্পাঙ্গিকের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নকেই নন্দনতত্ত্ব বলে। ইংরেজি 'Aesthetics'-কে সৌন্দর্যতত্ত্ব বা 'সৌন্দর্যের বিজ্ঞান' বলা হয়েছে। কিন্তু 'নন্দনতত্ত্ব' শব্দটি 'Aesthetics' কিংবা 'Poetics'-এর ভাবানুবাদ কিনা এ বিষয়ে ঐকমত্য নেই। 'অক্সফোর্ড ডিকশনারি' বা 'অক্সফোর্ড ল্যাঙ্গুয়েজেস'-এর সূত্র[১] অনুযায়ী 'Aesthetics' শব্দটি গ্রিক শব্দ 'Aisthetikos' থেকে এসেছে, যার আদি রূপ ছিল 'Aisthesthei' (ইংরেজি perceive অর্থে), পরবর্তীকালে যথাক্রমে 'Aisthēta' (perceptible things) এবং 'Aisthetikos' (perception by sense); সুতরাং ইন্দ্রিয়-উপলব্ধি, সৌন্দর্য ও আনন্দ অনুভব, কিংবা কান্তিবিদ্যাসম্বন্ধীয় জ্ঞানই এস্থেটিকের মর্মকথা। 'সৌন্দর্য' কী এ বিষয়ক বিচার যথেষ্ট প্রাচীন[২] এবং তা দর্শনেরও একটি বড় প্রসঙ্গ। সুন্দরের ধারণায় যুক্ত হয়েছে সত্য ও মঙ্গল বিষয়ক বিশ্লেষণ। কিন্তু এ বিষয়ক জিজ্ঞাসা মীমাংসিত না হয়ে বরং জন্ম দিয়েছে নন্দনতত্ত্বের কিছু দার্শনিক সমস্যার। যেমন– যা সুন্দর তা 'সাবলাইম' কিনা; যা অপূর্ব বা মহোত্তম তা লোকোত্তর কিনা, যা লোকোত্তর তা উপযোগী কিনা; যা উপযোগী তা সত্য কিনা ইত্যাদি। ইংরেজ তাত্ত্বিক রেমন্ড উইলিয়ামস্ (১৯২১-১৯৮৮) তাঁর *Keywords: a Vocabulary of Culture and Society* (১৯৭৬) গ্রন্থে মত প্রকাশ করেন যে, 'Aesthetics' শব্দটি ইংরেজি ভাষায় উনিশ শতকেই প্রথম দেখা দেয়, তার আগে এর প্রচলন

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ছিল না, ল্যাটিনে আলেকজান্ডার বাউমগার্টেন (১৭১৪-৬২) *Aesthetica* (১৭৫০) নামে দু খণ্ডের একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর ঐতিহাসিক গুরুত্ব হলো তিনি 'Aesthetics' শব্দটিকে প্রথম প্রয়োগ করেছেন। রেমন্ড উইলিয়াম্ বলেন যে, 'Aesthetics' শব্দটি শিল্পের কখনও দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রতিমার, কখনো অসাধারণ এবং সুন্দরের বিশেষ রেফারেন্স হিসেবে ইতিহাসের বিভিন্ন মুহূর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। এরই সঙ্গে শব্দটি গুরুত্ব দিয়েছে মন্ময়তাকে, মন্ময় অনুভূতির সক্রিয়তাকে শিল্প ও সৌন্দর্যের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করে এ দুটোকে তার সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যান থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে।[৩] আধুনিক চৈতন্যে শিল্প আর সমাজের মধ্যে যে বিরোধ, দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য তৈরি হয়, তার মূলেও 'Aesthtic' শব্দের বিশেষ ঐতিহাসিক কার্যকারণ জড়িত। উনিশ শতকে নান্দনিকতাবাদ মূলত আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে।

ক.

শিল্প বা সাহিত্য কী, কী এর সৃজন প্রক্রিয়া, এটা কি কেবল আবেগের অভিব্যক্তি নাকি ইতিহাস, বুদ্ধিবৃত্তি ও মননের সংযোগ, এর উদ্দেশ্যই বা কী, শিল্পের সাথে সৌন্দর্যসৃষ্টির কী সম্পর্ক– এসব জিজ্ঞাসা ঘিরে বস্তুবাদী ও ভাববাদী বিভিন্ন মতাদর্শ বিকশিত হয়েছে। নন্দনতত্ত্বে রোমান্টিকতা ও কলাকৈবল্যের ধারণা প্রযুক্ত হয় আঠারো-উনিশ শতকে ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের রচনায়। বিশেষত উইলিয়াম ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০), স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ (১৭৭২-১৮৩৪), শেলী (১৭৯২-১৮২২), জন কিট্স (১৭৯৫-১৮২১) প্রমুখের রচনায় শিল্প-সাহিত্য বিশেষত কবিতা বিষয়ক বোধ প্রকাশিত হয়েছে। রোমান্টিক শিল্পতত্ত্বের মধ্য দিয়ে আঠারো শতকের নব্য-ধ্রুপদী নন্দনভাবনা[৪] ও যুক্তি-বুদ্ধি-প্রকরণশাসিত নগরজীবন-নির্ভর কাব্য-কবিতার বিরুদ্ধে আবেগ ও হৃদয়বৃত্তির এক দ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। কবিতা বা শিল্পকর্মকে কেবল বাহ্যিক ও প্রাকরণিক গুণাগুণের নিরিখে বিচার করার বদলে সৃজনের রহস্যপ্রক্রিয়া ও তার উদ্দেশ্য নিয়ে অনুসন্ধানে উদ্যোগী হয়েছিলেন রোমান্টিক কাব্যান্দোলনের প্রবক্তারা। শিল্পসৃজনকে মানুষের জীবনের আদ্য প্রেরণা হিসেবেও চিহ্নিত করেন তাঁরা। ইংল্যান্ডে নান্দনিকতাবাদের যে উত্থান ঘটে, তা মূলত ফরাসি প্রভাব ও দেশজ চিন্তাধারার ফল। নান্দনিকতাবাদের মূল প্রত্যয় ছিল শিল্পকলা হবে বিশুদ্ধ– শিল্প উপভোগ ও বিবেচনার ক্ষেত্রে জীবন, নৈতিকতা ধর্ম ইত্যাদি প্রসঙ্গের উল্লেখ অবান্তর। ভিক্টোরীয় পর্বের শেষে ইংরেজ কবি সুইনবার্ন (১৮৩৭-১৯০৯) 'শিল্পের জন্য শিল্প' মতবাদে দীক্ষিত ও প্রতিশ্রুত ছিলেন। ফরাসি কবি শার্ল বোদলেয়ার (১৮২১-১৮৬৭) সুইনবার্নকে প্রভাবিত করেছিলেন। উনিশ শতকের শেষে ফ্রান্সের চিত্র অন্দোলন, রাশিয়া ও বেলজিয়ামের কবিতা ও অন্যান্য শিল্প-সংস্কৃতির উৎস ছিল প্রতীকবাদ। ১৮৬০ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে ফরাসি প্রতীকবাদী নান্দনিকতাকে স্টিফেন মালার্মে (১৮৪২-১৮৯৮) ও পল ভারলেইন (১৮৪৪-১৮৯৬) উচ্চমাত্রায় নিয়ে যান। প্রতীকবাদী কবিদের ওপরে বোদলেয়ারের প্রভাবও ছিল গভীর।

ভিক্টোরীয় যুগের রোমান্টিক কাব্যধারা থেকে উত্তরিত আধুনিকতাবাদী নন্দনসূত্র নির্মাণ করেন টি এস এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫)। যেখানে আবেগসর্বস্ব গীতিধর্মিতা থেকে আবেগ-নিরপেক্ষ

নৈর্ব্যক্তিকতায় উত্তীর্ণ হয় শিল্পতত্ত্ব। তাঁর মতে, শিল্পের নৈর্ব্যক্তিকতার সাথে জীবনের অন্তর্গত দাহন যুক্ত হয়ে শিল্পীকে দিয়ে সৃষ্টি করায় ('The man who suffers and the man who creates')। এছাড়া এলিয়টের দৃষ্টিতে 'common speech' (কাব্যে বিপ্লব ও এর যুগচিহ্ন প্রসঙ্গ) আসলে 'colloquial form' যা কাব্যকে 'আধুনিক' অভিধায় অভিহিত করতে সাহায্য করে। 'কাব্যকে এলিয়ট অন্বিত করেন এক সামগ্রিক চিরন্তন সৃষ্টিচক্রের সঙ্গে, যাকে তিনি অভিহিত করেছিলেন কবি বা স্রষ্টার ইতিহাস-চেতনা রূপে।'[৫]

নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক জিজ্ঞাসা দর্শনশাস্ত্রেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে বিবেচিত। এ পর্যায়ে ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬), ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪), ফ্রেডরিক হেগেল (১৭৭০-১৮৩১), ফ্রেডরিক শেলিঙ (১৭৭৫-১৮৫৪), রমা রঁলা (১৮৬৬-১৯৪৪) প্রমুখের নাম উল্লেখ্য। বিশ শতকে নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যতত্ত্ব বিষয়ে যাঁর মত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, তিনি বেনেদিতো ক্রোচে (১৮৬৬-১৯৫২)। ক্রোচে প্রকাশবাদ বা অভিব্যক্তিবাদকে নন্দনতত্ত্বে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আর এই অভিব্যক্তির সঙ্গে ভাষার যোগ অবিচ্ছেদ্য। ক্রোচের দর্শন সজ্ঞা বা অনুভূতিমূলক (intuitive), তাঁর মতে সৌন্দর্যের উপলব্ধি নির্ভর করে সজ্ঞার ওপর।

শিল্পসাহিত্যের নন্দনতত্ত্ব নিয়ে মার্কসবাদীদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মতামত বহুল আলোচিত বিষয়। শিল্পকলার সাথে সমাজ ও শ্রেণিস্বার্থের সম্পর্ক নির্ধারণ করা মার্কসীয় সমালোচনা-শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মার্কসবাদীর কাছে শিল্পসৃষ্টি উদ্দেশ্যনিরপেক্ষ নয়। তাই শিল্প সাহিত্যপাঠের মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে আধার বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত জরুরি। যে আধার নির্মিত হয় তিনটি উপাদানের জটিল দ্বান্দ্বিক সংমিশ্রণে– সাহিত্য-আঙ্গিকের বিবর্তনের আপেক্ষিক স্বায়ত্তশাসন, আধিপত্যশীল ভাবাদর্শগত কাঠামো এবং লেখক-পাঠকের পারস্পরিক সম্পর্ক। প্লেখানভ (১৮৫৬-১৯১৮), লেনিন (১৮৭০-১৯২৪), লুনাচারস্কি (১৮৭৫-১৯৩৩), ট্রটস্কি (১৮৭৯-১৯৪০), গিওর্গি লুকাচ (১৮৮৫-১৯৭১), মাও সে তুং (১৮৯৩-১৯৭৬), বাখ্‌তিন (১৮৯৫-১৯৭৫), ব্রেখট (১৮৯৮-১৯৫৬), থিয়োডর অ্যাডোর্নো (১৯০৩-১৯৬৯), ক্রিস্টোফার কডওয়েল (১৯০৭-১৯৩৭), লুসিয়েন গোল্ডম্যান (১৯১৩-১৯৭০), লুই আলথুসার (১৯১৮-১৯৯০), টেরি ইগলটন (১৯৪৩) প্রমুখের নাম মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। লুকাচের নন্দনতাত্ত্বিক ভাবনা মার্কসবাদী শিল্পতত্ত্বে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে, যার মূল সূত্র হলো– সাহিত্য ব্যক্তির জীবনসাধনা হওয়া সত্ত্বেও নান্দনিকতা মূলত সাহিত্যে ব্যক্তিসত্তা ও সর্বজনীন সত্তার মধ্যে অপরিহার্য যোগসূত্র, সমাজ তার প্রেক্ষাপট। মার্কসবাদী দর্শন ইউরোপের দেশে দেশে বিশিষ্ট তাত্ত্বিকদের দৃষ্টিতে নানা চারিত্র্যে প্রকাশিত হয়েছে। তবে শিল্পের সৃজন ও বিচারে মার্কসবাদী চিন্তার প্রধান গুরুত্ব এই যে, এ পর্যায়ে সমাজ পরিবর্তনে সাহিত্যের ভূমিকা সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে এবং সমাজ ও ইতিহাস দ্বান্দ্বিক বাস্তবতার পটভূমিতে রেখে সাহিত্য মূল্যায়ন করার রীতিটি জনপ্রিয় হয়।

শিল্পকলা আসলে (প্রত্যক্ষ) অভিজ্ঞতার বিজ্ঞান– এই সূত্রে বিশ শতকের নন্দনতত্ত্ব বিকশিত হয়েছে। নতুন চৈতন্যের আধার হচ্ছে আধুনিক বা উত্তরাধুনিক শিল্পচর্চা। শব্দ, অবয়ব, সংগঠন,

অধিবিদ্যামূলক ডিসকোর্স, বিনির্মাণ ব্যাখ্যান কিংবা প্রতিব্যাখ্যান সমকালীন শিল্পচিন্তার গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। বিশ শতকের নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে সমালোচক বলেন:

> নন্দনতত্ত্বে বিংশ শতকের দিকনির্দেশ ... অন্য যে কোনো কিছুর চেয়ে বেশি শব্দার্থগত দিকনির্দেশনা হয়ে উঠেছে। তবে আমরা যেমন লক্ষ করেছি, চিহ্ন ও প্রতীকের তত্ত্বগুলি যুক্ত হয়েছে বা ব্যবহার করেছে এখন বিজ্ঞান ... যা মূলত প্রত্যক্ষবাদী, যৌক্তিক এবং সহজাত প্রবণতার।[৬]

ভাষার এক গতিময় উৎপাদনশীলতা গুরুত্ব পেয়েছে বিশ শতকের উত্তরপর্বের শিল্প-সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনায়। পূর্বের আধুনিক জ্ঞানতত্ত্বের অনেক দিকই এ পর্যায়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। রোলা বার্থ (১৯১৫-১৯৮০), লিওতার্দ (১৯২৪-১৯৯৮), মিশেল ফুকো (১৯২৬-১৯৮৪), জ্যা বদ্রিয়ার (১৯২৯-২০০৭) ও জ্যাক দেরিদাসহ (১৯৩০-২০০৪) অনেক তাত্ত্বিক তাদের বয়ানের মধ্য দিয়ে শিল্প-সাহিত্য, স্থাপন বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, নৃ-বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্বসহ নানা বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করেছেন। এ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ইন্টারটেক্সচুয়ালিটির ধারণাও, যেখানে প্রতিটি পাঠ অন্যসব পাঠের সাথে সম্পর্কিত।

আঠারো শতক পর্যন্ত ইউরোপে নন্দনতত্ত্বের ধারাবাহিক কোনো ইতিহাস না থাকলেও প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের নন্দনতত্ত্বে বিকাশের ইতিহাস পাওয়া যায় সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের বিকাশের সূত্র ধরে। ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের সাথে ব্যাকরণতত্ত্বের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। ব্যাকরণবিদের শাস্ত্রীয় শৃঙ্খলার মতোই আলংকারিকেরা বাক্য ও পদের মনোহর বিন্যাস ও সৌন্দর্যের কথা বলেন। কাব্যের স্বরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে দেহবাদী আলংকারিকেরা বিভিন্ন প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন। কেউ শব্দ ও অর্থগত অলংকারকে, কেউ বাক্যবিন্যাস, কেউ বিশিষ্ট পদরচনারীতিকেই শিল্পের তথা কাব্য রচনার সার্থকতার কারণ বলেছেন। তবে আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত (নবম ও দশম শতক) কাব্যের স্বরূপ বিচার করতে গিয়ে যথাক্রমে ধ্বনি ও রসের ধারণায় উপনীত হন। শব্দ ও অর্থের বাইরে অর্থাৎ বাচ্যাতিরিক্ত অভিব্যঞ্জনার ওপরেই কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভরশীল– এ ধারণা ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বকে নতুন মীমাংসা দিয়েছে। অলংকারবাদীরাও প্রকারান্তরে সিদ্ধ কাব্য সৌন্দর্যের পেছনে অর্থগত অলংকারের গুণের প্রশস্তি করেছেন। বামন থেকে অভিনব গুপ্ত বা আচার্য জগন্নাথ পর্যন্ত ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র মূলত অনেকাংশে বিবর্তিত হয়েছে, ফলে একে অলংকারশাস্ত্র না বলে রসশাস্ত্র বলাই সংগত। অর্থাৎ তা কেবল ইংরেজি Rhetoric বা বাগ্মিতার ভাষাকৌশল নয়।

সাহিত্যের ভাবরস সৌন্দর্য ও আনন্দরূপের পরিচয় রবীন্দ্র-নন্দনতত্ত্বের মূল সুর। রবীন্দ্রনাথের মতে, সাহিত্য হলো জগৎ ও জীবনসৃষ্টির অপর নাম; ভাবের বস্তুই সাহিত্যের সামগ্রী কিংবা সাহিত্যের প্রকাশ মূলত ভাবরূপে আত্মতারই প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যদর্শনে তাঁর সমগ্র জীবনেরই প্রতিফলন রয়েছে। (দ্রষ্টব্য: *সাহিত্য*, *সাহিত্যের পথে*, *সাহিত্যের স্বরূপ*, *প্রাচীন সাহিত্য*, *আধুনিক সাহিত্য* গ্রন্থভুক্ত বিভিন্ন প্রবন্ধ)। সুন্দরের সন্ধানে ও সৌন্দর্যতত্ত্ব ব্যাখ্যায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেসব প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার মধ্যে 'সুন্দর', 'সৌন্দর্যের সন্ধান', 'অরূপ না রূপ', 'দৃষ্টি ও সৃষ্টি' 'অসুন্দর' ইত্যাদি প্রবন্ধের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এসব প্রবন্ধে তিনি

সুন্দরকে খণ্ড ও অখণ্ডভাবে দেখেছেন। অর্থাৎ সুন্দরের সঙ্গেই রয়েছে অসুন্দরের ধারণা। বাঙালির নন্দনচিন্তায় ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, তবে এতে পশ্চিমি চিন্তার প্রতিফলনও অলক্ষণীয় নয়।

খ.

কাজী নজরুল ইসলাম মূলত কবি; গল্প-উপন্যাস-নাটক, সংবাদ নিবন্ধ, অসংখ্য গান, প্রবন্ধ ও অভিভাষণের রচয়িতা তিনি। তবে সমস্তের মধ্যেই যা বিকীর্ণ, তা হলো তাঁর অটুট কবিসত্তা। তেইশ-চব্বিশ বছরের সাহিত্যকর্মকালে তিনি মূলত সৃজনমুখর ছিলেন কবিতা ও গান রচনায়। তাঁর সাহিত্যসাধনার প্রেরণা হিসেবে গুরুত্বের সাথে চিহ্নিত হয় তাঁর মানবপ্রেম, মানবিক বঞ্চনা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, স্বাধীনতার প্রশ্নে দ্বিধাহীনতা, স্বদেশপ্রীতি, বিপ্লবের অদম্য আকাঙ্ক্ষা, স্বতন্ত্র সমাজ-রাজনীতিবোধ ও রাষ্ট্রচিন্তা ইত্যাদি।

এ প্রবন্ধের আলোচ্য নজরুলের শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক চিন্তা তথা নন্দনতত্ত্বের দর্শন। এক্ষেত্রে প্রথম বিবেচ্য– নন্দনতত্ত্বের দীর্ঘ ইতিহাস ও পরিক্রমার আলোকে নজরুল নন্দনচিন্তা পাঠ। সেদিক থেকে শিল্প-সাহিত্য ও এর সৃজন প্রক্রিয়া সম্পর্কে নজরুলের নান্দনিক অভিজ্ঞতা বা চিন্তাসূত্রের খোঁজ করা প্রয়োজন। সাহিত্য যে মানুষের প্রাণের সৃষ্টি, নন্দনতত্ত্বের এই প্রাচীন অভিমতের সমর্থন রয়েছে নজরুলের রচনায়ও। তাঁর মতে 'সাহিত্যের মুক্ত ধারায় থাকিবে চলার আনন্দ, স্রোতের বেগ এবং ঢেউ-এর কল-গান ও চঞ্চলতা'[৭]; নবীন সাহিত্যিকের রচনায় প্রাণ, চিন্তাশক্তি ফুল্লতা কামনা করেছেন তিনি। তাঁর মতে, ভাবহীন সাহিত্য আসলে সাহিত্য নয়। চিত্তের নির্মলতা ও প্রসারমানতা সাহিত্যের সৃষ্টিশীল শক্তির সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত; এ সম্পর্কে নজরুল লিখেছেন : 'যাঁহার চিত্ত যত নিরাবিল, নির্মল, উন্মুক্ত, হাস্যমুখর, তাঁহার লেখাও তত নূতন নূতন সম্পদে ভরা (rich)'[৮] কিংবা 'লেখকের লেখা হইতেছে তাঁহার প্রাণের সত্য অভিব্যক্তি। যেখানে লেখক সত্য, তাঁহার লেখাতে সে-সত্য সত্যভাবেই ফুটিয়া উঠিবে।'[৯] প্রাণের উদারতা ও উন্মুক্ততাকে তিনি বড় মাপের সাহিত্যিকের বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সাহিত্য-সৃজনের সাথে সৌন্দর্য, সত্য, মঙ্গলের ধারণাও সমভাবে চর্চিত হয়েছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নন্দনতত্ত্বে। নজরুল এ বিষয়ে তাঁর মত প্রকাশ করে বলেন : 'সত্য যদি লক্ষ্য হয়, সুন্দর ও মঙ্গলের সৃষ্টি সাধনা যদি ব্রত হয়, তবে তাঁহার লেখা সম্মান লাভ করিবেই করিবে।'[১০] আর্ট ও সৌন্দর্যসৃষ্টি সম্পর্কে নজরুল লিখেছেন:

> তিনিই আর্টিস্ট, যিনি আর্ট ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। আর্ট-এর অর্থ সত্যের প্রকাশ (execution of truth), এবং সত্য মাত্রেই সুন্দর, সত্য চির মঙ্গলময়। আর্টকে সৃষ্টি, আনন্দ বা মানুষ এবং প্রকৃতি (man plus nature) ইত্যাদি অনেক কিছুই বলা যাইতে পারে; তবে সত্যের প্রকাশই হইতেছে ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।[১১]

আর্টের বিষয়ে নজরুলের এ ধারণায় রোমান্টিক সৌন্দর্যতত্ত্বের উপস্থাপন লক্ষ করা যায়। সত্য, সুন্দর, মঙ্গল এবং শিল্পসৃষ্টি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও এরকম ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্যে

সর্বজনীনতা ও স্থায়িত্বের প্রসঙ্গে নজরুল যে চিন্তার পরিচয় দেন, তাতে শিল্পের অমরত্ব তথা সৃষ্টিপ্রবণতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা স্পষ্ট হয়:

> সাহিত্যিক যতই কোন সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনা করুন না কেন, তাহা দেখিয়াই যেন বিশ্বের যে কোন লোক বলিতে পারে ইহা তাহারই অন্তরের অন্তরতম কথা; ইহা তাহারই বুকে গুমরিয়া মরিতেছিল, প্রকাশের পথ পাইতেছিল না। এই রূপেই বিশ্বসাহিত্য সৃষ্টি হয়, ইহাকেই বলে সাহিত্যে সর্বজনীনতা। ... যাহা বিশ্বসাহিত্যে স্থান পায় না, তাহা স্থায়ী সাহিত্য নয়, খুব জোর দুদিন আনন্দলাভের পর তাহার মৃত্যু হয়। আমাদিগকে তাই এখন করিতে হইবে– সাহিত্যে সর্বজনীনতা সৃষ্টি। অবশ্য, নিজের জাতীয় ও দেশীয় বিশেষত্বকে না এড়াইয়া, না হারাইয়া।[১২]

লক্ষণীয় যে, নজরুল সর্বজনীনতার সাথেই গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন দেশীয় ও জাতীয় বিশেষত্বকে। দেশের ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ন রেখেই নজরুল সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। ঐতিহ্যবোধ মূলত এমন একটি উপলব্ধির ক্ষমতা, যা শুধু অতীত নয় বরং বহন করে অতীতের বর্তমান উপস্থিতিও। এই ঐতিহাসিকবোধ একইসাথে চিরন্তনের এবং সমসাময়িকের। নজরুলের শিল্পকৃতি ও শিল্পস্বভাবে এই ঐতিহ্যবোধ দৃঢ়।

কবিকে নজরুল আখ্যা দেন রূপরসিক হিসেবে যিনি রূপ বা সৌন্দর্য কেনেন হৃদয় দিয়ে। কিন্তু এই সৌন্দর্য সৃজনের সাথেই রয়েছে বেদনার গূঢ় সম্পর্ক। শিল্পের উদ্দেশ্য আনন্দ এবং কবির প্রণোদিত আনন্দ-ইচ্ছাকে 'সৃষ্টির বেদনাময়তা'[১৩] দিয়ে কবি তাঁর সৃষ্টিকর্মে রূপান্তরিত করেন। তাঁর শিল্পসত্তার এ ধরনের ব্রতও যেন এই আনন্দ-বেদনার সমন্বিত সৃজন। তাঁর ভাষ্য : 'জীবন আমার যত দুঃখময়ই হোক, আনন্দের গান বেদনার গান গেয়ে যাব আমি, দিয়ে যাব আমি নিজেকে নিঃশেষ করে সকলের মাঝে বিলিয়ে, সকলের বাঁচার মাঝে থাকব আমি বেঁচে।'[১৪] কাজী মোতাহার হোসেনকে লেখা একটা চিঠিতে নজরুল এ প্রসঙ্গে আরও লিখছেন: 'আর, মনে হচ্ছে, ছোট্ট দুটি কথা– 'সুন্দর ও বেদনা'। এই দুটি কথাতেই আমি সমস্ত বিশ্বকে উপলব্ধি করতে পারি। 'সুন্দর' ও 'বেদনা' এই দুটি পাতার মাঝখানে একটি ফুল–বিকশিত বিশ্ব।'[১৫] সুতরাং সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা ও রূপদান করার প্রবণতা সাহিত্যস্রষ্টা বিশেষত কবির ভেতরে প্রচ্ছন্ন থাকে। রোমান্টিক কবি কিট্‌সের (১৭৯৫-১৮২১) সত্য-সুন্দরের সাহিত্যিক সমীকরণের যে নান্দনিকতা, তা নজরুল অতিক্রম করতে পারেননি। তবে শিল্পের এই সুন্দরের সাথে বাস্তবের গভীর এবং অপ্রতিরোধ্য দ্বন্দ্ব ও নিরন্তর স্ববিরোধিতা নজরুলের রচনায় বর্তমান এবং সেটা তার অনুভূত অন্যতম সত্য। কবিরা সত্যদ্রষ্টা, জীবন-বাস্তবতার চিরায়ত সত্যের তারা সংবাহক, তাই সত্যদ্রষ্টা শিল্পীর সৃজনে থাকে মুক্তির আনন্দ, নজরুল লিখছেন: 'এই সত্যদ্রষ্টা স্বপ্নপথের পথিকেরা দারিদ্র্য-দুঃখ-শোক-ব্যাধি-উৎপীড়ন জর্জরিত মানবকে আনন্দের পথে মুক্তির পথে নিয়ে গেছেন।'[১৬]

সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক সত্য এককথায় উপনিবেশিত সময়ের সামগ্রিক বাস্তবতা আর শিল্প-সাহিত্য বিষয়ে চর্চিত পাশ্চাত্য নন্দনতাত্ত্বিক সূত্রগুলো এক ধরনের টানাপড়েন সৃষ্টি করেছিল। উপনিবেশকালের লেখক হিসেবে অস্তিত্বের ঘোষণা নজরুলের সাহিত্যকর্মের ভেতরে রয়েছে, রয়েছে কিছু স্ববিরোধিতাও। কিন্তু নজরুল তাঁর রচনায় সর্বোপরি যে প্রত্যয় ঘোষণা

করেছেন তা স্পষ্ট, নির্ভীক এবং দৃঢ়; তাঁর সাহিত্য জীবনাভিজ্ঞতার সাহিত্য। 'স্বাধীন চিত্ততায় জাগরণ' (১৯৪০) অভিভাষণে জীবনের আনন্দ ও বেদনার সম্মিলিত অভিজ্ঞতাবোধের শিল্পিত প্রকাশ হিসেবে সাহিত্যকে চিহ্নিত করেন তিনি। জনগণমনসংলগ্ন সাহিত্যবোধে প্রাণিত তাঁর রচনা। 'জনসাহিত্য' (১৯৩৮) নামক অভিভাষণে আমাদের সাহিত্য বা সমাজনীতিকে টবের গাছের সাথে তুলনা করেছেন তিনি। মাটি সম্পৃক্ত জনমানুষের একজন হয়ে, তাদের প্রতি প্রাণের অনুভবকে সাহিত্যে রূপায়ণের কথা বলেন তিনি, যার নাম দেন জনসাহিত্য।

নজরুলের সাহিত্যচিন্তা সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্য'। এ প্রবন্ধে বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্যিকদের শিল্পবোধ সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ অত্যন্ত পরিষ্কার। এতে স্বপ্নচারী, বাস্তববাদী এবং এই দু'য়ের মধ্যবর্তী অবস্থানধর্মী হিসেবে সমকালীন সাহিত্যিকদের বিভক্ত করেছেন নজরুল। উল্লেখ করতে ভোলেননি সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিবাদী ধারার লেখকদেরও। এছাড়া এসব ধারা-সঞ্জাত অন্যসব গৌণধারা ও পাশাপাশি তাদের বৈশিষ্ট্যও নির্দেশ করেছেন তিনি। রোমান্টিক ধারায় জন মিল্টন (১৬০৮-১৬৭৪), শেলি (১৭৯২-১৮২২), ইয়েট্‌স (১৮৬৫-১৯৩৯), জন কিটস, লর্ড বায়রন (১৭৮৮-১৮২৪), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), নোগুচি (১৮৭৫-১৯৪৭) প্রমুখের নাম উল্লেখিত হয়েছে। মর্ত্যের সাহিত্যিক হিসেবে ফরাসি, স্পেনীয় বা ইউরোপীয় অনেক সাহিত্যিক যেমন– আনাতোল ফ্রাঁস (১৮৪৪-১৯২৪), বেনেভেন্তে মার্টিনেজ (১৮৬৬-১৯৫৪), বালজাক (১৭৯৯-১৮৫০), এমিল জোলা (১৮৪০-১৯০২), জর্জ বার্নাড 'শ (১৮৫৬-১৯৫০), ওয়াল্ট হুইটম্যান (১৮১৯-১৮৯২), জোহান বোয়ার (১৮৭২-১৯৫৯) প্রমুখকে চিহ্নিত করেছেন নজরুল। বাস্তববাদী শিল্পী হিসেবে উচ্চারিত হয়েছে পুশকিন (১৭৯৯-১৮৩৭), দস্তয়েভস্কি (১৮২১-১৮৮১), ম্যাক্সিম গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬) এবং মিত্রি মেরেজকস্কির (১৮৬৬-১৯৪১) নাম। বিপরীতে রাশিয়ান সাহিত্যিক লিও তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০), আন্তন চেখভের (১৮৬০-১৯০৪) উল্লেখও আছে। নজরুল বাস্তববাদী ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী– এই দুই ধারার লেখককে মূলত বাস্তব ধারায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

কল্পনাপ্রধান রোমান্টিক সাহিত্য ও বাস্তবপ্রধান বা 'রিয়েলিস্টিক' সাহিত্যের মধ্যবর্তী সাহিত্যিকের মাঝে নজরুল উল্লেখ করেছেন নুট হামসুন (১৮৫৯-১৯৫২), ওয়াদিশল রেমন্ট (১৮৬৮-১৯২৫), লিওনিদ আঁদ্রিভ (১৮৭১-১৯১৯), গ্লাৎসিয়া দেলেদ্দার (১৮৭৫-১৯৩৬) নাম। 'বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্য' প্রবন্ধে মূলত উনিশ শতকের শেষ পাদের ও বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের বিশ্বসাহিত্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'কলকাতায় রাজনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মূলধারা এবং পত্র-পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার ফলে নজরুল বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করে থাকবেন।'[১৭] নজরুলের মতে, 'স্বপন-বিহারী' রোমান্টিক সাহিত্যিকেরা কখনও ধরার মাটি স্পর্শ করে না। বিপরীতে 'মাটির পৃথিবীকে অপার মমতায় যাঁরা আঁকড়ে ধরে থাকেন তাদেরকে এই দুঃখের ধরণীর' অসুরতম সত্তার সাথে তুলনা করেছেন তিনি। নজরুলের প্রধান আক্ষেপ মানবতা ও মনুষ্যত্বের পদদলন নিয়ে, তাই অভিজাত স্বর্গবাসী সুরলোকের দেবতাসম শ্রেণির মানুষ ও সেই

শোষণব্যবস্থার বিপরীতে বিদ্রোহী শিল্পীর প্রতি তাঁর পরম আগ্রহ। এ কারণে গোর্কির উচ্চারণকে নজরুল উদ্ধৃত করেন, যা তাঁর আত্মগত বিদ্রোহ-প্রবণতা ও সমাজ-রাজনীতি ভাবনার সাথে সমান্তরালে বহমান।

সমকালীন বাস্তববাদী সাহিত্যধারার প্রধান লক্ষণ নির্ণয় করে নজরুল বলেন তাঁরা 'ধ্বংসব্রতী ভৃগুর মত বিদ্রোহী' যাঁরা রিফর্ম চান 'ইভোলিউশন দিয়ে নয়, একেবারে রক্তমাখা রিভোলিউশন দিয়ে।'[১৮] এই বিদ্রোহী সাহিত্যিকদের প্রতি ধনবাদী সমাজের ধারণাকে নজরুল তীক্ষ্ণভাবে বিদ্রূপ ও প্রত্যাখ্যান করেছেন:

> দশ মুণ্ড দিয়ে খেয়ে বিশ হাত দিয়ে লুণ্ঠন করেও যার প্রবৃত্তির আর নিবৃত্তি হল না, সেই Capitalist রাবণ ও তার বুর্জোয়া রক্ষা-সেনারা এদের বলে হনুমান।... সীতার উদ্ধারে যায় যে তথাকথিত হনুমান, রক্ষা-সেনা দেয় তার লেজে আগুন লাগিয়ে। তথাকথিত হনুমানও বলে, ল্যাজে যদি আগুনই লাগালি, আমার হাতমুখ যদি পোড়েই– তবে তোর স্বর্ণলঙ্কাও পোড়াব– বলেই দেয় লম্ফ।
>
> আজকের বিশ্ব-সাহিত্যে এই হনুমানও লাফাচ্ছে এবং সাথে সাথে স্বর্ণলঙ্কাও পুড়ছে[১৯]–

গত শতকের বিশের দশকে ভারতে বিশেষত বাংলায় রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যে ভাবধারা প্রসারিত হয়েছিল তার প্রতিফলন নজরুলের বিভিন্ন রচনায় সুস্পষ্টভাবে রয়েছে। উপনিবেশের নিগ্রহ, অমর্যাদা, পরাধীনতার গ্লানি ও দুঃখ নজরুলকে যেভাবে স্পর্শ করেছিল, তা নির্দিষ্ট কোনো মতবাদপুষ্ট রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার জন্য ঘটেনি; এটি তার নিজস্ব ও এর মূল্য শাশ্বত। বাস্তবধারী ধারার শিল্পীর কাছে নজরুল এই সমর্থনই খুঁজেছেন। লক্ষণীয়, 'বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্য' প্রবন্ধের শেষে কিট্‌সের 'Ode to a Nightingale' কবিতার একটা উক্তি উদ্ধৃত করেছেন– 'Thou was not born for death, immortal Bird!' যা শিল্প-অস্তিত্বের অমরতার প্রত্যাশা বহন করেছে। ক্ষমতার পুঁজিনির্ভর লড়াই শোষক-শোষিতের চিরায়ত দ্বন্দ্ব, মানবতার চরম অবমাননা ও বিভীষিকাকে 'কাদা-ছোঁড়াছুঁড়ির হোলি-খেলা' বলেছেন নজরুল, যখন তা চলে কিংবা চলেছে তখন এ 'ধূলার পৃথিবীতে' তাঁর আত্মিক অবসাদ ঘোচাতেই যেন স্বপ্ন রোমন্থনের মতো মানবের তথা শিল্পীর অমরত্বের গান শুনতে চান তিনি। এখানে তাঁর নির্দ্বন্দ্ব স্থিরচিত্তের আবাহন আছে, কেননা তাতে আছে গানের পরিসমাপ্তির বিরাট স্তব্ধতা ও অতলতা।

আত্মার নির্মাণ, প্রকাশ কিংবা নিরন্তর আত্মতার ঘোষণা নজরুলের নন্দনবোধের একটা অন্যতম দিক। এই 'আমি' এক অতিকায় সত্তায় পরিণত হয়েছে নজরুলের রচনায়। যার ঈশ্বরতুল্য বিশালতা, সর্বশক্তিময়তায় নিরন্তর ধ্বংস ও সৃজনের আবেগ তাঁকে সাধারণ পাঠক থেকে দূরে নিয়ে যায়। তাঁর আমিত্ববোধ অভিব্যক্তিবাদী তত্ত্বের অনুরূপ নয়, পাশ্চাত্য ব্যক্তিত্ব ভাবনার অসাধারণত্বের 'আমিত্ব'-ও নয়। তাঁর আত্মদর্শনের প্রকাশে আদ্যন্ত একটা বিদ্রোহ আছে, কোনো প্রকার ভাববাদী চেতনার দ্বারা যা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। 'বিদ্রোহী' কবিতাই তাঁর এই আত্মতার শ্রেষ্ঠ ঘোষক। অনেকে এই আমিত্বের বোধকে বলেছেন 'দীপ্র ক্ষিপ্র প্রবল জীবনীশক্তিসম্পন্ন রোমান্টিক 'আমি'।'[২০] আত্মশক্তির উপলব্ধি, উদ্বোধন ও তার ঘোষণায় নজরুল প্রায় সর্বত্র তৎপর। 'আমার

পথ' প্রবন্ধে নজরুল লিখেছেন যে, নিজকে চিনলে এবং নিজের সত্যকেই নিজের কর্ণধার হিসেবে মানলে আত্মবিশ্বাস প্রবল হয়। তাঁর আমিত্ববোধ তথা সৃষ্টিসত্তার ক্ষমতা ও তাগিদটি সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের মধ্যে পরিপুষ্ট হয়েছে। 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'-তে বলেছেন– মানুষের 'অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশের জন্য' এবং 'অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তি দানের জন্য' কবি ভগবান কর্তৃক প্রেরিত, যার কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। ১৯৪১ সালের ১৬ মার্চ বনগাঁ সাহিত্য-সভার সভাপতির ভাষণে নজরুল বলেন– 'আমার সাহিত্য-সাধনা বিলাস ছিল না। আমি আমার জন্মক্ষণ থেকে যেন আমার অস্তিত্বকে, existence-কে খুঁজে ফিরেছি।'[২১] কিন্তু তিনি এও জানেন– পূর্ণভাবে সৃষ্টিকে প্রকাশ করে দেওয়ার শক্তি কোনো স্রষ্টারই নেই। তাই বলেন, 'মানুষ অপ্রকাশকে আপন মনের পূর্ণতা দিয়ে পূর্ণ করে দেখে।'[২২] এ বক্তব্যে জীবনবোধের ব্যাপকতায় আত্মপ্রকাশের জ্ঞানগত তাগিদ ও সম্ভাবনা পরিস্ফুট হয়েছে। এক প্রতিবাদী অহং চেতনার যে প্রতিধ্বনি নজরুলের রচনায় দেখি, তা কেবল সমকালীন শিল্প-সাহিত্যবোধের ক্ষেত্রেই নতুন নয়, উত্তরকালের পাঠকের মধ্যেও মানুষের ভেতরে সঞ্চিত অমিতশক্তি সম্পর্কে এক চিরায়ত সত্যবোধ সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছেন তিনি। ফলে এই আত্মপ্রকাশ মানব প্রকাশেরই নামান্তর। নজরুল তাঁর স্বাতন্ত্র্যের জয় ঘোষণা করেছিলেন ১৯২৯-এ; 'নজরুল সংবর্ধনা সমিতি' যখন কবিকে 'জাতীয় কবি' অভিধায় ভূষিত করে, নজরুল তখন 'প্রতিভাষণে' বলেন : 'কোনো অনাসৃষ্টি করতে আসিনি আমি। ... বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এরই অভিযান-সেনাদলের তূর্যবাদকের একজন আমি– এই হোক আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়।'[২৩]

নজরুলের 'আমার সুন্দর' প্রবন্ধটি তাঁর শিল্পভাবনার একটি অনন্য স্মারক। সুন্দরের স্বরূপ ও বিচিত্র নন্দনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ নজরুলের এ প্রবন্ধটিকে সমালোচক আখ্যা দিয়েছেন 'Aesthetic autobiography'[২৪]। এ প্রবন্ধটি নজরুলের আত্ম-অন্তর্ভূত 'সুন্দর' অনুধাবন ও অভিযাত্রার এক অতি মনোময় পরিক্রমা। শক্তি-সুন্দর, স্নেহ-সুন্দর, যৌবন-সুন্দর, প্রেম-সুন্দর, প্রলয়-সুন্দরের মতো মানবসত্তায় বিকীর্ণ বহু অনুভব নজরুল এ প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন। প্রলয়-সুন্দরকে নিজের 'পূর্ব চেতনা' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। এ সম্পর্কে সমালোচকের মত:

> বিষয়টির ব্যাখ্যায় ও প্রতীকায়নে নজরুল ইসলামের দর্শনমনস্ক অধ্যাত্মবোধ স্পষ্ট। নজরুল বলেছেন যে, তাঁর লক্ষ্য পরম সুন্দরের পরম বিলাস কিন্তু তা কেবল ধ্যানের মাধ্যমে অর্জন করা যাবে না। ধ্যানের মধ্যে দিয়ে ঊর্ধ্বলোকে যাত্রা সম্ভবপর হলেও, অসুর আর অশুভের সঙ্গে লড়াই ছাড়া সে যাত্রা সফল হবার নয়। পরম সুন্দরের দেখা পেতে হলে মাটির পৃথিবীর ঋণ শোধ করতে হবে। বাংলার ঋণ শোধ করতে হবে। অর্থাৎ উপনিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। আর সেকারণেই, নিবন্ধের শেষে তিনি বলেছেন প্রলয়-সুন্দরই তার কাম্য।[২৫]

সুন্দরের এই চেতনা নজরুলের জীবন ও শিল্পবোধের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। তাঁর নান্দনিক বোধের গড়ন সম্পর্কে সমালোচক বলেন:

> Every occurrence in his personal life as well as socio-political in the country turned into an aesthetic experience to him, which is why he started expressing himself eloquently in his writing and speaking and singing … his personal life, the socio-political life, the life

> of a creative artist– all mingled together to render his living into an interdisciplinary discourese.[২৬]

'আমার সুন্দর' প্রবন্ধে নজরুলের অভিব্যক্তি থেকে তাঁকে ভাববাদী শিল্পতাত্ত্বিক হিসেবে চিহ্নিত করা কঠিন নয়। কেউ কেউ তা করেছেন:

> সৃষ্টিতে, পৃথিবীতে, আকাশে, বাতাসে, রসভরা ফলে, সুরভিত ফুলে, স্নিগ্ধ মৃত্তিকায়, শীতল জলে, সুখদায়ী সমীকরণে এবং জগৎ সৃষ্টির সমগ্রতায় কবি 'সৃষ্টি-সুন্দর'কে অনুভব করেন। কবি আত্মযন্ত্রণাময় ও সংক্ষুব্ধ অবস্থা থেকে উত্তরিত হয়ে পরম পূর্ণতা ও পরম শান্তির স্নিগ্ধ আনন্দময়তায় অবগাহন করে নান্দনিক তৃপ্তি লাভ করেন।[২৭]

এই প্রবন্ধে সুন্দরের রূপ-রূপান্তরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে আত্মতা ও স্বরূপের উপলব্ধি। সর্বশেষ অভিভাষণে ('যদি আর বাঁশি না বাজে') নজরুল বলেছিলেন 'অভেদ-সুন্দর-সাম্য'-এর কথা। সুতরাং সুন্দরের যে চেতনা প্রথাগত নন্দনতত্ত্বের ভিত্তি, 'তার সঙ্গে নজরুলের সৌন্দর্যচিন্তার লক্ষযোগ্য স্বাতন্ত্র্য রয়েছে।'[২৮]

নজরুলীয় নন্দনতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস তাঁর সংগীত। প্রায় একযুগের মতো (প্রস্তুতিপর্বসহ আরো ৪/৫ বছর) সংগীতের সাধনায় ব্যয় করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম এবং 'নন্দনতাত্ত্বিক সৌন্দর্যসৃষ্টির সমস্ত হিসাব নিকাশ তিনি চুকিয়ে মিটিয়ে দেন তাঁর সুর ও সঙ্গীতে। নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে, সে কারণে নজরুল ইসলাম একজন চরিতার্থ শিল্পী।'[২৯] সংগীতচর্চাকে তিনি বলেছেন 'গানে গানে প্রাণের আলাপ'[৩০] কিংবা 'সুন্দরকে রূপে রূপে অপরূপ করে দেখার স্তবস্তুতি।'[৩১]

নজরুলের বিভিন্ন শ্রেণির গান রয়েছে– প্রেম ও প্রকৃতি-প্রধানবিষয়ক গান, রাগ-প্রধান ইসলামি গান, ভক্তিগীতি, গজল, লোকগীতি, শ্যামাসংগীত, দেশাত্মবোধক গান, হিন্দি গান, গীতিনাট্য ইত্যাদি। প্রায় তিন হাজার গানের রচয়িতা তিনি। শিল্প-সাহিত্যের সবচেয়ে ব্যঞ্জনাময় ও অনুভবভেদ্য নান্দনিক শাখা এই সংগীত সম্পর্কে তাঁর নিজের অভিমত হলো:

> কাব্য ও সাহিত্যে আমি কী দিয়েছি জানি না। আমার আবেগে যা এসেছিল, তাই আমি সহজভাবে বলেছি, আমি যা অনুভব করেছি, তাই আমি বলেছি, ওতে আমার কৃত্রিমতা ছিল না। কিন্তু সঙ্গীতে যা দিয়েছি সে সম্বন্ধে আজ কোনও আলোচনা না হলেও ভবিষ্যতে যখন আলোচনা হবে, ইতিহাস লেখা হবে, তখন আমার কথা সবাই স্মরণ করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। সাহিত্যে দান আমার কতটুকু তা আমার জানা নেই। তবে এইটুকু মনে আছে সঙ্গীতে আমি কিছু দিতে পেরেছি।[৩২]

বিষয় ও সুরে নজরুলসংগীত বাংলা গানের এক অমূল্য সম্পদ। তাঁর সংগীতের নন্দনতত্ত্ব মূল্যায়নও তাই জরুরি। নজরুল-সংগীত আদ্যন্ত জীবনময়, রোমান্টিকতাপূর্ণ এবং শ্রুতিনন্দন এক নান্দনিক অভিজ্ঞতায় আভাসিত। সমকালে ব্রিটিশ দার্শনিক নিক জ্যাঙউইল (১৯৫৭) তাঁর *Music and Aesthetic Reality : Formalism and the Limits of Description* গ্রন্থে লেখেন :

> By 'realism' about musical experience, I mean a view that foregrounds the *aesthetic properties* of music and our experience of these properties: musical experience is an awareness of an array of sounds and of the aesthetic properties that they determine.

> Our experience is directed onto the sound structure and its aesthitic properties. This is the content of musical experience.[৩৩]

অধুনা সমালোচনাতত্ত্বে সংগীত কেবল স্বাধীন স্বাবলম্ব শিল্প হিসেবে নয়, বরং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সংগীতের জন্ম ও বিকাশের ঐতিহাসিকতা; এর সাথে সম্পৃক্ত সামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতও। নজরুল সংগীতের পাঠও এই সূত্রে বিবেচ্য, কেননা এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে শিল্পী হিসেবে তাঁর আত্মবিকাশের ইতিহাস, তাঁর অভিজ্ঞতাময় শিল্পতত্ত্ব।

গ.

শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে নজরুলের মত, তাঁর সাহিত্যকর্মের ধরন, ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য, সমকালে তাঁর সৃষ্টিকর্মের মূল্যায়নে দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্য এবং উত্তরকালে কিংবা বর্তমানে নজরুলের সৃষ্টিসম্ভার এবং তাঁর নন্দনতত্ত্ব যাচাইয়ের প্রয়োজনটি যুগচেতনার সাথেই গভীরভাবে সম্পৃক্ত। নজরুলের নন্দনতাত্ত্বিক দর্শন বিচারে স্বভাবতই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য নন্দনতত্ত্বের ইতিহাস ও পর্যালোচনার ধারা আলোচ্য হয়ে ওঠে। তবে এ পদ্ধতির নানা প্রতিবন্ধকতা আছে বলে অধুনা অনেক সমালোচক মত প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ নজরুল নন্দনতত্ত্ব কোনো পূর্ব ধারণা বা মডেলের নিরিখে বিচার্য নয়– 'কারণ নজরলের নান্দনিকতার একটি নিজস্ব উত্থানপর্ব আছে, এবং সেই উত্থানপর্বের বিরাট অংশ জুড়ে আছে উপনিবেশ ও তার ডিসকোর্স'।[৩৪] তাছাড়া 'নজরুল ইসলাম কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্রণোদনা থেকে নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন নি। যা বোধ করেছেন, তা-ই সুযোগ সুবিধে মতো তিনি বলেছেন। এসব বক্তব্য তাঁর অভিভাষণগুলোতেই বেশি পাই।'[৩৫] তবে তাঁর নান্দনিক প্রত্যয় অনুসন্ধানে এ কথা বলা যায় যে, নজরুল কোনো 'তত্ত্বীয় নন্দনতত্ত্ব সংগঠনে ব্রতী হননি।'[৩৬]

মূলত নন্দনতত্ত্বের একেক ঘরানা চায়, লেখকের সৃষ্টিকে নিজ ঘরানার আলোকে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা করতে, গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখ্যান করতেও। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, *দোলনচাঁপা* (১৯২৩), *ছায়ানট* (১৯২৫) এবং *সর্বহারা* (১৯২৬) কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে সমালোচকের বিরূপ মন্তব্যের কারণে নজরুল বলেছিলেন– 'আমি আর্টের সুনিশ্চিত সংজ্ঞা জানি নে, জানলেও মানিনে।'[৩৭] সমালোচকের অবমূল্যায়ন তাঁর শিল্পীব্যক্তিত্বকে আহত করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এর বিরূপতা সৃজনশক্তি সম্পর্কে তাঁর আত্মবিশ্বাসকে খর্ব করেনি মোটেও। 'নিন্দুকের শর নিক্ষেপে' তাঁর সৃষ্টিকর্ম 'মুহূর্তের তরে আড়াল পড়লেও চিরদিনের জন্য ঢাকা পড়বেনা।'[৩৮] – নজরুলের এই মন্তব্য এর একটা প্রমাণ। তাই 'কবি ও অকবি' যা-ই বলা হোক, তিনি মুখ বুজে সইতে চেয়েছেন। উল্লেখ্য যে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'কল্লোল', 'কালি-কলম', 'প্রগতি' পত্রিকা এবং কাজী নজরুল ইসলামের সাথে 'শনিবারের চিঠি'র একটা বিরোধ ছিল, যার বড় অংশ জুড়ে আছে নন্দনতাত্ত্বিক চিন্তার বৈপরীত্য তথা বিরোধ। সজনীকান্ত দাস রবীন্দ্রনাথের কাছে সমকালীন সাহিত্য নিয়ে যত অভিযোগ-নালিশ করেছেন তার মাঝে সমকালীন এসব পত্রিকার প্রসঙ্গ ছাড়াও থাকত নজরুলের কবিতা সম্পর্কিত আলাপ। তাঁর দুর্ভাগ্য এই যে, ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক পর্বে তাঁর

কবিতা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মূল্যায়নের শিকার হয়েছে। তাঁর জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদ, মানবতাবাদ, সাম্যবাদ, মার্কসবাদ, ইসলামিয়ানা, হিন্দুয়ানা, রাজনীতি-মুখরতা 'ইত্যাকার বিবিধ প্রসঙ্গ উৎসাহী গবেষক–সমালোচকের সহজ চর্চাক্ষেত্র। ... নজরুলের এতোসব সামাজিক-রাজনৈতিক বিবেচনার আড়ালে প্রায় হারাতে বসেছে তাঁর অন্তরাশ্রিত এক ভিন্নমাত্রার নান্দনিক স্রষ্টার পরিচয়। পরিমাপ করা হচ্ছে না তাঁর নান্দনিক প্রসারতা, উচ্চতা ও গভীরতা।'[৩৯] একথা সত্য যে উপনিবেশ পর্বে সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ে নজরুল গভীরভাবে আলোড়িত হয়েছেন, কখনও ধর্মীয় আধ্যাত্মিক ব্যাপারে মগ্ন হয়েছেন, বিপ্লববাদেও তিনি ঝুঁকেছিলেন, উদ্বোধিত হয়ে সাম্যবাদে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন– 'কিন্তু কোথাও নোঙর ফেলেননি।'[৪০] এ পর্যায়ে সমগ্র নজরুল সম্পর্কে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৯২০-১৯৮৫) মূল্যায়ন :

> কোনো বিশেষ দলের রাজনৈতিক মতবাদ কোনো শিল্পী কবিকেই সম্পূর্ণ হবার উপকরণ দেয় না, বরং তার সৃষ্টিকর্মের বৃহত্তর পটভূমিকে বারবার সংকীর্ণ করে এবং দলবহির্ভূত সমস্ত চেতনা ও উপলব্ধির সৌন্দর্যই তাঁর দৃষ্টি থেকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করে। সমস্ত দেশের অন্তরকে একটি সুরে জাগিয়ে তোলার ক্ষমতা সেই কবিরই থাকে, যিনি আয়নার মতো নিজের হৃদয়ে স্বদেশীয় সমস্ত মত চেতনার ও আদর্শের ছবিগুলি ধরে রাখতে জানেন, এবং তা থেকে সম্পূর্ণ ও অপরূপ চিত্রের সৃষ্টি করেন। এই কাজ ও ক্ষমতা তাঁর কোনো কুশলী দক্ষতা নয়; একটি কবির ধ্যানস্থ হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রতিফলন। উনিশশো উনিশ থেকে তিরিশের যুগ পর্যন্ত নজরুল ছিলেন মুক্তিকামী ভারতবর্ষের সকল সাধনা, সকল আরাধনার দর্পণ।[৪১]

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই বিশ্লেষণ নজরুলের সমকালচেতনা, তাঁর অভিজ্ঞতার ভাষ্য নির্মাণ ও এর স্বাতন্ত্র্যকেই নির্দেশ করে। শিল্পীর বোধের সাথে তার অতীত বর্তমান এবং অনাগতের এক যৌথ সম্ভাবনা নির্মিত হয়। নজরুল ক্রমাগতই তাঁর সংবেদনশীলতায় যুগপৎ দ্বন্দ্ব এবং কালজ ও কালোত্তরের বিনিময়ের অনিবার্য মাধ্যম হয়ে ওঠেন।

শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে নজরুলের বৈচিত্র্যময় অভিমত বিশ্লেষণ করে বলা যায়, শিল্পের কিছু স্থায়ী গুণ (যা সৃজনের আবেগের সাথে সম্পর্কিত) এমন কিছু নান্দনিক অনুভবের জন্ম দেয়, যা একজন শিল্পীর ক্ষেত্রে তাঁর সত্তা-সজ্ঞা-অভিজ্ঞতালোকের মূল্যায়নে আগ্রহী করে তোলে। শিল্পের এই স্বভাবজ ঔৎসুক্য থেকে নজরুল কিছু বিশ্লেষণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, সেটা তাঁর নন্দনসূত্র নির্মাণে সহায়ক এবং প্রাসঙ্গিকও। এসব সিদ্ধান্তের অনেকগুলোই সমকালীন নন্দনতত্ত্ব চর্চার সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিশেষত– শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা, উদ্দেশ্য, সৌন্দর্যের ধারণা, সত্য-সুন্দর-মঙ্গলবোধ ইত্যাদি সম্পর্কে মন্তব্যে এক ধরনের নান্দনিক তৃপ্তিও অনুভব করেছেন নজরুল। উল্লেখ্য যে, নজরুল সমকালে রোমান্টিক, আধুনিকবাদী ও বাস্তববাদী শিল্পী এমনকি ধনবাদী, ফ্যাসিস্ট তথা সাম্রাজ্যবাদী সাহিত্যিকের রচনাকর্ম ও সাহিত্যতত্ত্বের সাথে পরিচিত হয়েছেন– কিছু স্ববিরোধিতা সত্ত্বেও 'বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্য' প্রবন্ধে এ বিষয়ে স্বচ্ছ আলোচনা আছে। শিল্পকে জাতগোত্রহীন ভাবা এবং শিল্পীর ক্ষমতা ও কর্মকে দেশ-কাল-জাতি নির্বিশেষে কালাতিক্রমী করে তোলা তাঁর নান্দনিক আকাঙ্ক্ষার অংশ বলে ভাবা যায়।[৪২] বিশের দশকে তরুণ মুসলিম সাহিত্যিকদের প্রতিনিধির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নজরুল তাদেরকে উৎসাহী করে তুলতে চেয়েছেন 'প্রাণ,

চিন্তাশক্তি ও ভাবময়তায় পূর্ণ, স্থায়ী সাহিত্য' সৃজনে। শিল্প-সাহিত্য সৃজনে শিল্পী হয়ে ওঠার চেয়ে তার সাহিত্যতাত্ত্বিক সম্ভাবনাকে তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক দর্শনকে যুগপৎ বস্তুবাদী ও ভাববাদী নন্দনতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা তথা জীবনবাদী ও শিল্পবাদী নন্দনচিন্তার সংশ্লেষ বলে মনে করেছেন কেউ কেউ। তবে উপনিবেশিত সময়ের সমাজচিত্র, রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে যুক্ত এবং আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতার প্রশ্নে আমূল আপোশহীন কবির টানাপড়েন এবং শেষপর্যন্ত সৃজনে ও ঘোষণায় ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সের সাথে স্পষ্ট বিদ্রোহ এবং বিচ্ছিন্নতাই নজরুলীয় নন্দনতত্ত্বের ভিন্ন বয়ান তৈরি করে। ফলে তাঁর নন্দনতত্ত্ব হয়ে ওঠে রাজনৈতিক নন্দনতত্ত্ব। নজরুল রাজনৈতিক বিষয়কে গভীর আবেগের দ্বারা উত্তপ্ত করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর নন্দনতত্ত্ব রাজনৈতিক, তা নয়। মূলত নন্দনতত্ত্ব ও রাজনীতির মধ্যে রয়েছে এক গভীর অন্তর্বয়িত সম্পর্ক। তাছাড়া মহৎ শিল্পীর নান্দনিক অভিজ্ঞতা মূলত গভীরভাবে 'রাজনৈতিক'। সুতরাং সমকালীন পাঠে তাগিদ তৈরি হয় নতুন প্রকল্পে নজরুলের নান্দনিক অভিজ্ঞতার মূল্যায়নের। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন :

> নজরুল ইসলাম নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে সুশৃঙ্খলভাবে যে কিছু লিখতে বা বলতে পারতেন না, এমন নয়। কিন্তু যখনই তিনি সৌন্দর্য ব্যাখ্যার সূক্ষ্মতর স্তরে প্রবেশ করতে চেয়েছেন, তখনই সমকালীন সমাজের হিন্দু-মুসলিম ডায়ালেক্টিকের বিভিন্ন বাস্তবতা তাঁকে আক্রমণ করেছে। ... তাঁর অভিভাষণগুলোর একটা বড় জায়গা জুড়ে আছে হিন্দু-মুসলিম সংঘাত ও সম্প্রীতির প্রসঙ্গ। তাছাড়া যে কালে তিনি সাহিত্যচর্চা করেছেন, তখন বাংলা ছিল উপনিবেশের অন্তর্গত ... যখন পুরো ভারতবর্ষ ছিল ব্রিটিশ কলোনির অন্তর্গত। উপনিবেশ ও রাজনৈতিক পরাধীনতাকে কাজী নজরুল ইসলাম প্রধানতম শত্রু হিসেবে শনাক্ত করেন সাহিত্যজীবনের একেবারে সূচনালগ্ন থেকে। এসব বিবিধ বিষয় নজরুলকে বিশুদ্ধ নান্দনিকতা ও সৌন্দর্যোপলব্ধিতে বার বার বিঘ্ন ঘটিয়েছে। ব্রিটিশ কলোনির সাংস্কৃতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে নজরুলের নান্দনিকতার পুনর্মূল্যায়ন তাই আজ আবশ্যক।[৪৩]

নজরুলের সাহিত্যকর্ম এবং তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক মতাদর্শ প্রকারান্তরে কলোনি ও এর ডিসকোর্সের বিরোধিতাই করেছে। এ প্রসঙ্গে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সমালোচক-মত হলো:

> বাংলা সাহিত্যে নজরুলই বোধ করি সবচেয়ে লড়াকু উপনিবেশবাদ-বিরোধী লেখক যাকে সামান্যতম ঔপনিবেশিক হীনম্মন্যতা স্পর্শ করেনি, যার স্বার্থতাড়িত ঔপনিবেশিক টানাপোড়েনের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।[৪৪]
>
> সামগ্রিকভাবে নজরুলের যে রাজনৈতিক পক্ষ ও সক্রিয়তা– গণতন্ত্রের, গণমুক্তির, স্বাধীনতার ও অসাম্প্রদায়িকতার, তার প্রত্যক্ষ প্রতিপক্ষ ঔপনিবেশিক শাসন।[৪৫]

সুতরাং আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক দর্শনের আলোকে নজরুলের সাহিত্যকর্ম ও দর্শনের বিশ্লেষণ আয়াসসাধ্য নয় বলে কেউ কেউ মনে করেন। তার কারণ ব্যাখ্যা করে সমালোচক লিখেছেন:

> নজরুল কতগুলো শব্দ তাঁর সৃষ্টিধর্ম ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহার করেছেন– যেমন, সুন্দর, প্রেম, সৈনিকতা, বিদ্রোহ, বিপ্লব, যৌবন ইত্যাদি। ... নজরুল কোনো প্রভাবশালী ডিসকোর্স মেনে চলেননি, নিয়েছেন কতগুলো 'ডিসকার্সিভ এলিমেন্ট', যেগুলো সমকালীন ও স্থানীয় বাস্তবতার প্রচণ্ড চাপে নতুনভাবে রূপায়িত হয়েছে। যেমন, তিনি স্বাধীনতা, বিপ্লব, যৌবন, মানুষ– এই ধারণাগুলো অনবরত ব্যবহার করেছেন। ধারণাগুলো

> পুরোপুরি অপশ্চিমা– এমন বলা যাবে না। কিন্তু সেগুলো পশ্চিমা ডিসকোর্সের আধিপত্যের মধ্যে, শৃঙ্খলা ও শিক্ষার সীমার মধ্যে রূপায়িত না হওয়ায় একটা নতুন রূপে হাজির হয়।[৪৬]

নজরুলের বিদ্রোহ, বিপ্লববোধ, স্বাধীনতার চরম আকাঙ্ক্ষা, সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি বিষয়ে তাঁর অসহিষ্ণু প্রতিবাদ-মুখরতা, উপনিবেশিত সময়ে দেশীয় রাজনীতির অসারতা সম্পর্কে আক্ষেপ, স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদী মানবত্বের চেতনা, তাঁর প্রেমবোধ সর্বোপরি সাহিত্যিকের স্বাধিকার, কর্তব্যবোধ ও সাহিত্যের ক্ষমতায় বিশ্বাস– এই সবেরই সমন্বয়ে সংগঠিত হয় তাঁর স্বতন্ত্র নন্দনতাত্ত্বিক বয়ান। যে নান্দনিক প্রত্যয় কিংবা বীক্ষণ সমকালের চলমানতার অংশীদার হয়েও বিশেষ এবং নৈর্ব্যক্তিক। নজরুলের বিদ্রোহের একটা বিচিত্র রূপ আছে এবং তার মধ্যে একটা মৌলিক ঐক্য ছিল, যেটা নজরুল তার 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'তে বলেছেন। 'গণ'কে সমাজের প্রাণকেন্দ্র রূপে প্রত্যক্ষ করা যে সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সেই 'গণচেতন সাহিত্য সৃষ্টির জন্য অপরিহার্য সকল গুণ তাঁর ভেতরে ছিল।'[৪৭] 'নির্যাতনের জাতি নাই, পীড়িতের নাই জাতি ও ধর্ম'– এরকম আরও অসংখ্য প্রত্যয় তাঁর মানবতার দর্শনকেও পৃথক করেছে এবং 'নজরুলের "মানবতাবাদ" পশ্চিমা "লিবারেল হিউম্যানিজমের"র সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।'[৪৮] এছাড়া উপনিবেশায়নের প্রতিক্রিয়ার ফল যে জাতীয়তাবাদী চেতনা– তার থেকে নজরুলের রাষ্ট্রচিন্তা, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সর্বোপরি নন্দনচিন্তার বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। ফলে তাঁর সাহিত্যকর্মকে প্রতিরোধের সাহিত্য এবং নন্দনতত্ত্বকে 'প্রত্যাখ্যানের নন্দনতত্ত্ব'[৪৯] বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে তাঁর সাহিত্যকর্মের ভাষা-বিবেচনাও খুব গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে রয়েছে সাংস্কৃতিক মতাদর্শ ও রাজনীতির প্রশ্ন, সমালোচক বলেন :

> উত্তর-ঔপনিবেশিক ডিসকোর্স ও সাহিত্যসৃষ্টিতে নজরুলের অপ্রতিরোধ্য ভূমিকা একারণেই আজ গুরুত্বপূর্ণ। কাজী নজরুল ইসলাম যে ভাষা সৃষ্টি করেছেন এবং তার মধ্যে বিচিত্র সমকালস্পর্শী পুরাণ ও অসামান্য বাক্‌প্রতিমার বিন্যাস করেছেন, তা তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যায়নের জন্য অতীব জরুরি।[৫০]

তাই ব্যক্তি কিংবা সাহিত্যের ভাষা হয়েও নজরুলের ভাষা 'জীবন নামক এক ব্যাপকতার ভাষা'।[৫১] যদি তাঁর সাহিত্য হয় 'প্রতিরোধের সাহিত্য', তাহলে তাঁর বিকাশ ও নির্মাণের ধরনকে কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্বের আওতায় বিচার করা সমীচীন নয়। কেননা বিশেষ রাজনৈতিক-দার্শনিক মত অথবা প্রচলিত-চর্চিত যে কোনো মতবাদের অনুগামী হিসেবে ভেবে নিলে নজরুলের সমগ্র শিল্পীব্যক্তিত্ব বিশেষত তাঁর নান্দনিকতার দর্শন খণ্ডিত হয়ে যায়।

নজরুলের নন্দনতত্ত্ব আসলে জনমানুষের নন্দনতত্ত্ব– যার মধ্যে পূর্বাপর অস্তিত্বশীল থাকে স্বয়ম্ভু শিল্পীব্যক্তিত্ব, ঐতিহ্যানুগ চলমানতা ও স্বতশ্চল বিদ্রোহের যুগপৎ প্রত্যয়, লোকসত্তার সপ্রতিভ, স্বতঃস্ফূর্ত সম্পৃক্তি, সময় ও বৃহৎ মানবের উত্তরণ-স্পৃহা সর্বোপরি মানুষের সর্বজনীন সার্বভৌমত্ব। এছাড়া নজরুল নিজেকে তাঁর সৃজনকর্মের মধ্য দিয়ে এমনভাবে গণ্ডির বাইরে নিয়ে গেছেন, যা তাঁর ব্যক্তিত্বের চূড়ান্ত প্রকাশ বা প্রসার ঘটিয়েছে– শিল্প সৃজন কিংবা শিল্পচেতনায় নিজেকে বিকশিত ও প্রসারিত করার এই উচ্চতর প্রক্রিয়া থেকে নজরুলকে 'নান্দনিক অস্তিত্ববাদী' হিসেবে

চিহ্নিত করা সম্ভব। অস্তিত্ববাদী অর্থে তাঁর শিল্প-সৃজন আত্ম-অতিক্রমণের পথও নির্মাণ করে, যা তাঁর স্বাধীন, অস্তিত্বশীল সারসত্তার রূপকার হয়ে ওঠে। নজরুল এভাবেই ক্রমাগত সৃষ্টি করেছেন তাঁর আপন নন্দনতত্ত্বের জগৎ; তাই নজরুলের নন্দনতত্ত্ব পাঠের বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা ও সমকালে তা চর্চার প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করা যায় না।

তথ্যনির্দেশ

১ সূত্র: Oxford Languages, URL: languages.oup.com

২ 'সৌন্দর্যতত্ত্বের উদ্ভব প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে ব্যাবিলন, মিশর, ভারতবর্ষ এবং চীনের দাস প্রধান সমাজে লক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালে গ্রীসের হেরাক্লিটাস, সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিস্টটল এবং অপরাপর দার্শনিক রচনায় সৌন্দর্যতত্ত্বের জটিলতর বিকাশের সাক্ষাত পাই। প্রাচীন রোমের দার্শনিক লুক্রেশিয়াস এবং হোরেসও সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন।' সরদার ফজলুল করিম, *দর্শন কোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৩, পৃ. ১৬

৩ 'It is clear from this history that aesthetic, with its specialized references to ART, to visual appearance, and to a category of what is 'fine' or 'beautiful', is a key formation in a group of meanings which at once emphasized and isolated SUBJECTIVE sense-activity as the basis of art and beauty as distinct, for example, from *social* or *cultural* interpretations. It is an element in the divided modern consciousness of art and society: a reference beyond social use and social valuation which, like one special meaning of culture, is intended to express a human dimension which the dominant version of *society* appears to exclude.' Raymond Williams, *Keywords: A Vocabulary of Culture and Society*, Oxford University Press, New Work, 1985, p. 15

৪ নব্য-ধ্রুপদীবাদ বা নন্দনভাবনা বলতে আঠারো ও উনিশ শতকের ইউরোপের আলংকারিক ও দৃশ্যগত শিল্পকলা, থিয়েটার, সংগীত এবং স্থাপত্যশিল্পকে ঘিরে এক সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে বোঝানো হয়ে থাকে। নব্য-ধ্রুপদী সাহিত্যতচিন্তা অনুযায়ী বিশুদ্ধ শিল্পকলা মূলত যুক্তি ও আনুশাসনিক শৃঙ্খলার অধীন।

৫ বিনয়কুমার মাহাতা, 'এলিয়ট, ইয়েটস ও বোদলেয়ার', *নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা* (তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ২০০৮, পৃ. ১০৪

৬ ক্যাথারিন এভারেট গিলবার্ট ও হেলমুট কুন, *নন্দনতত্ত্বের ইতিহাস* (শফিকুল ইসলাম অনূদিত), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ২০২২, পৃ. ৫৫৯

৭ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুলের প্রবন্ধ সমগ্র* (মুহম্মদ নূরুল হুদা ও রশিদুন্ নবী সম্পাদিত) নজরুল ইনস্টিটিউট, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ. ৩১

৮ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুলের প্রবন্ধ সমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

৯ প্রাগুক্ত

১০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪

১১ প্রাগুক্ত

১২ প্রাগুক্ত

১৩ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৪, পৃ. ৩৭৬

১৪ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১

১৫ প্রাগুক্ত

১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৯

১৭ আবু হেনা আবদুল আউয়াল, *নজরুলের সাহিত্যচিন্তা ও তাঁর সাহিত্য*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা ২০১০, পৃ. ১০৮

১৮ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুলের প্রবন্ধ সমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

১৯ প্রাগুক্ত

২০ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'নজরুলের কবিতায় আত্মসম্বোধন ও আত্মঘোষণা', *নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকা (বিশেষ সংখ্যা)*, [মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত], নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা ২০০১, পৃ. ৪০৭

২১ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

২২ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুলের প্রবন্ধ সমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

২৩ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুলের অভিভাষণ*, কবি নজরুল ইনিস্টিটিউট, ঢাকা ২০১৮, পৃ. ১২-১৩

২৪ Mohammad Nurul Huda, *Nazrul's Aesthetics and other aspects*, Nazrul Institute, 1st edition, Dhaka 2001, p. 25

২৫ সালাহউদ্দীন আইয়ুব, *নজরুল-সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচার*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ. ২৩

২৬ Mohammad Nurul Huda, *Nazrul's Aesthetics and other aspects*, ibid, p. 36

২৭ রহমান হাবিব, *নজরুল নন্দনতত্ত্ব: পুনর্গঠন ও সূত্রায়ণ*, নবযুগ, ঢাকা ২০০৫, পৃ. ৭৮

২৮ মুহম্মদ নূরুল হুদা, 'নজরুলের নান্দনিকতা প্রসঙ্গে', *নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকা, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংখ্যা* (মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত), নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা ১৯৯৯, পৃ. ১২৯

২৯ সালাহউদ্দীন আইয়ুব, *নজরুল-সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

৩০ কাজী মোতাহার হোসেনকে লেখা (০৮/০/১৯২৮) একটা চিঠিতে নজরুল লিখছেন– 'কোলাহল অনেক করেছি, এইবার গানে গানে প্রাণের আলাপ।' উদ্ধৃত, কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯১

৩১ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১

৩২ পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০

৩৩ Nick Zangwill, *Music and Aesthetic Reality: Formalism and the limits of description*, Routledge 2016, p. 20

৩৪ সালাহউদ্দীন আইয়ুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৩৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৩৬ মুহম্মদ নূরুল হুদা, 'নজরুলের নান্দনিকতা প্রসঙ্গে', পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭

৩৭ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৬

৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭

৩৯ মুহম্মদ নূরুল হুদা, 'নজরুলের নান্দনিকতা প্রসঙ্গে', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

৪০ আবদুল মান্নান সৈয়দ, *কাজী নজরুল ইসলাম জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ* (আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত), অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা ২০১৮, পৃ. ৩০

৪১ উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

৪২ নজরুল লিখেছেন: 'আমি মুসলমান– কিন্তু আমার কবিতা সকল দেশের, সকল কালের এবং সকল জাতির। কবিকে হিন্দু-কবি, মুসলমান কবি ইত্যাদি বলে বিচার করতে গিয়েই এত ভুলের সৃষ্টি।' উদ্ধৃত, কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭১। এছাড়া নান্দনিকতার দর্শন বা ধর্মীয় মতাদর্শের সাথে বিরোধ অনুভব করে সমকালে যেসব অভিযোগ তাঁকে করা হয়েছিল, তার জবাবও দিয়েছেন নজরুল। ১৯২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর কলকাতা এলবার্ট হলে হিন্দু-মুসলমানের পক্ষ থেকে বিপুল সমারোহে সংবর্ধিত হন তিনি। সেখানে দেয়া প্রতিভাষণে তিনি বলেছিলেন : 'যাঁরা আমার নামে অভিযোগ করেন তাদের মত হলুম না বলে, তাঁদেরকে অনুরোধ, আকাশের পাখিকে, বনের ফুলকে, গানের কবিকে তাঁরা যেন সকলের করে দেখেন। ... সুন্দরের ধ্যান, তার স্তবগানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কুলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি, সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি বলেই কবি।' কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুলের অভিভাষণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

৪৩ সালাহউদ্দীন আইয়ুব, *নজরুল-সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৪৪ আজফার হোসেন, 'আমাদের নজরুল ও গর্জে-ওঠা ত্রিমহাদেশীয় কাব্যতত্ত্ব', কালের খেয়া, ২৩ মে, ঢাকা ২০০৮
৪৫ মোহাম্মদ আজম, *কবি ও কবিতার সন্ধানে*, বাতিঘর, ঢাকা ২০২০, পৃ. ৯৫
৪৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭-৯৮
৪৭ সুশীলকুমার গুপ্ত, *নজরুল-চরিতমানস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৩৮৪, পৃ. ৩৪১
৪৮ মোহাম্মদ আজম, *কবি ও কবিতার সন্ধানে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২
৪৯ সালাহউদ্দীন আইয়ুব, *নজরুল-সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
৫০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
৫১ মুহম্মদ নূরুল হুদা, 'নজরুল ভাষা-বিদ্রোহ: প্রস্তাবনা', *নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকা- বিশেষ সংখ্যা* (মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত), নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা ২০০১, পৃ. ৫০৫

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বিয়াল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩১/ডিসেম্বর ২০২৪

পূর্ববাংলায় লবণ সংকট (১৯৫০-১৯৫১)

সাজেদা বেগম*

সারসংক্ষেপ

দেশভাগের পর পূর্ববাংলায় সৃষ্ট নানামুখী সংকটের মধ্যে ১৯৫০-৫১ সালের লবণ সংকট ছিল অন্যতম। আলোচ্য সময়ে এ অঞ্চলে লবণের দুষ্প্রাপ্যতার সাথে সাথে এর মূল্যও ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। লবণের বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চলে গেলে সরকার পাকিস্তানের বাইরে থেকে লবণ আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এতে দেশের বাইরে থেকে কম দামে লবণ পাওয়ার যে সম্ভাবনা ছিল সেটিও বন্ধ হয়ে যায়। উপকূলীয় এলাকায় লবণ তৈরির যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সরকার এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এতে জনমনে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়। পাকিস্তান আমলে পূর্ববাংলার মুক্তিসংগ্রাম, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা সম্পাদিত হলেও ১৯৫০-৫১ সালের লবণ সংকট নিয়ে কোনো গবেষণা হয়নি। বর্তমান প্রবন্ধে অনালোচিত লবণ সংকট নিয়ে গবেষণা করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। গবেষণায় লবণ সংকট সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তৎকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উল্লেখিত সংবাদ এবং সরকারের লবণ নীতিসহ বিভিন্ন আরকাইভাল ডকুমেন্ট পর্যালোচনা করা হয়েছে। পূর্ববাংলায় এ সময়ে যে লবণ সংকট দেখা দিয়েছিল তা কেন হয়েছিল, কীভাবে হয়েছিল এবং তার ফলাফল কী হয়েছিল তা বর্তমান গবেষণায় বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে।

চাবি শব্দ : পূর্ববাংলা, লবণ সংকট, জনদুর্ভোগ, সরকারি পদক্ষেপ

১. ভূমিকা

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পরপর পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে দেখা দেয় খাদ্য সংকট। ধান, চাল, তেল, হলুদ, চিনিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। শুরুতেই দেশটির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক নানা ধরনের সংকটের সাথে পূর্ববাংলায় খাদ্য সংকট যুক্ত করে ভিন্ন মাত্রা। বলা প্রয়োজন, পূর্ববাংলা আগে থেকেই অবহেলিত থাকায় সংকটের মাত্রা ছিল বেশি। ১৯৫০-৫১ কালপর্বে এই সংকটের সাথে যুক্ত হয় লবণ সংকট। কেবল ঢাকা শহরের বাজারগুলোতেই নয় সমগ্র প্রদেশে দুই-তিন আনা মূল্যের প্রতিসের লবণ বিক্রি হয়েছে ১৫-১৬ টাকায়। পূর্ববাংলার জনসাধারণ নিত্যপ্রয়োজনীয় এই পণ্যটি তখন বেশি দামে ক্রয় করতে বাধ্য হয়। লবণ উৎপাদনের অঞ্চল যেমন চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী থেকে সংকটপূর্ণ এলাকায় লবণ সরবরাহ করতে সরকারি নীতির অব্যবস্থাপনা সংকটকে বহুগুণ বৃদ্ধি করেছিল। অথচ পূর্ববাংলায় বিশেষ করে চট্টগ্রাম, খুলনা, নোয়াখালী ও বরিশালের উপকূল অঞ্চলে লবণ উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু লবণ উৎপাদনের ওপর উচ্চহারে ট্যাক্স বসিয়ে এ সম্ভাবনা নস্যাৎ করা হয়। উপরন্তু করাচি থেকে আমদানি করার লক্ষ্যে সরকার স্থানীয় লবণ উৎপাদনের

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কিন্তু লবণের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে সরকারি কোনো কার্যকর পদক্ষেপ প্রতীয়মান হয়নি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হয় এবং সম্পাদকীয় কলামে লবণের মূল্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। লবণের এই মূল্য বৃদ্ধি এবং এর ফলে যে সংকট তৈরি হয় সে সম্পর্কে আমাদের জানামতে কোনো গবেষণা বা অনুসন্ধান হয়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান প্রবন্ধে ১৯৫০-৫১ সালের লবণ সংকটকে গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রবন্ধে দুই ধরনের তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য হিসেবে ১৯৪৭ সাল পরবর্তী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বিশেষ করে *দৈনিক আজাদ*, *নওবেলাল*, এবং বিভিন্ন আরকাইভাল তথ্য যেমন গেজেট, গেজেটিয়ার, সরকারি আদেশ-প্রজ্ঞাপন, জেলা পর্যায়ের রেকর্ড প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য হিসেবে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

২. পূর্ববাংলা লবণ-নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৫০ ও সংকটের সূচনা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই সারা বিশ্বে ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা দেখা দিয়েছিল। যার প্রভাব পূর্ববাংলাতেও লক্ষণীয়। এর মধ্যে লবণের সংকট বা মন্দা অব্যাহত ছিল। তবে এই মন্দা যতটা না বৈশ্বিক ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল আঞ্চলিক। বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যে যে সংকটগুলো দেখা দিয়েছিল সেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ছিল। কিন্তু পূর্ব বাংলার লবণ সংকটটি স্বতন্ত্র এবং বর্তমান গবেষণা বিষয়ের কাল-পরিসর ১৯৫০-৫১। বিশ্বের অর্থনৈতিক সংকটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব যদিও গুরুত্বপূর্ণ তবে পূর্ববাংলার লবণের ক্ষেত্রে তা ততটা উল্লেখযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রত্যেক দেশেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। পূর্ববাংলাতেও ১৯৪৫-৪৬ সালের পর থেকে প্রতিটি জিনিসের মূল্য বেড়ে যায়। তবে অন্য জিনিসপত্রের চেয়ে খাদ্যদ্রব্য বিশেষ করে চালের মূল্য ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৬ সালে পূর্ববাংলার সমস্ত জেলায় চালের মূল্য মনপ্রতি গড়ে ১৭ টাকা ছিল। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর দেখা যায় পূর্ববাংলার চালের মূল্য বৃদ্ধি পায় ৪০ থেকে ৫০ টাকা।[১] বস্তুত ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর পূর্ববাংলার খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা স্থবির হয়ে পড়ায় সরবরাহ ছিল অনেক কম। সরবরাহ কম থাকায় খাদ্যের মূল্যও ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ বিপুল খাদ্য ঘাটতির সম্মুখীন হয়।[২] ১৯৪৯ সালে এসে খাদ্য পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটে। তবে ১৯৫০ সালের দিকে উৎপাদন ভালো হওয়ায় খাদ্য পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি ঘটে। কিন্তু অল্পদিনের ব্যবধানেই পরিস্থিতির অবনতি ঘটে।[৩]

১৯৫১ সালের শুরুর দিকে পূর্ব বাংলায় খাদ্য পরিস্থিতি পুনরায় ভেঙে পড়ে। ঐ বছরেই খাদ্য সমস্যার সাথে লবণ সংকট যুক্ত হলে দুর্দশা সহ্যক্ষমতার বাইরে চলে যায়। ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে পূর্ববাংলার সর্বত্রই লবণ সংকট চরম আকার ধারণ করে। কৃষকদের মাথাপিছু লবণ ব্যয় অনেক বেড়ে যায়। অর্থাৎ দুই আনা মূল্যের লবণের দাম বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৬ টাকা। ১৯৫০ সালের ৩০ আগস্ট 'পূর্ব বাংলা লবণ-নিয়ন্ত্রণ আদেশ' পাস হওয়ার পর লবণের দাম বৃদ্ধি

পেতে থাকে।[৪] এই আদেশের মাধ্যমে পাইকারি মূল্য নির্ধারণ করে স্থানীয় অফিসারদের নির্ধারিত মূল্যে লবণ বিতরণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। তবে খুচরা ব্যবসায় এই আদেশের বাইরে ছিল। প্রাদেশিক সরকারের 'লবণ নিয়ন্ত্রণ আদেশ ৩১ আগস্ট, ১৯৫০'-এর মাধমে জনসাধারণ খুচরা ব্যবসায়ীদের খপ্পরে পড়ে যায়। পাইকারি বিক্রেতাদের কাছ থেকে লবণ জনসাধারণের কাছে পৌঁছাতে বহুবার হাতবদল হয় এবং মূল্য বেড়ে যায় বস্তাপ্রতি ৩০ থেকে ৪০ টাকা পর্যন্ত। এর ফলে চোরাচালান ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়।[৫] ১৯৫১ সালের দিকে পূর্বাংলার নারায়ণগঞ্জ জেলার কোথাও লবণ পাওয়া যাচ্ছিল না। যদিও কিছু কিছু জায়গায় পাওয়া গেছে তবে তার মূল্য ছিল অনেক বেশি। গ্রামাঞ্চলে গিয়ে অনেকেই এই লবণ ক্রয় করেছে ১০ থেকে ১৫ টাকা সের দরে। বরিশালের উজিরপুর এলাকায় প্রতিসের লবণ ৫ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে। তবে সন্ধ্যার পর লবণের দাম বেড়ে হয়েছে ৬ থেকে ৭ টাকা পর্যন্ত। ফরিদপুরে বিক্রি হয়েছে ৫ থেকে ৬ টাকা। তবু লবণ সময়মতো পাওয়া যেতো না। ঢাকায় ৩ টাকা সের এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমায় লবণ সেরপ্রতি ৪ টাকা থেকে ৬ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। লবণের অভাবে এই মহকুমার পল্লি অঞ্চলে 'লবণ দুর্ভিক্ষ' দেখা দিয়েছে। অসামরিক বিভাগ ডিলারদের মাধ্যমে প্রত্যেক ইউনিয়নে কিছু লবণ প্রেরণ করলেও ডিলাররা তা মাঝপথেই চোরাবাজারে বিক্রি করে দিতো। নোয়াখালীতে লবণের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় সরবরাহ বিভাগ থেকে প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক ইউনিটে মাত্র এক ছটাক লবণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেটিও পর্যাপ্ত না থাকায় তা রীতিমতো পাওয়া যেতো না।[৬]

দৌলতখাঁনে লবণের অভাবে জনগণ অসুবিধায় পড়েছে। লবণের মূল্য প্রতিসের চার টাকা ছিল কিন্তু সেটাও প্রয়োজন অনুযায়ী পাওয়া যেতো না। বিক্রমপুরের হাট-বাজারগুলোতে লবণের মূল্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। বলা হচ্ছিল দাম আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। কালিগঞ্জে রেশন কার্ডে সামান্য পরিমাণ লবণ দিলেও বাজারে প্রতিসের লবণ বেশি মূল্যে বিক্রি হতো। নেত্রকোণায় লবণের মূল্য ছিল সেরপ্রতি ৮ টাকা।[৭] লবণের মূল্য বৃদ্ধি পূর্ববাংলার জনগণকে দুর্দশায় ফেলে দিয়েছিল। অল্প কিছুদিন আগেও লবণের দাম ১ টাকা এবং ১ টাকা ৪ আনা পর্যন্ত ছিল। এই মূল্যেই গরীব জনসাধারণের পক্ষে লবণ কিনে দৈনন্দিন চাহিদা মেটানো সম্ভব হতো না। সেখানে ১৬ টাকা সের লবণ কেনা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। পূর্ববাংলার জনসাধারণের লবণের চাহিদা ছিল বছরে প্রায় ৭৫ লক্ষ মণ। কিন্তু কুটির শিল্পের মাধ্যমে কেবল ৩০ লক্ষ মণ লবণ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এর ওপর আবার সরকার লবণের ওপর শুল্ক ধার্য করেছিল। এমনিতেই লবণের অভাব তার ওপর লবণের ওপর শুল্ক ধার্য এই দুই মিলে জনসাধারণের দুর্দশা ভীষণ বাড়তে থাকে। ইতঃপূর্বে পশ্চিম পাকিস্তানে কখনই লবণ ১ টাকায় বিক্রি হয়নি। করাচিতে লবণের যথেষ্ট মজুত থাকায় লবণের মূল্য ২ আনার বেশি ছিল না।[৮] করাচিতে লবণ সেরপ্রতি ২ আনা বিক্রি হলেও পূর্ববাংলায় তা ছিল ৬ আনা থেকে ৮ আনা।[৯] লবণের মূল্যে এই ব্যাপক পার্থক্যের কারণে সাধারণ জনগণের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়। শহরের বিভিন্ন ছাত্রাবাস থেকে ছাত্ররা একত্র হয়ে মিছিল বের করে সরবরাহ মন্ত্রী সৈয়দ আফজালের বাসভবনে যায়। এরপর সেক্রেটারিয়েটের সামনে গিয়ে তারা শ্লোগান দেয়, 'সরবরাহ মন্ত্রী গদি ছাড়', 'লবণ কেলেঙ্কারির তদন্ত চাই', 'চোরাকারবারি কালোবাজারি বন্ধ কর।' এই বিক্ষোভের পর ঢাকা রেশনিং কর্তৃপক্ষ

ছাত্রাবাসগুলোতে কিছু পরিমাণ লবণ সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিল না।[১০]

পূর্ববাংলায় লবণ সংকট তীব্র আকার ধারণ করে ১৯৫১ সালের শেষ দিকে। কেবল ঢাকা শহরের বাজারগুলোতেই চার আনা মূল্যের লবণ বিক্রি হয়েছে ৮ টাকায়। ১৯৫১ সালে সৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে বলা হয়:

> লবণ লইয়া যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তা সম্পূর্ণ মানুষের তৈরী। কেন্দ্রীয় সরকার এই শিল্পের উপর এত বেশি ট্যাক্স বসাইয়াছে এবং বাধা নিষেধ আরোপ করিয়াছে যে তাহাতে প্রদেশে লবণ উৎপাদন করিবার কোন আশাই করা যায় না। অন্যদিকে সরকার বিদেশ হইতে লবণ আমদানী নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়ায় বাহির হইতে কম দামে লবণ পাওয়ার সমস্ত পথই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাই ভারতে যখন তিন আনা দরে রাশিয়ার লবণ বিক্রয় হইতেছে তখন আমরা করাচির লবণ কিনিতে গিয়া প্রতি সেরের জন্য ৮/৯ টাকা খরচ করিতে বাধ্য হইতেছি।[১১]

এর থেকে বোঝা যায় যে, বিশ্ববাজারে যে লবণের মূল্য মাত্র চার আনা সেই লবণ ৮/৯ টাকা মূল্যে ক্রয় করতে গিয়ে পূর্ববাংলার দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণকে নিদারুণ কষ্ট করতে হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় হওয়ায় জনগণও দ্রব্যটি বেশি দামে ক্রয় করতে বাধ্য হয়েছে। আর দরিদ্র জনগণের পরিশ্রমে অর্জিত এই অর্থ বিদেশি পুঁজিপতিরা ব্যাপকভাবে লুণ্ঠন করে পূর্ববাংলাকে অর্থনৈতিক দিক থেকে পঙ্গু করে দিয়েছে।

২ (ক) সংকটের কারণ

লবণ সংকটের প্রধান কারণ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় এলাকায় লবণ উৎপাদনে নিষেধাজ্ঞা, লবণের ওপর অত্যধিক আমদানি শুল্ক এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রয়োজনীয় লবণ আমদানিতে সরকারের ব্যর্থতা। পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসায়িক স্বার্থেই মূলত লবণ উৎপাদন নিষিদ্ধ ছিল। দুর্দশা বৃদ্ধি পেলেও এর বিরুদ্ধে শক্তিশালী কোনো সংগঠনের প্রতিরোধ ছিল না।[১২] ঢাকা বণিক সমিতির সভাপতি শওকত হোসেন ১৯৫১ সালে লবণ সংকট সম্পর্কে বলেন, লবণের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে পূর্ববাংলার সর্বত্রই বিশৃঙ্খল পরিবেশ ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। এর অন্যতম কারণ ছিল করাচি থেকে লবণের অপর্যাপ্ত সরবরাহ এবং সরকার নিযুক্ত লোভী আড়তদারদের অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আকাঙ্ক্ষা। পশ্চিম পাকিস্তানে ৫টি লবণ তৈরির কারখানা ছিল এবং সেখানে বছরে ৫২ লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হতো। বছরে সেখানে খরচ হতো ৬ লক্ষ মণ লবণ। কিন্তু পূর্ববাংলায় বছরে ৭৫ লক্ষ মণ লবণের প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও এখানে লবণ উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত কোনো কারখানা ছিল না। ফলে বছরে এখানে প্রায় ৩৯ লক্ষ মণ লবণের ঘাটতি দেখা দেয়। এ অবস্থায় লবণের উৎপাদন বৃদ্ধি বা দেশের বাইরে থেকে লবণ আমদানি করে লবণ সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল। কিন্তু সরকার দেশীয় শিল্পকে উৎসাহ দেয়ার জন্য বাইরে থেকে লবণ আমদানি নিষিদ্ধ করে দেয়। শওকত হোসেন বলেন, তিনি সরকারকে ভারত ও অন্যান্য বিদেশি রাষ্ট্র থেকে লবণ আমদানির অনুমতি দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি। আবার খাদ্য মন্ত্রীর কাছে এমন সুপারিশ করলেও এ সম্পর্কে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।[১৩] বাণিজ্যমন্ত্রী ফজলুর রহমান বলেন, সম্পূর্ণ

দায়িত্ব ছিল প্রাদেশিক সরকারের ওপর। সরবরাহ যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও প্রাদেশিক সরকার লবণের সঠিক বণ্টন বা বিতরণ করতে পারেনি। আর প্রাদেশিক সরকারের এই অবহেলার কারণেই লবণের দাম বেড়ে যায়। সরবরাহ সচিব বলেছেন, লবণের মূল্য সর্বোচ্চ বেড়েছে সেরপ্রতি ৬ টাকা। তিনি বলেন যে, রাজশাহীতে লবণের দাম অনেক কম ছিল অর্থাৎ সের প্রতি ১ টাকা মাত্র। আবার নবাবগঞ্জেও লবণের দাম ছিল সের প্রতি মাত্র ১ টাকা। মূলত সীমান্ত এলাকায় লবণ চোরাচালান হয়ে আসত বলে সেখানে লবণের দাম অনেক কম ছিল। রাজশাহী ও নবাবগঞ্জে চোরাকারবারির মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা লবণ বিক্রি করেছে বলেই লবণের মূল্য এত কম ছিল। অথচ অন্যান্য জায়গায় অর্থাৎ নারায়ণগঞ্জেই লবণের মূল্য সেরপ্রতি ছিল ১৫ ও ১৬ টাকা।[১৪] ত্রিপুরার ভাঁকশারেও সেরপ্রতি লবণ বিক্রি হয়েছে ১৬ টাকায়।[১৫] কিন্তু এই মূল্য বৃদ্ধির কথা তৎকালীন সরকার স্বীকার করেনি।

শওকত হোসেন পূর্ববাংলায় লবণের দুষ্প্রাপ্যতার কারণ উল্লেখ করে বলেন, লবণ সংকট সম্পর্কে বিভিন্ন মহল বিভিন্ন মতামত দিলেও এর আসল কারণ কারও জানা ছিল না। তবে করাচি থেকে অপর্যাপ্ত সরবরাহই লবণ সংকটের কারণ বলে উল্লেখ করা হয়। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত আড়তদারদের অতিরিক্ত মুনাফার লোভই বর্তমান পরিস্থিতির কারণ বলে তিনি উল্লেখ করেন। সরকার কর্তৃক লবণ আমদানি বন্ধের কারণেই লবণের নিশ্চিত ঘাটতি দেখা দেয়।[১৬]

১৯৪৮ সালের জুন মাসে লিখিত *"A Few Words on Salt Industry in East Bengal"* নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, এসময় পূর্ববাংলায় লবণের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল। নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেওয়া হলো–

জেলা	লবণ উৎপাদনের সাথে জড়িত কর্মচারীর সংখ্যা	উৎপাদনের পরিমাণ (মণ হিসেবে)
খুলনা	৬০,০০০	১,৭০,০০০
নোয়াখালী	২,৫০,০০০	১,০০,০০০
চট্টগ্রাম	৫০,০০০	২,০০,০০০[১৭]

(সূত্র: Government of Bengal & East Pakistan, Department : Commerce, Branch : Labour, Proceedings: B, Sl No: 01, List No: 106, Year 1953, p. 4.)

আবার সমুদ্র ও স্থলপথে পূর্ববাংলায় ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত লবণ আমদানির দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়–

- দেশভাগের আগে ১৯৪৬ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৪৭ সালের মার্চ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যম সমুদ্রপথে লবণ আমদানি করা হয় ৩০ লক্ষ মণ।
- এপ্রিল ১৯৪৮ থেকে মার্চ ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যম সমুদ্রপথে লবণ আমদানির পরিমাণ ছিল ৩৮ লক্ষ মণ।
- আবার এপ্রিল ১৯৪৮ থেকে মার্চ ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যম স্থলপথে পূর্ববাংলায় লবণ আমদানির পরিমাণ ছিল ২২ লক্ষ মণ।[১৮]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এসময় চট্টগ্রামসহ খুলনা ও নোয়াখালী জেলারও লবণ উৎপাদন বেড়ে গিয়েছিল। ওইসব জেলায় লবণ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠার একটি সম্ভাবনা তৈরি হয় এবং এর ফলে প্রদেশের লবণের চাহিদা পূরণ হবে বলে আশা করা হয়।[১৯]

কিন্তু পূর্ববাংলার অন্যতম এই কুটির শিল্প লবণ দেশভাগের আগে সমাদৃত থাকলেও দেশভাগের পর তা ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। প্রদেশের লবণের চাহিদা মেটাতে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যারা লবণ উৎপাদন করতেন তাদের জমির খাজনা উচ্চহারে বৃদ্ধি করা হয়। অন্য জমির জন্য যেখানে খাজনা দিতে হতো বিঘা প্রতি ১২ আনা সেখানে কেবলমাত্র লবণ উৎপাদনের জন্য জোতদার শ্রেণিকে খাজনা দিতে হতো বিঘা প্রতি ৫০ টাকা।[২০] পূর্ববাংলায় লবণ তৈরি হতো। কিন্তু মুসলিম লীগের মন্ত্রীরা এই লবণ তৈরির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে ১৯৫১ সালের দিকে পূর্ববাংলায় লবণ সংকট তৈরি হয়। সরকারি দমননীতির ভয়ে সাধারণ জনগণ এই লবণের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারেনি।[২১]

২ (খ) সংকট মোকাবিলায় সরকারি পদক্ষেপ

পূর্ববাংলায় প্রতি মাসে লবণের চাহিদা ছিল প্রায় ৬ লক্ষ মণ। সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়, প্রদেশে লবণের যে অভাব দেখা দিয়েছে সে সম্পর্কে সরকারের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে লবণ প্রেরণেরও ব্যবস্থা করেছে। এরই মধ্যে ১ লক্ষ ৬০ হাজার মণ লবণ জাহাজে করে চট্টগ্রাম বন্দরে প্রেরণ করা হয়েছে এবং খুব তাড়াতাড়ি আরও প্রেরণ করা হবে বলে জানান কেন্দ্রীয় খাদ্য সচিব পীরজাদা আবদুস সাত্তার। প্রাদেশিক সরবরাহ সচিব সৈয়দ আফজাল হোসেন বলেন, 'পূর্ববাংলায় লবণের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে।'[২২] প্রদেশের লবণ সংকট মোকাবিলায় পূর্ববঙ্গ সরকার রেশন গ্রাহকদেরকে লবণ সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেয়। সরকারি স্টোর, রেশন দোকান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মালিক কর্তৃক পরিচালিত দোকান প্রভৃতি থেকে তাদেরকে লবণ সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৫১ সালের ২৬ অক্টোবর থেকে মিহি লবণ পাঁচ আনা এবং মোটা লবণ চার আনা সের দরে রেশন কার্ডে সরবরাহ করা হবে বলেও স্থির করা হয়।[২৩]

লবণের অভাব দূর এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করতে প্রাদেশিক সরকার আদর্শ কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অল্প মূলধন দিয়ে ৭টি কারখানা স্থাপন করার কথা বলা হয়। এর মধ্যে খুলনায় ২টি, কক্সবাজারে ৩টি, নোয়াখালীতে ১টি এবং বাকেরগঞ্জে (বর্তমান বরিশাল) ১টি কারখানা স্থাপনের কথা বলা হয়। এছাড়া যেকোনো উপকূলীয় অঞ্চলের উপযুক্ত স্থানকে 'লবণ এলাকা' বলে ঘোষণা করে তা খাসমহলের আওতায় নিয়ে আসার এবং লবণ শিল্পের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও ঘোষণা করে সরকার। ফলে লবণের উৎপাদন বেড়ে যাবে এবং মণপ্রতি ৪ টাকা হারে লবণ পাওয়া যাবে। এই ৭টি কারখানা থেকে মোট ৩৫ হাজার মণ লবণ উৎপাদিত হবে যার মূল্য প্রায় ১,৪০,০০০ টাকা।[২৪] প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমীন করাচি থেকে ৭ থেকে ৮ লক্ষ মণ লবণ পূর্ববাংলায় আনার ব্যবস্থা করেছিলেন। অথচ লবণ সংকটের কারণ তারা দেখাতে

পারেননি। পূর্ববাংলায় কেন এই সংকট দেখা দিয়েছিল, লবণের মজুত কোথাও আছে কিনা এসব কিছু বিবেচনা বা তদারকি ছাড়াই হঠাৎ করে করাচি থেকে লবণ আমদানি করা হয়।[২৫] প্রদেশের লবণের সরবরাহ বৃদ্ধি করতে এক সপ্তাহের মধ্যে আরও ৬ লক্ষ ৬৩ হাজার মণ লবণ পূর্ববাংলায় প্রেরণ করা হবে বলে সরকার পক্ষ থেকে জানানো হয়। এরপর করাচি থেকে আরও ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার মণ লবণ পূর্ববাংলায় আসবে। মোটকথা ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যেই এখানে লবণ আমদানি করা হবে ১১ লক্ষ মণ। ফলে লবণের মূল্য ও অভাব দুটাই কমে আসবে।[২৬]

পূর্ববাংলায় খুব সহজেই ৮০ লক্ষ মণ লবণ তৈরি করা যেতো। তা না করে পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি থেকে লবণ আমদানি করা হয়েছে যা ছিল বিলেত থেকে লবণ আমদানি করার মতো। এখান থেকে বছরে প্রায় ৩০ লক্ষ মণ লবণ আমদানি করা হতো।[২৭] লবণ আমদানি না করে প্রদেশের স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং সস্তায় জনসাধারণের নিকট লবণ পৌঁছানোর জন্য দ্রব্যটির উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি। প্রদেশের ৭০ থেকে ৮০ লক্ষ মণ লবণ উৎপাদনের জন্য সরকার ৬ মাসের জন্য বরাদ্দ রেখেছে মাত্র ১৮ হাজার টাকা। ফলে উৎপাদন কম হয়েছে এবং সংকটের মাত্রা বেড়ে গেছে। পূর্ববাংলায় যদি ঠিকমতো এবং পর্যাপ্ত লবণ তৈরি করা যেতো তাহলে দেশের প্রায় সাড়ে চার কোটি লোকের প্রয়োজনীয় লবণ উৎপাদনের পরেও বিদেশে লবণ রপ্তানি সম্ভব হতো। কিন্তু তা না করে পূর্ববাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীল করে রাখা হয়।[২৮]

লবণের মোট উৎপাদন নির্দিষ্ট করার আগে বাণিজ্যিকভাবে লবণ উৎপাদনের স্থান এবং বাজার বিবেচনা করার প্রয়োজন ছিল, যেখানে সহজ যাতায়াতের মাধ্যমে লবণ পরিবহন সম্ভব হবে। সমুদ্রের নিকটবর্তী মহেশখালী ও কুতুবদিয়া দ্বীপে লবণ উৎপাদন করে সহজেই চট্টগ্রাম বন্দরে পরিবহন করা যেতো। এছাড়া চট্টগ্রাম থেকে রেলপথের মাধ্যমে বিভিন্ন বাজারেও পরিবহন করা যেতো।[২৯] কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তা না করে লবণ চাষের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের ছাঁটাই এবং লবণের ওপর ট্যাক্স বসিয়ে দেয়। আবার শর্ত প্রদান করা হয় যে, এখন পশ্চিমাঞ্চল থেকে ৩০ লক্ষ মণ লবণের পরিবর্তে ১ কোটি মণ লবণ আমদানি করা হবে। অর্থাৎ পূর্ববাংলাকে লবণের জন্য সম্পূর্ণভাবে করাচির ওপর নির্ভর করে রাখতে চেয়েছিল সরকার। সেই সাথে তাদের আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববাংলাকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ না করা।[৩০]

করাচি থেকে একচেটিয়াভাবে লবণ সরবরাহের কারণে ব্যবসায়ীরা লবণের মূল্য বৃদ্ধি করেছিল। প্রাদেশিক সরকার লবণের মূল্যে ন্যায়সঙ্গত সমতা আনতে একটি সংবিধিবদ্ধ আইন জারি করে। তদনুসারে পূর্ববাংলা লবণ নিয়ন্ত্রণ আদেশ প্রচার করা হয় ১৯৫০ সালের ৩০ আগস্ট। এই আদেশের মাধ্যমে পাইকারি মূল্য নির্দিষ্ট করা হয়। প্রয়োজন হলে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট দামে লবণ বিতরণ করবে। তবে লবণের খুচরা বিক্রি বর্জন করা হয়। কারণ পূর্ববাংলার বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য লবণের সরবরাহ প্রদেশের হাট-বাজারগুলোতে ছিল অনেক কম। লবণের লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে সিভিল সাপ্লাই বিভাগের ছোট ছোট অফিসে দুর্নীতি দেখা দেয়। তাই প্রাদেশিক সরকার বলেছিল যে, কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশের লবণ সরবরাহ বৃদ্ধি

করবে এবং প্রদেশ সরকারি হিসাব অনুযায়ী লবণ আমদানি করবে। কিন্তু এটি সম্ভব হয়নি কারণ সরকার নিজেদেরকেই লবণ বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত করতে চেয়েছিল। সরকার ১৯৫০ সালের ১৩ নভেম্বর "সামুদ্রিক লবণ নিয়ন্ত্রণ আইন" জারি করে লবণের ক্রয়-বিক্রয়, সরবরাহ সকল কিছু কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।[৩১]

লবণের মূল্য যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে তখন করাচি থেকে লবণভর্তি জাহাজ চলে আসে পূর্ববাংলায়। ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে লবণভর্তি ৪টি জাহাজ চট্টগ্রামে এবং ১টি চালনা বন্দরে এসে পৌছায় করাচি থেকে ৭,৪৬,৪২৯ মণ লবণ নিয়ে। নভেম্বরের মধ্যে ৮,৮৭,০০০ মণ লবণ নিয়ে ৬টি জাহাজ আসে। কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশ থেকে ১০,০০,০০০ মণ লবণ আমদানির পরিকল্পনা করে এবং প্রদেশে মাসে নিয়মিতভাবে ৭,০০,০০০ মণ লবণ সরবরাহ নিশ্চিত করে। এসকল পরিকল্পনার কারণে ৯ থেকে ১০ লক্ষ মণ লবণ চাহিদার প্রেক্ষাপটে ৬ সপ্তাহে ১৬,৩৩,০০০ মণ লবণ পাওয়া সম্ভব হয়। স্থানীয় অফিসারদের নিয়ন্ত্রিত মূল্যে সরবরাহকৃত লবণ বিতরণ করার আদেশ দেওয়া হয়। কিছু অফিসার এসকল নিয়ম মেনে লবণ বিতরণ শুরু করেছিল। তবে কাজগুলো দ্রুতগতিতে করার ফলে কালোবাজারির অভিযোগ আসতে থাকে। স্থানীয়ভাবে এর জন্য শাস্তির ঘোষণাও দেওয়া হয়েছিল। তারপরও লবণের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি।[৩২]

অনেক লোভী মুনাফাখোর ব্যবসায়ী লবণ সংকটের সময় উচ্চমূল্যে লবণ বিক্রি করে লাভবান হয়েছে। কিন্তু সরকারি পক্ষ থেকে এসব অসাধু ব্যবসায়ীক নিয়ন্ত্রণ করার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সসহ প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সরকার এই লোভী ব্যবসায়ীদের শাস্তির বিধান করতে ব্যর্থ হয়েছে। দেশের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করার দায়িত্ব সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের ওপর ন্যস্ত থাকলেও এ বিভাগ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। কারণ যখনই কোনো দ্রব্যের সংকট মোকাবিলার দায়িত্ব এ বিভাগকে দেওয়া হয়েছে, তখনই সেই সংকট না কমে তা আরও বেড়ে গেছে। দীর্ঘ সময় লবণের সংকট থাকলেও লবণ আমদানি করে সংকট মোকাবিলার পদক্ষেপ দেখা যায়নি।[৩৩] সরবরাহ বিভাগ যে লবণ সরবরাহ করে তা অপরিষ্কার ও খাওয়ার অনুপযুক্ত। অথচ নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে যে লবণ তৈরি হয় তা ছিল অনেক পরিষ্কার ও ভালো। তা সত্ত্বেও সরকার প্রদেশের লবণের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ না করে করাচি থেকে আমদানি করেছে।[৩৪] তবে দাবি করা হয় যে, সরকার লবণ সমস্যা সমাধানে লবণের ওপর থেকে দুই বছরের জন্য আবগারি শুল্ক প্রত্যাহার করেছে। ১৯৫১ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে পরবর্তী দুই বছর এই নির্দেশ বহাল থাকবে বলে ঘোষণা করা হয়। বলা হয় যে, ৬ মাসের উপযোগী লবণ পূর্ববাংলায় মজুত করা হবে। যতদিন পর্যন্ত মজুদ সম্পন্ন হবে না ততোদিন পর্যন্ত সরকার প্রতিমাসে ৭ লক্ষ মণ লবণ পূর্ববাংলায় প্রেরণ করবে।[৩৫] তবে পূর্ববাংলা প্রদেশের লবণ সংকটের সমাধানে সরকার পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের দূরত্বকে প্রতিবন্ধক বলে মনে করে। দূরত্বের কারণে লবণ পূর্ববাংলায় রপ্তানি করা সম্ভব হয় না বলে উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় সরকারের সহকারী অর্থসচিব গিয়াসুদ্দীন পাঠান। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে প্রায় ২ হাজার মাইলের

ব্যবধান এবং পর্যাপ্ত যানবাহন বিশেষ করে জাহাজের অভাব। তাই সময়মতো লবণ সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। বহু চেষ্টার পর সরকারের কাছ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা ধার করে কয়েকটি পাকিস্তানি জাহাজ কেনা হলেও তা যথেষ্ট ছিল না। অল্প সংখ্যক ও পুরনো হওয়ায় জাহাজগুলো দিয়ে করাচি থেকে চট্টগ্রামে লবণ আনা সম্ভব হতো না।[৩৬]

পূর্ববাংলা সরকার লবণ উৎপাদনকারীদের প্রচলিত আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় আবগারি কালেক্টরের কাছে নাম রেজিস্ট্রেশনের পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু খবর পাওয়া যায়, কেন্দ্রীয় আবগারি কর্তৃপক্ষ লবণ উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে বেআইনিভাবে লবণ কর আদায় করছে। বিধি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় আবগারি কর্তৃপক্ষ প্রদেশে উৎপাদিত লবণের ওপর মণপ্রতি আড়াই টাকা হিসাবে আবগারি শুল্ক নিতে পারে। ১৯৫২ সালের পূর্ববঙ্গ লবণ বিধির ৮ নং ধারা অনুসারে আবেদনের মাধ্যমে এই শুল্ক হতে অব্যহতি পাওয়ারও বিধান রয়েছে। রেজিস্ট্রিকৃত যেসকল লবণ উৎপাদনকারী বছরে তিনশত মণের বেশি লবণ উৎপাদন করে না কেবলমাত্র তাদেরকেই এই শুল্ক থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। আর যারা নাম রেজিস্ট্রেশন করেনি তাদেরকে শুল্ক দিতে হয়েছে। ফলে দেখা যায়, কিছু সংখ্যক লোক সামান্য সুবিধা পেলেও অধিকাংশই লবণ শুল্ক প্রদান করে সমস্যায় পড়েছে।[৩৭] এ সময়ে প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় স্থানীয়ভাবে লবণ উৎপাদন করেছে প্রায় ১০ হাজারেরও বেশি লোক। তাদেরকে যদি আর্থিকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করা যেতো এবং শুল্ক তুলে দেওয়া হতো তাহলে লবণের উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পেতো।[৩৮] সরকারি হিসেব মতে পূর্ববাংলায় মাসে ৬ লক্ষ মণ লবণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ১৯৫১ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত এখানে প্রয়োজনীয় লবণের অর্ধেক লবণও প্রেরণ করা হয়নি। এর কারণ ছিল সরকার নিযুক্ত পাইকারি আড়তদার কর্তৃক বাজার থেকে প্রচুর পরিমাণে লবণ সরিয়ে ফেলা। লবণ ব্যবসায়ে ব্যর্থতার কারণে সরকারের ব্যাপক সমালোচনা করেন মুসলিম বণিক সমিতির প্রেসিডেন্ট রফিউদ্দীন সিদ্দিকী। পূর্ববাংলায় বার্ষিক যে ৬৬ লক্ষ মণ লবণের প্রয়োজন তা কেবল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানি করে মেটানো সম্ভব নয়। তাই সরকারকে তিনি অবিলম্বে লবণের ওপর থেকে আবগারি শুল্ক তুলে দিতে এবং আমদানিকারকদের ইচ্ছানুযায়ী লবণ আমদানির অনুমতি প্রদান করতে অনুরোধ জানান।[৩৯]

লবণের ওপর থেকে কর তুলে দিয়েছিলেন লিয়াকত আলী খান। কিন্তু পুনরায় লবণের ওপর ট্যাক্স বসানো হলে লবণের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। লবণের উৎপাদন নিশ্চিত করতে ট্যাক্স তুলে দেওয়ার পাশাপাশি লবণের কন্ট্রোল বন্ধ করার প্রয়োজন ছিল।[৪০] আবার লবণ আমদানির জন্য যে লাইসেন্স প্রয়োজন হতো সেটিও তুলে দেওয়ার দরকার ছিল। কারণ লাইসেন্সের জন্য অনেকেই লবণ আমদানিতে উৎসাহী হতো না। পূর্ববাংলার লবণ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন লবণের ওপর কর রহিতকরণ, বিনা লাইসেন্সে লবণ আমদানির অনুমতি দান, চোরাকারবার ও মজুতদারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন ইত্যাদির অনুরোধ করা হয় সরকারের নিকট। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকার ছিল উদাসীন।[৪১]

চট্টগ্রামের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে কুটির শিল্পরূপে যে লবণ উৎপন্ন হয় তার উন্নতির জন্য সুপারিশ করেছিলেন ডিরেক্টর অব ইন্ডাস্ট্রিজ। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে লবণ উৎপাদন করার জন্য সরকারি কারখানা স্থাপনেরও সুপারিশ করে কমিটি। সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকার উপযোগী স্থানসমূহকে লবণ এলাকা হিসেবে ঘোষণার কথাও বলা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে উৎকৃষ্টতম লবণ এলাকা হিসেবে পরিচিত ছিল চট্টগ্রামের কক্সবাজার মহকুমার গুদাতালী এলাকাটি। এখানকার নদীর পানি অত্যন্ত লোনা এবং লবণ উৎপাদিত হয় বেসরকারিভাবে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে লবণ উৎপাদন করা হলে লবণের উৎপাদন বৃদ্ধি পেতো। কারণ কুটির শিল্পের মাধ্যমে যে লবণ উৎপাদিত হয় তা ৬ লক্ষ মণের বেশি নয়। কিন্তু লবণ উৎপাদনের জন্য কোনো প্রকার সরকারি সাহায্য পাওয়া যায়নি বলে লবণের উৎপাদনও কম হয়েছে।[৪২]

লবণ সমস্যা সমাধানে ১৯৫১ সালে সরকার ৭ টাকা দরে প্রতিমণ লবণ সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। কিন্তু প্রদেশের বাইরে থেকে আমদানিকৃত লবণের মূল্যের চেয়ে এই দাম ছিল বেশি। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত লবণের ওপর আবগারি শুল্ক ধার্য হবে না বলে স্থানীয় উৎপাদনকারীরা আমদানিকৃত লবণের সাথে টিকে থাকতে পারবে। প্রাদেশিক বেসামরিক সরবরাহ সচিব এস এম আফজাল হোসেন বলেন যে, স্থানীয়ভাবে লবণ উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করতেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।[৪৩]

লবণ সংকট এড়ানোর জন্য ১৯৫১ সালের শেষে এসে সরবরাহের পুরো দায়িত্ব নিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু সরকার তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। লবণের সংকট ও মূল্য অতিরঞ্জিত করে বলা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন বাণিজ্যমন্ত্রী ফজলুর রহমান।[৪৪] সিভিল সাপ্লাই বিভাগের মন্ত্রী এস এম আফজাল হোসেনের পক্ষ থেকে পনিরুদ্দীন আহমেদ জানান যে, লবণ সংকট নিরসনে কেন্দ্রীয় সরকার দ্রুত লবণ প্রেরণের ব্যবস্থা করেছে। করাচির পাশাপাশি ভারত থেকেও আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ভারত থেকে ৪,৬৬,৫৭০ মণ লবণ আমদানি করা হয়। এ ছাড়াও পরবর্তী সময়ে ভারত ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে আরও লবণ আমদানির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[৪৫] প্রদেশে লবণ আমদানির দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের ওপর ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকারই পূর্ববাংলা প্রদেশের ডিলারদের কাছে লবণ সরবরাহ করতো। তা সত্ত্বেও পূর্ববাংলার সংকটকালীন সময়ে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম লবণ আমদানি করা হয়েছে। পূর্ববাংলার চাহিদা অনুযায়ী লবণ আমদানি করতে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারকে বাইরে থেকে লবণ আমদানি করতে অনুমতি দেয়নি। সরকার-বিরোধী মনোভাব কঠিন আকার ধারণ করলে লবণ সংকট মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে পরিণত হয়।[৪৬] তাই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পরিষদের ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করতে বিভিন্ন দল মিলে যুক্তফ্রন্ট নামে একটি রাজনৈতিক মঞ্চ গঠন করা হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল ও পাকিস্তান খেলাফত দল একসাথে মিলে গঠন করে যুক্তফন্ট। এই যুক্তফ্রন্ট তাদের যে নির্বাচনী ইশতেহার (২১ দফা) প্রকাশ করে তার পঞ্চম দফা ছিল–

> পূর্ববাংলাকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য সমুদ্র উপকূলে বৃহৎ লবণ তৈরির কারখানা স্থাপন করা হবে এবং মুসলিম লীগ সরকারের আমলে যে বৃহৎ লবণ সংকট দেখা দিয়েছিল সেই কেলেঙ্কারি সম্পর্কে তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির বিধান করা হবে ও অসদুপায়ে তারা এযাবৎ যেসকল অর্থ উপার্জন করেছে তা বাজেয়াপ্ত করা হবে।[৪৭]

মূলত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় সরকার কর্তৃক প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে লবণ সরবরাহে অব্যবস্থাপনার কারণেই নানারকম সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এবং লবণ দুর্লভ বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

৩. জনজীবনে লবণ সংকটের প্রভাব

লবণ সংকটের ফলে গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের দুর্দশা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়। সাধারণ মানুষের আহার প্রস্তুতের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো লবণ। পান্তাভাত খেতে গেলেও তাদের লবণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর সেই সময় লবণের এই মূল্যবৃদ্ধি জনজীবনের জন্য কতটা ভয়াবহ হয়েছিল তা অচিন্তনীয়।[৪৮]

সংবাদপত্রগুলোতে যেসকল সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তাতে দেখা গেছে যে, পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলায় লবণের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে নানারকম ভোগান্তির শিকার হয়েছে সাধারণ জনগণ। তারা উচ্চমূল্যে লবণ ক্রয় করতে পারত না বলে মাঝে মাঝে বিনা লবণে আহার করতে বাধ্য হতো। অন্যদিকে অধিক লাভের আশায় লবণের সাথে বিভিন্ন ভেজাল দ্রব্য যেমন হাড়ের গুঁড়ো (Bone-dust) মিশিয়ে লবণ বিক্রি করেছে অসাধু ব্যবসায়ীরা। আর এই ভেজাল লবণ গ্রহণের ফলে নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামে জনসাধারণের পেটের অসুখ হয়েছে এবং অনেকে মারাও গিয়েছে। বরিশালে লবণের সাথে চিনি মিশিয়ে লবণ বিক্রি করা হয়েছে।[৪৯] এতে সাধারণ জনগণ অসুবিধায় পড়লেও লাভবান হয়েছে অসৎ ব্যবসায়ীরা। লবণ বিক্রি করে তারা অধিক মুনাফা অর্জন করেছে।

১৯৫১ সালের ২৬ অক্টোবর *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় লবণ সংকটের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরা হয়। এখানে বলা হয়, লবণের সংকট এতোটাই তীব্র ছিল যে অনেকে লবণের পরিবর্তে গুড় ব্যবহার করেছে। গ্রামাঞ্চলের জনদুর্ভোগ বর্ণনা করে মীর আহমদ আলী নামক এক ব্যক্তি উল্লেখ করেন:

> পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে এ পর্যন্ত লবণের দাম এ রকম হয় নাই। গ্রামে গরিবদের দুর্দশার সীমা নাই। তাদের বুক ভেঙ্গে গেছে। তাদের কান্না যে কেউ শোনে না সে কথা বলাই বাহুল্য। আগুনে জ্বাল দিলে যে পরিমাণ না জ্বলে দুঃখীর আত্মনিনাদ তার চেয়ে বেশী জ্বলে। ১৬ টাকা দরে লবণ বিক্রয় হ'ল তাতে গরীবের কোটি কোটি টাকার সর্বনাশ হয়ে গেল।[৫০]

পূর্ববাংলার এই সংকটের সময় পশ্চিম পাকিস্তানিদের মনোভাব ছিল ভিন্নতর। পূর্ববাংলার জনগণ এ সময়ে বেশি দামে লবণ ক্রয় করলেও তাদের জন্য বিদেশ থেকে লবণ আমদানির ব্যবস্থা করা হয়নি। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানিরা এ সময়ে চা ও পান আমদানি করে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়েছে। কারণ তাদের চা ও পানের চাহিদা অনুযায়ী যোগান ছিল না। আমদানি পণ্যে বৈষম্য থেকে বোঝা যায় পূর্ববাংলার জনগণের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলা ছিল যথেষ্ট।[৫১] লবণের সংকট মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে লবণ সরাসরি পূর্ববাংলায় আমদানি করার প্রয়োজন ছিল। অথচ লবণ আমদানির সময় প্রথমে লবণ আসবে করাচিতে এরপর পূর্ববাংলায় এ নীতি গ্রহণ

করেছিল সরকার। বিভিন্ন কোম্পানিকে লবণ আমদানির অনুমতিও দিয়েছিল সরকার। কিন্তু এমন সব ব্যক্তিকে আমদানির অনুমতি দেয়া হয় যারা কখনই লবণ ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন না। ফলে আমদানি ব্যর্থ হয় এবং সমস্যা দেখা দেয়। আবার এ পর্যন্ত যে সকল ব্যবসায়ী লবণের মজুত করেছে তাদের মজুতকৃত লবণ জনসাধারণের মধ্যে বণ্টনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এদিকে তেমন কোনো নজর দেওয়া হয়নি। লবণের উৎপাদনের ওপর শুল্ক আরোপের ফলে নোয়াখালী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জায়গার লবণ উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের লবণ নিয়ন্ত্রণ করা এবং লবণ তৈরির ওপর কর বসানোর কারণে এ সংকট আরও বেড়ে যায়।[৫২]

স্বাস্থ্য সুরক্ষা, বিভিন্ন দ্রব্য বা পদার্থ সংরক্ষণে এবং বিভিন্ন শিল্পকারখানায় ব্যবহারের জন্য অতি প্রয়োজনীয় একটি দ্রব্য হলো লবণ। তাই এই লবণ সংগ্রহ করা ছিল অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু অনেক আগে থেকেই বাংলা প্রদেশ ভারত বা বিদেশ থেকে লবণ আমদানির ওপর নির্ভরশীল ছিল। এ শিল্পকে রক্ষা করতে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও সেগুলো ছিল পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রিক। পূর্ববাংলার স্থানীয় শিল্পকারখানা রক্ষা বা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লবণ উৎপাদনের জন্য বাস্তবধর্মী কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়নি।[৫৩]

দেশে উৎপাদিত এ দ্রব্যটির সংকট মোকাবিলায় সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। দৈনন্দিন জীবনে খাদ্যে ও শিল্পের ব্যবহারিক প্রয়োজনে লবণের অভাব গ্রামাঞ্চলের মানুষেরা ব্যাপকভাবে অনুভব করতে থাকে। সংবাদভিত্তিক দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা ছাড়াও সরকার সমর্থিত *মাসিক মোহাম্মদী* এবং *দিলরুবা* লবণ সংকটের জন্য সরকারের অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করে। তবে জনগণের এই দুর্দশার সময় বাণিজ্যমন্ত্রী ফজলুর রহমান ৩১ অক্টোবর *দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার*কে বলেন, "লবণ সংকট সংক্রান্ত প্রতিবেদনগুলো ছিল অত্যন্ত অতিরঞ্জিত।" সরকার পক্ষের এসকল বক্তব্য জনমনে সে সময়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।[৫৪]

সরকারের স্বজনপ্রীতির কারণেও জনদুর্ভোগ দেখা দেয়। সরকার তাদের সমর্থনপুষ্ট লোকদের লবণ ব্যবসার সাথে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করে। ফলে জীবিকা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য উভয়ক্ষেত্রেই দুদর্শায় পতিত হয় জনসাধারণ। প্রদেশের লবণ উৎপাদনের ওপর শুল্ক তুলে দিলে পূর্ববাংলায় যথেষ্ট পরিমাণে লবণ উৎপাদন করা সম্ভব হতো। উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে লবণের দিক দিয়ে পূর্ববাংলা যেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ হতো তেমনি দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতিও সম্ভব হতো। এ সময়ে প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় স্থানীয়ভাবে লবণ উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত ছিল ১০ হাজারেরও বেশি লোক। কিন্তু অর্থনৈতিক কোনো ক্ষতিপূরণ তারা পায়নি।[৫৫] জনজীবনে দুর্দশা বৃদ্ধি পেলেও তা নিরসনে সর্বদলের সংঘবদ্ধ কোনো ত্রাণ কমিটি ছিল না। সরকারি খাদ্য নীতির বিরুদ্ধে প্রথম সাংগঠনিক প্রতিবাদ গড়ে তোলা হয় ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলার বামপন্থি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের মাধ্যমে। কিন্তু ১৯৫০-৫১ সালে উল্লেখযোগ্য কোনো ত্রাণ কমিটি লক্ষ করা যায় না। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ত্রাণ কমিটি গঠিত হলেও সেগুলো সন্তোষজনকভাবে কাজ করতে পারেনি। এতে জনজীবনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।[৫৬]

৪. উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে লক্ষ করা যায় দেশভাগ পরবর্তী সময়কালে সৃষ্ট লবণ সংকট পূর্ববাংলার লক্ষ লক্ষ লোকের জন্য ভীষণ কষ্ট ও দুর্দশার সৃষ্টি করেছিল। সংকটের কারণে লবণের মূল্য এতোটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে জনগণ উচ্চমূল্যে লবণ ক্রয় করতে না পেরে বিনা লবণে খাবার খেয়েছে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের কারণে ঢাকা রেশনিং কর্তৃপক্ষ ছাত্রাবাসগুলোতে কিছু পরিমাণ লবণ সরবরাহের ব্যবস্থা করলেও তা যথেষ্ট ছিল না। লবণ সংকটের মূল কারণ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে উৎপন্ন লবণকে পূর্ববাংলায় সরবরাহ করার প্রচেষ্টা। অসাধু ব্যবসায়ীদের মুনাফালোভী কর্মকাণ্ড, ক্ষমতাসীন দলের কিছু ব্যক্তির দুর্নীতি ও প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা সংকটকালীন পরিস্থিতিতে বিপর্যয় ঘটিয়েছিল। তাছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য, আমদানি ও বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহারে পক্ষপাত পূর্ববাংলার খাদ্য পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছিল। লবণ সংকট সাময়িক হলেও জনজীবনে এর তীব্রতা এতো বেশি ছিল যে, এর প্রভাব পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সময়েও অনুভূত হয়। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীরা এই সংকট উল্লেখ করে জনসমর্থন আদায়ে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু খাদ্য ঘাটতি নিরসনে প্রশাসনিক ব্যবস্থা বা সরকারি নীতি যথেষ্ট ছিল না। পরিস্থিতির মোকাবিলা বা চোরাকারবারি বন্ধ করে ঘাটতিপূর্ণ এলাকায় লবণ সরবরাহ বৃদ্ধি করতে সরকার কঠোর ও কার্যকর কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। সরকারের অবহেলা ও যথাযথ ব্যবস্থার অভাবে কৃষকরা উপকূলীয় এলাকায় লবণ উৎপাদনে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। পূর্ব পাকিস্তানের সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকায় লবণ তৈরির সম্ভাবনা সত্ত্বেও সরকার করাচি থেকে লবণ আমদানি করে। এর ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই পূর্ববাংলায় জনবিক্ষোভ দেখা দেয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে যে মতোবিরোধ ছিল তার প্রভাব পূর্ববাংলার খাদ্য ও লবণ সংকটের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। আর এর ফলে বিপন্ন হয় পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা।

তথ্যনির্দেশ

১ আতিউর রহমান লেনিন আজাদ, *ভাষা-আন্দোলন : অর্থনৈতিক পটভূমি*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১১৮

২ S. Sajjad Husain, *East Pakistan A Profile, Orient Longmasn Limited, Dacca*, 1962, p. 194

৩ রেজোয়ান সিদ্দিকী (সম্পাদিত), *আজাদ ও সমকালীন সমাজ সম্পাদকীয়:* ১৯৩৬-১৯৭১, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২৫৩

৪ আতিউর রহমান লেনিন আজাদ, *ভাষা-আন্দোলন: পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার*, *পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১০২

৫ বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, (দ্বিতীয় খণ্ড), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ১০৭

৬ *দৈনিক আজাদ*, ৩০ অক্টোবর ১৯৫১, পৃ. ৫
৭ *প্রাগুক্ত*, ২৬ অক্টোবর, ১৯৫১
৮ *Assembly Proceedings Official Repor*t, East Bengal Legislative Assembly, Fifth Session, March 1951, East Bengal Government Press, Dacca, 1953, pp. 410, 411
৯ *দৈনিক আজাদ*, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৮, পৃ. ১
১০ বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৯। *দৈনিক আজাদ*, ২৯ অক্টোবর ১৯৫১, পৃ. ১
১১ আতিউর রহমান লেনিন আজাদ, *ভাষা-আন্দোলন: অর্থনৈতিক পটভূমি*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১১৫
১২ Badruddin Umar, *The Emergence of Bangladesh: Class Struggles in East Pakistan* (1947-1958), Vol-1, Oxford University Press: Karachi, pp. 25-26
১৩ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: প্রথম খণ্ড পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮)*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃ. ২২১
১৪ *Assembly Proceedings*, Sixth Session, November 1951, East Bengal Government Press, Dacca, 1953, p. 144
১৫ বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০০
১৬ *দৈনিক আজাদ*, ২৬ অক্টোবর, ১৯৫১
১৭ *Government of Bengal & East Pakistan*, Department: Commerce, Branch: Labour, Proceedings: B, Sl. No: 1, List No: 106, Year 1953, p. 4
১৮ *Ibid,* p. 4
১৯ *Ibid*, p. 5
২০ *Assembly Proceedings*, Third Session, 28th September 1956, East Pakistan Government Press, Dacca, 1957, p. 16
২১ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৮২
২২ *দৈনিক আজাদ*, ২০ জানুয়ারি ১৯৫১, পৃ. ৫
২৩ *প্রাগুক্ত*, ২০ অক্টোবর ১৯৫১
২৪ *প্রাগুক্ত*, ৮ অক্টোবর ১৯৫১, পৃ. ১
২৫ *Assembly Proceedings*, Sixth Session, *Op.Cit.*, p. 141
২৬ *প্রাগুক্ত*, ৪ অক্টোবর ১৯৫১
২৭ মোছাঃ খোদেজা খাতুন, 'পাকিস্তানের শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষা ব্যবস্থা ১৯৪৭-'৭১: পূর্ব বাংলায় এর প্রতিক্রিয়া', পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২, পৃ. ১২৪
২৮ *Assembly Proceedings*, Third Session, *Op. cit.*, p. 75
২৯ *Government of Bengal & East Pakistan*, *Op. cit.*, p. 3
৩০ মোছাঃ খোদেজা খাতুন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪
৩১ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২২
৩২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৩
৩৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৭
৩৪ *Assembly Proceedings*, Tenth Session, March 1953, East Bengal Government Press, Dacca, 1954, p. 486
৩৫ *দৈনিক আজাদ*, ২৭ নভেম্বর ১৯৫১, পৃ. ১
৩৬ বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৯। *দৈনিক আজাদ*, ৩ নভেম্বর ১৯৫১, পৃ. ১
৩৭ *দৈনিক আজাদ*, ১৭ এপ্রিল ১৯৫৪, পৃ. ১,৩,
৩৮ *প্রাগুক্ত*, ১০ এপ্রিল ১৯৫৪, পৃ. ২
৩৯ *প্রাগুক্ত*, ৯ অক্টোবর ১৯৫১, পৃ. ৮

৪০ *Assembly Proceedings*, Sixth Session, *Op. cit.*, p. 145
৪১ *দৈনিক আজাদ*, ৬ নভেম্বর ১৯৫১, পৃ. ২
৪২ *প্রাগুক্ত*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১, পৃ. ১
৪৩ *প্রাগুক্ত*, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, পৃ. ১
৪৪ *Assembly Proceedings*, Sixth Session, *Op. cit.*, p. 143
৪৫ *Ibid*, Ninth Session, November 1952, East Bengal Government Press, Dacca, 1954, p. 262
৪৬ *দৈনিক আজাদ*, ২১ অক্টোবর ১৯৫১, পৃ. ১
৪৭ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭৩
৪৮ *নওবেলাল*, ১৮ অক্টোবর, ১৯৫১
৪৯ *Assembly Proceedings*, Sixth Session, *Op. cit.*, p. 144
৫০ বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৫
৫১ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২১
৫২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৯। বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৮
৫৩ *Government of Bengal & East Pakistan*, *Op. cit.*, p. 3
৫৪ মো. এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম: ইতিহাস ও সংবাদপত্র ১৯৪৭-১৯৭১*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৭৫
৫৫ বিস্তারিত, *দৈনিক আজাদ*, ১০ এপ্রিল ১৯৫৪, পৃ. ২। হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৮২
৫৬ Badruddin Umar, 2004, *Op. cit.*, pp. 25-26

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বিয়াল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩১/ডিসেম্বর ২০২৪

অবাচনিক সাংস্কৃতিক ট্যাবু : সমাজ প্রভাবিত প্রজ্ঞানমূলক আচরণ বিশ্লেষণ

নাদিয়া নন্দিতা ইসলাম*

সারসংক্ষেপ

অবাচনিক সাংস্কৃতিক ট্যাবু (nonverbal cultural taboo) এমন এক ধরনের বিশ্বাস এবং অভ্যাস যা যুক্তি বা বৈজ্ঞানিক ধারণা দ্বারা বর্ণনা বা ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। দীর্ঘদিন ধরে মানুষ তার সমাজ ও সংস্কৃতি প্রভাবিত বিশ্বাস বহন করে চলে, যার বহিঃপ্রকাশে সমাজের মানুষের আচরণিক ধ্যান ধারণারও পরিচয় ফুটে ওঠে। অর্থাৎ এটি পালনের অভ্যাস বা ধারণা একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং ভয়কে প্রতিফলিত করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত বিচিত্র অবাচনিক সাংস্কৃতিক ট্যাবুর ধারণা বহুকাল ধরে মানুষের মধ্যে পরিচিত এবং বিদ্যমান রয়েছে। যদিও বর্তমান যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভাবিত সমাজে শিক্ষাবিস্তারের কারণে মানুষের মাঝে সাংস্কৃতিক ট্যাবু প্ররোচিত ধারণার প্রভাব কমে গেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নারী বিষয়ক অভাষিক সাংস্কৃতিক ট্যাবুর সমাজ প্রভাবিত প্রজ্ঞানমূলক (cognation) প্রকৃতির আচরণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

চাবি শব্দ: অবাচনিক ভাষিক উপাদান, সাংস্কৃতিক ট্যাবু, নারী ও সমাজ, প্রজ্ঞানমূলক আচরণ।

১. ভূমিকা

সমাজে জীবনাচরণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সমাজ এবং সংস্কৃতি প্রভাবিত বিভিন্ন আদেশ, বিধি, রীতি-নীতি, নৈতিক মূল্যবোধ, নিষেধ রয়েছে যা সাংস্কৃতিক ট্যাবু (cultural taboo) নামে পরিচিত। সাংস্কৃতিক ট্যাবু পালনে বিশ্বাস, অভ্যাস বা এর প্রতি আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে মূলত মানব মনে জন্ম নেয়া অজানা ভয়, অনিশ্চয়তা বা বিশেষ পরিবেশ-উদ্ভূত নেতিবাচক বিভিন্ন মানসিক উপাদান থেকে। প্রায় প্রতিটি মানব সমাজে সাংস্কৃতিক ট্যাবু ধারণা বিদ্যমান যদিও এর কোনো ধরনের বৈজ্ঞানিক ব্যখ্যা অথবা গ্রহণযোগ্যতা নেই। পরিবেশ, সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন, শিক্ষার স্তরের ভিন্নতার কারণে এর ব্যবহারিক রূপ একেক সামাজিক প্রতিবেশে একেক রকম। একে অপরের সাথে সংজ্ঞাপনের (communication) লক্ষ্যে ভাষিক বা অবাচনিক উপস্থাপনের মাধ্যমে সমাজ প্রভাবিত বিধি অনুযায়ী ব্যক্তির আচরণ প্রকাশ পায়। পৃথিবীর প্রায় সবকটি সামাজিক পরিবেশে কমবশি অভাষিক সাংস্কৃতিক ট্যাবুর বিচিত্র রূপ দেখতে পাওয়া যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশে প্রচলিত নারী সংক্রান্ত বৈচিত্র্যময় অবাচনিক সাংস্কৃতিক ট্যাবুর সমাজ প্রভাবিত প্রজ্ঞানমূলক প্রকৃতির স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে।

২.১ গবেষণার উদ্দেশ্য

আমাদের দেশে আবহমান কাল ধরে মানুষের চিন্তায় ও অভ্যাসে নারী বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক ট্যাবুর ধারণা দেখতে পাওয়া যায়। কালের বিবর্তনে এ অঞ্চলের মানুষের বিভিন্ন

* সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ধরনের সাংস্কৃতিক ট্যাবুর ধারণা বদল হয়েছে। তবুও সাধারণ মানুষ বিশেষ করে গ্রামীণ জনসাধারণ এবং শিক্ষার আলো বঞ্চিত মানুষের কাছে এ ধরনের ট্যাবুর গ্রহণযোগ্যতা দেখতে পাওয়া যায়। পূর্বে বাংলাদেশের প্রতিবেশে সাংস্কৃতিক ট্যাবু সংক্রান্ত কোনো উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়নি। এই গবেষণাপত্রের উদ্দেশ্য হলো বাংলা অঞ্চলের প্রচলিত সমাজ প্রভাবিত নারী সংক্রান্ত অভাষিক সাংস্কৃতিক ট্যাবুর প্রজ্ঞানমূলক আচরণের প্রকৃতি অনুসন্ধান এবং তা বিশ্লেষণ করা। পাশাপাশি উপস্থাপিত বৈচিত্র্যময় অভাষিক সাংস্কৃতিক ট্যাবুগুলো এ অঞ্চলে আবহমানকাল ধরে নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিরও একটি পরিচয় তুলে ধরছে।

২.২ গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধে, গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে গুণগত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। গবেষণার প্রাথমিক উৎস হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্স শ্রেণিতে অধ্যায়নরত ৩০ জন নারী শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৫০টি উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত এসকল শিক্ষার্থীর জন্মস্থানে (গ্রামে বা শহরে) নারীকেন্দ্রিক প্রচলিত অবাচনিক সাংস্কৃতিক ট্যাবু তথ্য-উপাত্তের প্রাথমিক নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। উল্লেখ করা যায় যে, নারী শিক্ষার্থীগণ ছোটবেলা থেকে বড় হয়ে ওঠা অব্দি সময়ে তাদের মাতৃস্থানীয় নারীদের কাছ থেকে প্রভাবিত হয়ে সমাজে প্রচলিত এসব অভাষিক সাংস্কৃতিক ট্যাবুরদ্বারা অবচেতন ভাবেই আচরণগত দিক থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। বর্তমান আলোচনায় দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে সমাজভাষাবিজ্ঞান, প্রজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক ট্যাবু সংক্রান্ত গ্রন্থ এবং গবেষণা পত্রের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

৩. সাংস্কৃতিক ট্যাবু

আবদুল হাইয়ের মতে ট্যাবু, ''সামাজিক বাধা নিষেধ (taboo) রুচি ও স্থান কাল পাত্র ভেদে প্রত্যেক সমাজেই আছে। সমাজ ও ভাষাভেদে এ বাধানিষেধগুলোর এক একটা ব্যবহারিক নাম আছে''।[১] সাধারণত সামাজিক জীবনে, সমাজের মানুষদের আচরণ এবং জীবনাচরণ নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে সমাজ ও সংস্কৃতি প্রভাবিত বিধি নিষেধগুলো পরবর্তী সময়ে সাংস্কৃতিক ট্যাবুর রূপ লাভ করে। সমাজের বিভিন্ন আদর্শ, আদেশ, রীতি নীতি, নিষেধাজ্ঞাকে নৈতিক মূল্যবোধ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। পূর্বের আদর্শ এবং মূল্যবোধ দ্বারা সামাজিক বিচ্যুতি এড়াতে সমাজের মানুষের প্রতি ইতিবাচক নির্দেশিকা হিসেবে এ জাতীয় রীতি পালন কাজ করে বলে ধারণা করা হতো।[২] আমাদের সমাজে প্রচলিত ভাষিক ও অভাষিক আচরণগুলো সমাজ ব্যবস্থা, রীতিনীতি, সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত। এ জাতীয় রীতি পালনের বাস্তবিক কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তারপরও প্রাচীনকাল থেকে আমাদের সমাজে এ জাতীয় ট্যাবুর প্রচলন দেখা যায়। কালের বিবর্তনে মানুষের বিশ্বাস বা কর্মে এ ধারণাগুলোর প্রভাব না থাকলেও জীবনের বহু ক্ষেত্রে সমাজে কুসংস্কারের রূপে এ রীতি, ধ্যান ধারণার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।[৩]

৩.১ অবাচনিক সাংস্কৃতিক ট্যাবু

একে অপরের সাথে ভাষিক যোগাযোগ সংগঠনে সচেতন এবং অবচেতন মনে ভাব আদান প্রদানে ভাষিক উপাদানের পাশাপাশি অবাচনিক ভাষিক উপাদানের ব্যবহার সংজ্ঞাপনকে আরো অর্থময়,

সহজ এবং বোধগম্যযোগ্য করে তোলে।[৪] মুখের ভাষা ব্যবহার করে নয় অর্থাৎ অভাষিক উপস্থাপনের মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর সমাজ সংস্কৃতি প্রভাবিত ইতিবাচক বা নেতিবাচক ধারণার ভিত্তিতে রীতি-নীতি পালনই অবাচনিক সাংস্কৃতিক ট্যাবু। অবাচনিক ধারণাগুলো সাধারণত রূপকার্থে উপস্থাপিত হয়ে থাকে। জন্মের পর থেকেই ব্যক্তি তার সামাজিক পরিবেশ থেকে বাচনিক উপাদানের পাশাপাশি অবাচনিক উপাদানগুলো আত্মস্থ করে নেন এবং পরে যা অবচেতন মনে অভ্যাসের রূপ লাভ করে থাকে। অভাষিক উপাদানে রূপকের উপস্থিতি দৃশ্যমান থাকে এবং প্রতিবেশ অনুযায়ী ব্যক্তি সেই রূপকের অর্থকে ব্যাখ্যা করে নেন।[৫] অবাচনিক সাংস্কৃতিক ট্যাবুর ক্ষেত্রেও ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতা এবং প্রতিবেশ অনুযায়ী আচরণ এবং প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে থাকেন। ব্যক্তির মনে তার আশেপাশের বিভিন্ন মানুষের ইতিবাচক বা নেতিবাচক বাচনিক এবং অবাচনিক আচরণে অনুপ্রাণনা বা অনাগ্রহের জন্ম নেয়।[৬] সাংস্কৃতিক ট্যাবু প্রভাবিত রীতি পালনের ধারণা বা অর্থ বিচারের বৈজ্ঞানিক কোনো ব্যাখ্যা নেই। এ জাতীয় রীতি যা মূলত একই এলাকার এক প্রজন্মের মানুষের কাছ থেকে অন্য প্রজন্মের মানুষ আত্মস্থ করে থাকে। ব্যক্তি যে সমাজে বেড়ে উঠেছে সেই সমাজের রীতিনীতি, ধ্যান ধারণা, বিশ্বাস, বেড়ে ওঠার সঙ্গ এবং প্রতিবেশ তার আচরণে সব থেকে বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারে।[৭] আমাদের দেশের প্রতিবেশে বড়দের প্রতি সম্মানার্থে বিভিন্ন অবাচনিক আচরণ রীতি ছোটদের পালন করতে দেখা যায়। এর মধ্যে বড়দের দেখে উঠে দাঁড়ানো, হাতের ইশারায় না ডেকে কাছে গিয়ে ডাকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পুরুষের ক্ষেত্রে নারীকে সম্মানার্থে দরজা খুলে দেয়া, যাত্রা পথে তাকে আগে যাবার সুযোগ করে দেয়া বা নারীদের দেখলে বসার স্থান ছেড়ে তাকে বসতে দেয়া বা উঠে দাঁড়ানো জাতীয় আচরণিক রীতি ব্রিটিশ সংস্কৃতির দান।[৮] অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে সমাজ ও সংস্কৃতি প্রভাবিত বিভিন্ন অবাচনিক আচরণিক রীতির প্রচলন দেখা যায়।

৩.২ সাংস্কৃতিক ট্যাবু দ্বারা প্রভাবিত হবার কারণ

একেকটি সমাজের সংস্কৃতি সেই সমাজের মানুষের আচরণিক অভ্যাস, চিন্তা, চেতনা, নারীর প্রতি সহনশীলতা তথা সমাজের বিভিন্ন প্রথা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন। প্রতিটি সংস্কৃতিতে যাপিত মানুষের একে অপরের সাথে প্রকাশিত আচরণিক বৈচিত্র্য সেই সমাজের সামাজিক মূল্যবোধকেও তুলে ধরে। প্রতিটি সমাজে ট্যাবুর ধারণা সাধারণত সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, প্রাকৃতিক, আঞ্চলিক প্রভৃতি বিষয়ের দ্বারা মানুষের মনে প্রভাব সৃষ্টি করে। সেইসব ধারণা পরবর্তীতে মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে থাকে। সময়ের সাথে সাথে মানুষের বিশ্বাস, চিন্তা, চেতনা, ধারণা, অভ্যাস এবং আচরণগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।[৯] কালের বিবর্তনে শিক্ষা, বিশ্বায়নের ফলে সাংস্কৃতিক ধারণাগত পরিবর্তনে মানুষের চিন্তা চেতনা, অভ্যাস ও আচরণেরও বৈচিত্র্য বা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। মানুষ পুরনো অভ্যাস, চিন্তার পরিবর্তে নতুন করে বিভিন্ন ধারণাকে গ্রহণ করতে শেখে।[১০]

চারপাশে যা ঘটছে তা সম্পর্কে ছোট থেকে সমাজ প্রভাবিত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ভবিষ্যতের জন্যে সচেতন হতে শেখায় এবং ব্যখ্যাযোগ্য নয় এমন বিষয়ের প্রতি মানুষ আশ্রয় খোঁজে। ব্যক্তি মনে

করেন, যেকোনো খারাপ পরিণতি থেকে নিষেধ নীতিরীতি পালন তাকে নিরাপদ রাখবে।[১১] সামাজিক মূল্যবোধের অংশ হিসেবে ছোটবেলা থেকেই মানুষের মনে সমাজ ও সংস্কৃতি প্রভাবিত ধারণা, রীতিনীতি পালন করার স্পৃহা জন্মে।[১২] জন্মের পর থেকে এ সকল রীতি বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করা মূলত নির্ভর করে সমাজে বসবাসরত তার আশপাশের মানুষজনের আচরণের ওপর। পরবর্তীতে ব্যক্তি বেড়ে ওঠার সময় তার নিজস্ব বিশ্বাস, ধারণাকে মূল্যায়ন করতে শেখে এবং তার অভ্যাসেও এর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।[১৩] অনেক সময় ব্যক্তি মনে করেন, রীতিনীতি মেনে চললে ভবিষ্যতের নেতিবাচক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ব্যক্তি মানসিক ভাবে আত্মস্থ করে থাকেন যে, বেশিরভাগ রীতিনীতি পালন তা বাচনিক বা অবাচনিক যেকোনো রূপেই হতে পারে সমস্যা সমাধানের একটি চর্চা। এই চর্চা নেতিবাচক বিষয় থেকে রক্ষা করে ইতিবাচক ভবিষ্যতের সুরক্ষা দান করে।[১৪]

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং রীতিনীতি, একটি সম্প্রদায়ের পরিচয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ গঠন করে। সংস্কৃতি প্রভাবিত ট্যাবু বিশ্বাস এবং অনুশীলন মানব মনে গভীরভাবে প্রোথিত থাকে। উপরন্তু, সমাজে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির এ জাতীয় ট্যাবুর প্রতি আচরণ (আস্থা বা অনাস্থা) সাধারণ মানুষের এর প্রতি ইতিবাচক বা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কোনো ধারণার প্রতি বিশ্বাস সাধারণত একটি প্রজন্ম থেকে আরেকটি প্রজন্মের মধ্যে বহমান থাকে। একটি নির্দিষ্ট সমাজের নৈতিক বিশ্বাস (moral codes) কালের বিবর্তনে অভ্যাসে রূপ নিতে পারে। যুগে যুগে কোনো একটি রীতির বা বিষয়ের অর্থের ধারণাও বদলে যেতে পারে এর মূল কারণ হলো বিশ্বায়ন।[১৫] বর্তমানে প্রযুক্তির ব্যবহার, শিক্ষার মানের অগ্রসরতা, বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রসার এবং বিশ্বায়নের প্রভাবে প্রাচীন অনেক রীতিনীতি, ধ্যান ধারণা থেকে মানুষ বের হয়ে আসছে। প্রকৃতি বা পরিবেশগত ধারণা সম্পর্কে আমাদের পূর্বপুরুষদের জ্ঞান সীমিত ছিল। এই রীতি বিশ্বাস তাদের জীবনাচরণের জন্যে সহজ ছিল, কারণ অনেক কিছুই তাদের অজানা ছিল। অজানা বিষয়ে একধরনের ভয় কাজ করেছে এবং তাদের জন্যে সহজে সবকিছু যুক্তি দিয়ে বুঝবার মতন পরিবেশ ছিল না।[১৬] তারা পরিবেশ থেকে প্রাপ্তজ্ঞান দিয়ে কালক্রমে অনুধাবন করতে শিখেছেন কোনটি বিশ্বাস করা যায় বা কোনটির বিশ্বাসযোগ্য কোনো ভিত্তি নেই। যুগের বিবর্তনে বিভিন্ন পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত নানা ইতিবাচক ধারণা থেকে নেতিবাচক ধারণার প্রতি বিশ্বাসের প্রবণতা কমেছে।

৪. সামাজিক প্রজ্ঞানমূলক (cognition) ধারণায় সাংস্কৃতিক ট্যাবু

সামাজিক প্রজ্ঞানমূলক (Social cognitive) ধারণাটি Albert Bandura ১৯৮৬ সালে প্রথম উপস্থাপন করেন।[১৭] প্রজ্ঞান হলো চিন্তা, মনোযোগ, শিক্ষণ, স্মৃতি এবং উপলব্ধিসহ মস্তিষ্কে সংঘটিত মানসিক প্রক্রিয়া। সমাজে বসবারসত মানুষের মানসিক প্রকৃতি বুঝে আচরণ সংঘটন সামাজিক সজ্ঞাপন সফল করে। সামাজিক প্রজ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ সমাজ থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ধারণা, রীতিনীতি, আদেশ নিষেধ সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং সামাজিক পরিবেশ অনুযায়ী যথাযথভাবে আচরণ করতে সক্ষম হয়।[১৮] মানুষ ছোটবেলা থেকেই বেড়ে ওঠার পরিবেশ দ্বারা

প্রভাবিত হয়ে তার পারিপার্শ্বিক বিষয়ে চিন্তা, বিশ্বাস ও ধারণা লাভ করে থাকে। কালক্রমে এ ধারণাগুলো অভ্যাসে রূপান্তরিত হয়।[১৯] উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাঙালি সমাজের প্রতিবেশে বসে থাকা অবস্থায় বড়দের দেখলে উঠে দাঁড়ানো, তাদের সামনে পায়ের ওপর পা তুলে না-বসা, হাতের ইশারায় না-ডাকা, চোখে চোখ রেখে কথা না বলা (সম্মানার্থে), গায়ে পা লেগে গেলে তাকে ছুঁয়ে সালাম করার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রীতির প্রচলন রয়েছে। এ জাতীয় রীতির ধারণা শিশু তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে এ রীতি পালন তার আচরণে প্রকাশ পায়। সাধারণত অভ্যাস মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঞ্চলের কার্যকারিতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রবৃত্তির (instincts) মতো কাজ করে। অভ্যাস আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বাচনিক বা অবাচনিক ভাষা ব্যবহারে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের ভাষিক আচরণকে প্রভাবিত করে।[২০] ব্যক্তির ইতিবাচক বা নেতিবাচক যেকোনো ধরনের অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে, যা সম্পূর্ণ নির্ভর করে বিভিন্ন বিষয়ে তার পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশ ও মানুষের আচরণের ওপর।[২১]

সমাজের মানুষের আচরণ ও সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন রীতি থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা দ্বারা মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।[২২] মানুষ বেড়ে ওঠার সাথে সাথে নতুন ভাবে চিন্তা করতে শেখে, পাশাপাশি তার অভ্যাসের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।[২৩] সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রথা, রীতিনীতি, ধারণার প্রতি বিশ্বাস বা অবিশ্বাস সে নিজের মতন করে প্রকাশ করে থাকে। কোনো একটি বিষয়ের ওপর মস্তিষ্কে বহু বছর ধরে গড়ে ওঠা ধারণা পরিবর্তন করতে সময় লেগে যায়। তবে অভিজ্ঞতা অর্জনের সাথে সাথে ব্যক্তি তার চিন্তা, বিশ্বাসকে নতুন করেও অভ্যাসে পরিণত করতে সমর্থ হয়।[২৪] সাংস্কৃতিক ট্যাবু বিষয়ক ধারণা প্রজ্ঞানমূলক (cognitive) এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক আচরণ ও অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা যায়। সাধারণত এ জাতীয় ট্যাবু ধারণা লালন এবং এর প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির দুটি লক্ষ্য অর্জনের চিন্তা কাজ করে, একটি হলো সৌভাগ্য অর্জন করা, আরেকটি হলো দুর্ভাগ্য এড়ানোর চেষ্টা। উদাহরণস্বরূপ (প্রবন্ধে উপস্থাপিত উপাত্ত: ১৩ ও ১৪) বলা যায়, স্বামীর মঙ্গলার্থে সনাতনধর্মে বিশ্বাসী বিবাহিত নারী শাঁখা সিঁদুর পরিধান করেন আবার দুর্ভাগ্য এড়ানোর চেষ্টা হিসেবে সন্তানসম্ভবা নারীর হাঁস মুরগি জবাই করা নিষিদ্ধ যাতে তার সন্তান জন্মের সময় ঠোঁট কাটা না হয়। সাংস্কৃতিক ট্যাবু প্রতিটি সমাজেই মানুষের মাঝে প্রচলিত। একেক সমাজ-সংস্কৃতিতে একেক ধরনের রীতিনীতি, বিশ্বাস গুরুত্ব পায়। সমাজ ও প্রকৃতি থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করে ব্যক্তি তার আচরণ প্রকাশ এবং নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এর ফলে সাংস্কৃতিক ট্যাবু ধারণা এবং এর রীতি পালনও কালপরম্পরায় এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে প্রসারিত হয়। সামাজিক প্রজ্ঞানমূলক (cognition) ধারণা অনুযায়ী মানুষ ছোট থেকেই তার চারপাশের পরিবেশ হতে অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং প্রতিবেশ অনুযায়ী তার আচরণে সমাজ প্রভাবিত চিন্তা, রীতিনীতি, আদেশ নিষেধ প্রকাশ পায়। ভাষিক ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তি তার আচরণের মাধ্যমে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকেই উপস্থাপন করে থাকেন।[২৫] সাংস্কৃতিক ট্যাবু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থারই একটি বৈচিত্র্যময় বহিঃপ্রকাশ। ব্যক্তি তার পরিবেশ থেকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় বিভিন্ন বিধি-নিষেধ সংক্রান্ত তথ্য লাভ করেন এবং ইতিবাচক বা নেতিবাচক ধারণাপুষ্ট হয়ে নিজের মতন করে আচরণ করেন।[২৬] কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে

ইতিবাচক বা নেতিবাচক মনোভাব কিংবা কোন পরিবেশে কী ধরনের আচরণ করবেন তা পূর্বঅভিজ্ঞতা কেমন ছিল তার ভিত্তিতে নির্ভর করে।[২৭]

৫. নারী বিষয়ক অভাষিক সাংস্কৃতিক ট্যাবুর উপাত্তের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা

৫.১ প্রাপ্ত উপাত্ত উপস্থাপন

বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে প্রাপ্ত উপাত্তগুলো কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে, যথা: অবিবাহিত নারী-বিষয়ক সাংস্কৃতিক ট্যাবু (১-৪), বিবাহিত নারী-বিষয়ক সাংস্কৃতিক ট্যাবু (৫-১৩), সন্তানসম্ভবা নারী-বিষয়ক সাংস্কৃতিক ট্যাবু (১৪-১৭), নিঃসন্তান নারী-বিষয়ক সাংস্কৃতিক ট্যাবু (১৮), বিধবা নারী-সংক্রান্ত সাংস্কৃতিক ট্যাবু (১৯), সকল বয়সী নারী-বিষয়ক সাংস্কৃতিক ট্যাবু (২০-২৮), গৃহস্থালি ও প্রতিবেশ নির্ভর কাজের ক্ষেত্রে নারী-সংক্রান্ত সাংস্কৃতিক ট্যাবু (২৯-৫০) প্রভৃতি। এখানে সারণির মাধ্যমে উপাত্তগুলো উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৫.১: বাংলাদেশের প্রতিবেশে প্রচলিত নারী বিষয়ক সাংস্কৃতিক ট্যাবু

বিভিন্ন রূপে নারী	প্রচলিত নারী বিষয়ক সাংস্কৃতিক ট্যাবু
অবিবাহিত নারী	১। রাতের বেলা আয়না দেখলে দেরিতে বিয়ে হবে।
	২। ছোট বেলায় কুমারী মেয়ে খুন্তির বাড়ি খেলে সে বন্ধ্যা হয়ে যাবে।
	৩। রান্না করা হাঁস-মুরগির পেটের ডিম অবিবাহিত মেয়ে খেলে সে বন্ধ্যা হয়ে যাবে।
	৪। প্রথম পিঠা অবিবাহিত মেয়ে খেতে পারবে না, তাহলে মেয়ে সন্তান প্রসব করবে।
বিবাহিত নারী	৫। বিবাহিত মেয়েদের নাকে নাকফুল এবং হাতে চুরি না পরলে স্বামীর অমঙ্গল হয়।
	৬। এক বিছানার চাদর দুজন মিলে ধরলে ঘরে সতীন আসে।
	৭। আঁচড়ানো চুল আবার আঁচড়ালে সতীন আসে।
	৮। সবার খাওয়া শেষ না হলে খেতে বসলে সংসারের অমঙ্গল হবে।
	৯। বিবাহিত মহিলাদের নতুন কাপড় পরে পেছনে তাকালে স্বামীর অমঙ্গল হয়।
	১০। নাক ফুল হারিয়ে গেলে স্বামীর বিপদ হয়।
	১১। খাবার পরে বাসন চেটে খেলে মেয়ে হয়।
	১২। একমাত্র পুত্রের মা রাতে বাঁশির আওয়াজ শুনলে সেদিন আর কোনো খাবার গ্রহণ করতে পারেন না।
	১৩। সনাতন ধর্ম অনুযায়ী শাঁখা সিঁদুর না পরলে স্বামীর অমঙ্গল হয়।
সন্তানসম্ভবা নারী	১৪। গর্ভবতী নারীর হাঁস মুরগি জবাই করা যাবে না, তাহলে বাচ্চা ঠোঁট কাটা হয়।
	১৫। চন্দ্রগ্রহণের সময় সন্তানসম্ভবা নারীর বটি, দা, ছুরির কাজ করা যাবে না।
	১৬। চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের সময় গর্ভবতী নারীর খাদ্য গ্রহণ করা যাবে না।
	১৭। দুপুর, সন্ধ্যা বা মাঝরাতে ঘর থেকে বের হলে লোহা, আগুন জাতীয় দ্রব্য সাথে রাখতে বলা হয়।
নিঃসন্তান নারী	১৮। নিঃসন্তান বা বন্ধ্যা কারো মুখ দেখে বের হলে অমঙ্গল হয়।
বিধবা নারী	১৯। বিয়ের অনুষ্ঠানে কোনো বিধবা উপস্থিত থাকলে নব দম্পতির অমঙ্গল হবে।

সব বয়সী নারী	২০। বাঁশ গাছের নিচে চুল রেখে দিলে তা বাঁশের মতন লম্বা হবে।
	২১। কোনো নারী হাঁড়িতে ভাত খেলে মেয়ে সন্তান প্রসব করবে।
	২২। জোড়া কলা খাওয়া যাবে না, এতে বিয়ের পরে জমজ শিশুর জন্ম হবে।
	২৩। মেয়েদের জোরে কথা বললে সংসারে অশান্তি হবে।
	২৪। মেয়েরা হাঁড়ির প্রথম ভাত বা পিঠা খেলে বন্ধ্যা হয়।
	২৫। মেয়েরা জোরে হাঁটলে বা হাসলে সংসারে অশান্তি, বিপদ আসে।
	২৬। ভাঙ্গা চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ালে অল্প বয়সে বিধবা হয়।
	২৭। আজানের সময় মাথায় কাপড় না দিলে শয়তান প্রস্রাব করে দেয়।
	২৮। অবিবাহিত এবং বিবাহিত মেয়েদের সাদা শাড়ি পরা যাবে না।
নারীর দায়িত্ব পালনে	২৯। বাচ্চার কান ফুঁড়িয়ে খুঁত করে দিলে যম আসে না।
	৩০। বাচ্চাদের শরীরে লোহা (তাবিজ বা ধাতু) রাখতে হবে নইলে খারাপ নজর পড়বে।
	৩১। ছোট শিশুদের কপালে কালো টিপ পরালে নজর লাগবে না।
	৩২। সকালবেলা ঘর, উঠান ঝাড়ু না দিলে অমঙ্গল হবে মনে করা হয়।
	৩৩। সকালবেলা রাতের বাসি কাপড় বদলে দিন শুরু করতে হবে।
	৩৪। সকালে না খেয়ে বা খালি পেটে বাসা থেকে বের হওয়া অমঙ্গল।
	৩৫। দুপুরের সময় ভিক্ষা দিলে ঘরে খাদ্য ঘাটতি ঘটে।
	৩৬। সন্ধ্যাবেলা চুল খোলা রেখে বাইরে যাওয়া যাবে না।
	৩৭। সন্ধ্যায় বা খালি ঘরে বাতি না জ্বালানোকে অমঙ্গল হিসেবে ধরা হয়।
	৩৮। রাতে ঝাড়ু দেওয়া যাবে না এবং ময়লা ফেলা হলে ঘরে অশুভ দৃষ্টি পড়ে।
	৩৯। রাতের বেলা ময়লা পানি বাইরে ফেলা যাবে না, তাহলে ঘরে খারাপ দৃষ্টি পড়ে।
	৪০। ভেজা কাপড় সন্ধ্যার আগেই ঘরে তুলতে হবে নইলে খারাপ বাতাস লাগবে।
	৪১। কপালে হাত দিয়ে বসলে ভাগ্যে খারাপ লেখা হয়।
	৪২। ঝাড়ু গায়ে লাগলে লক্ষ্মী চলে যায়।
	৪৩। কেউ পানি চাইলে শুধু পানি খেতে দেওয়া যাবে না নইলে ঘরে অলক্ষ্মী প্রবেশ করবে।
	৪৪। কাউকে এক লোকমা ভাত দেয়া যাবে না তাহলে সে পানিতে পড়বে।
	৪৫। কেউ খাবার দিলে তাকে খালি বাটি ফেরত দেয়া যাবে না। এত গৃহস্থ ঘরের লক্ষ্মী চলে যাবে।
	৪৬। খালি মুখে মেহমানকে বিদায় দিলে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়।
	৪৭। বিয়ে বাড়িতে কালো রঙের পোশাক পরিধান করা অমঙ্গল।
	৪৮। নতুন কাপড়ে আগুনের ছ্যাঁকা নিয়ে পরিধান করতে হবে নইলে খারাপ নজর লাগবে।
	৪৯। রাতে কাউকে সুঁই-সুতা বা হলুদ ধার দেয়া যাবে না।
	৫০। গেঞ্জি গামছা সেলাই করে পরলে বা জামা পরে থাকা অবস্থায় সেলাই করলে গরিব হয়ে যায়।

৫.২ প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ

একটি সমাজের প্রচলিত সাংস্কৃতিক রীতি পালনের ধারণা থেকে সেই সমাজের মানুষের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, নারীর প্রতি আচরণ সম্পর্কে একটি চিত্র পাওয়া যায়। প্রবন্ধে উপস্থাপিত উপাত্তে, বাংলাদেশের প্রতিবেশে প্রচলিত এসব সাংস্কৃতিক ট্যাবুর মাধ্যমে নারীর সামাজিক অবস্থান সম্পর্কেও সামগ্রিক একটি ধারণা পাওয়া যায়।

ক) সামগ্রিক ক্ষেত্রে নারীর সব ধরনের আচরণের প্রতি কিছু আদেশ-নিষেধ, নির্দেশ লক্ষ করা যায়, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ছোট থেকেই নারীকে তার আচরণ সংযত করার শিক্ষা দেওয়া হয়, যেমন– (উপাত্ত: ২৩, ২৫, ৪১) জোরে হাসা, কথা বলা বা হাঁটা প্রভৃতি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একটি চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে অর্থাৎ নারীর আচরণিক সব কিছুই শিশুকাল থেকে নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন, যাতে ভবিষ্যতের জন্যে তার জীবনে নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে। আবার দুর্ভাগ্য যাতে না আসে তাই তাকে শিক্ষা দেওয়া হয় কপালে হাত না দিয়ে বসার। এর অর্থ হচ্ছে ভবিষ্যতে তার দুর্ভাগ্যের কারণ হবে তার অসংযত আচরণ।

খ) আমাদের এ অঞ্চলের প্রতিবেশে বাল্যবিবাহ প্রথা খুবই স্বাভাবিক একটি সামাজিক চিত্র। একটি কন্যা শিশু জন্মের পর থেকেই বিবাহের প্রথা পালনে তাকে প্রস্তুত করা হয়। এজন্যে দেখা যাচ্ছে, রীতি পালনেও অবিবাহিত নারীর দেরিতে বিয়ে না হওয়ার (উপাত্ত: ১) সমাধান হিসেবে রাতে আয়না দেখা থেকে বিরত থাকার ট্যাবুর প্রচলন রয়েছে।

গ) সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে মেয়ে সন্তান যাতে না হয় তারও কিছু সতর্কতামূলক রীতিপালন (উপাত্ত: ৪, ১১, ২১) বা ধারণার ব্যবহার দেখা যায়। অবিবাহিত নারী বাড়ির তৈরি প্রথম পিঠা খাওয়া, খাবার পর বাসন চেটে খাওয়া, হাঁড়িতে ভাত নিয়ে খাওয়ার রীতি নিষিদ্ধ। এ রীতি মেনে না চললে ভবিষ্যতে তার কন্যা সন্তান হতে পারে। অর্থাৎ আমাদের সমাজে কন্যা শিশুর জন্মের বিষয়টি নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হয়ে থাকে।

ঘ) প্রবন্ধে উপস্থাপিত উপাত্তগুলো বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলা অঞ্চলে নারীর বৈবাহিক অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে সাধারণত নীতি নির্ধারণের প্রয়াস অধিক। অর্থাৎ আমাদের সমাজে নারীর বিবাহ এবং বিবাহ পরবর্তী জীবনকাল তার জন্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রথা পালনের সময়। বিবাহিত নারীর সকল আচরণ আবর্তিত হয় স্বামীর মঙ্গল কামনায় (উপাত্ত: ৫, ৯, ১০, ১৩)। এ সকল রীতি পালনে ব্যত্যয় ঘটলে স্বামীর অমঙ্গল বা ক্ষতি হতে পারে বলে মনে করা হয়ে থাকে। যেমন- স্বামীর মঙ্গলার্থে বিবাহিত নারীর নাকফুল ও চুড়ি পরিধান, শাঁখা-সিঁদুর পরিধান আবার নতুন কাপড় পরে পেছনে না তাকানো বা নাকফুল না-হারানো প্রভৃতি ট্যাবু পরিলক্ষিত হয়।

ঙ) বিবাহিত নারী রীতি না-মানলে বা সচেতন না-হলে স্বামীর বহুবিবাহ (উপাত্ত: ৬, ৭) হবার সম্ভাবনা স্বাভাবিক বলে গণ্য করা হয়। আমাদের দেশে এক স্ত্রী নিয়ে সংসার করার সময় পুরুষের

পুনরায় বিবাহকে সাধারণ বিষয় হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। এ জন্যে রীতি পালন না-করলে 'সতীন ঘরে আসবে' জাতীয় ধারণার প্রচলন দেখা যায়।

চ) নারীর সন্তান ধারণ ক্ষমতাও (উপাত্ত: ২, ২৪) সাংস্কৃতিক রীতি পালনের ওপর নির্ভর করে। ছোট বেলায় কন্যা শিশুর খুন্তির বাড়ি বা নারীর হাঁড়ির প্রথম ভাত বা পিঠা খাওয়া নিষিদ্ধ। এ রীতি পালন না-করলে ভবিষ্যতে সন্তান ধারণে অক্ষম হয়ে যাবেন জাতীয় ধারণার প্রচলন সমাজে লক্ষ করা যায়।

ছ) সন্তানসম্ভবা নারীর ক্ষেত্রে তার অনাগত ভবিষ্যৎ শিশুর নিরাপত্তা ও সুস্থতার দায়ভারও (উপাত্ত: ৩, ১৪-১৭) নারীর সমাজের রীতি পালনের ওপর নির্ভর করছে। জবাইকৃত হাঁস মুরগির পেটের ডিম খাওয়া বা চন্দ্রসূর্য গ্রহণের সময় খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। আবার বাইরে বের হবার সময় সন্তানের মঙ্গলার্থে আগুন বা লোহা জাতীয় দ্রব্য সাথে রাখার রীতি রয়েছে। আমাদের এ অঞ্চলের প্রতিবেশে সন্তানের প্রতি পুরুষের এ ধরনের রীতি পালনের কোনো দৃষ্টান্ত নেই।

জ) নিঃসন্তান এবং বৈধব্যের শিকার নারীর উপস্থিতি (উপাত্ত: ১৮, ১৯) সমাজে অন্য নারীর সৌভাগ্যের পক্ষে অকল্যাণকর বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ নিঃসন্তান বা বিধবা নারীকে সমাজে অমঙ্গলের তকমা দেওয়া হয়। তাই কোনো শুভ কাজে বের হবার সময় বা কেউ নতুন জীবন শুরু করছে এ জাতীয় অনুষ্ঠানে তার পদচারণা নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হয়, যদিও পুরুষদের ক্ষেত্রে এ জাতীয় কোনো রীতি সমাজে দেখা যায় না।

ঝ) সনাতন ধর্ম পালনকারী বিবাহিত নারী স্বামীর মঙ্গলার্থে শাঁখা-সিঁদুর পরেন তেমনি আজানের সময় ইসলাম ধর্ম পালনকারী নারী মাথায় কাপড় দেন। অর্থাৎ ধর্মীয় রীতি পালনের ক্ষেত্রেও (উপাত্ত: ১৩, ২৭) নারীর কর্তব্য বা রীতি রয়েছে।

ঞ) স্বামীর মৃত্যু এড়াতে নারীর আচরণকে সংযত করার নির্দেশ পালনের রীতি (উপাত্ত: ২৬) রয়েছে। অর্থাৎ যদি কোনো নারী ভাঙা চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ান তবে ভবিষ্যতে তার স্বামীর মৃত্যুর জন্যে এই রীতি তাকেই দায়ী করে।

ট) নারীর পরিধেয় কাপড়ের ক্ষেত্রে সাদা রংকে পরিহার করার রীতি (উপাত্ত: ২৮) দেখা যায়। অবিবাহিত বা বিবাহিত নারীদের সাদা রং পরতে নিরুৎসাহিত করা হয়। কারণ এ অঞ্চলের প্রতিবেশে বিধবার পরিধেয় হিসেবে সাদা রঙের শাড়ি অবিবাহিত ও বিবাহিত নারীদের পরিধেয় বস্ত্র হিসেবে অকল্যাণকর মনে করা হয়।

ঠ) আমাদের সংস্কৃতিতে খাবার সময় সবার খাওয়া শেষ হয়ে গেলে, বাড়ির নারীরা বিশেষ করে বিবাহিত নারী খাবার গ্রহণ করেন। নারী আগে খাবার গ্রহণ করলে পরিবারের অকল্যাণ হবার রীতি (উপাত্ত: ৮) প্রভাবিত চিন্তা এ অঞ্চলের মানুষের আচরণের খুবই প্রচলিত একটি দৃষ্টান্ত। পাশাপাশি বাড়ির পুরুষ যাতে পর্যাপ্ত এবং ভালো খাবার খেতে পারেন সেই দৃষ্টিভঙ্গিও কাজ করে। গৃহস্থালি প্রতিবেশে সমাজের পুরুষের আধিপত্যের এ চিত্রটিও এ রীতি থেকে বোঝা যায়।

ড) সন্তানের সুরক্ষায় অনেক সময় মায়ের খাদ্য গ্রহণ থেকেও বিরত থাকার রীতি (উপাত্ত: ১২) রয়েছে। কিছু কিছু অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে যে, যার একটি পুত্র সন্তান রয়েছে তিনি যদি রাতে বাঁশির আওয়াজ শোনেন তবে রাতে আহার গ্রহণ করতে পারবেন না, তাহলে সন্তানের ক্ষতি হবে।

ঢ) সন্তান ধারণের ক্ষেত্রে খাদ্য গ্রহণে সামাজিক বিধি নিষেধ (উপাত্ত: ২২) পালন দেখা যায়। সাংস্কৃতিক ট্যাবু প্রভাবিত ধারণা থেকে মনে করা হয়, নারী জোড়া কলা খেলে জমজ সন্তান প্রসব করবেন। জমজ সন্তান জন্মদানে মায়ের জন্যে কঠিন পরিস্থিতি এড়াতে এ জাতীয় রীতি মেনে চলার রেওয়াজ দেখা যায়।

ত) বাঙালি নারীদের লম্বা কেশ সৌন্দর্যের মাপ কাঠি হিসেবে ধরা হয়। সেক্ষেত্রেও নারীর রীতি (উপাত্ত: ২০) পালন করার সুযোগ রয়েছে। যথা– বাঁশ গাছের নিচে চুল রেখে দিলে চুল বাঁশের মতন লম্বা হবে।

থ) বাঙালি নারীর গৃহস্থালি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু অবাচনিক সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, নিষেধ লক্ষণীয়-

১) শিশুর নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ রক্ষা মায়ের রীতি পালনের (উপাত্ত: ২৯, ৩০, ৩১) ওপর নির্ভর করে। যথা-শিশুকে অমঙ্গলের হাত থেকে বাঁচাতে কপালে কালো টিপ দেয়া, কান ফুঁড়িয়ে দেওয়া, শিশুর সাথে লোহা জাতীয় দ্রব্য রাখা।

২) রীতি মেনে খাদ্য পরিবেশনের (উপাত্ত: ৪৩-৪৬) দায়িত্বও নারীর। যেমন– কেউ পানি চাইলে সাথে কিছু খেতে দেওয়া, একবার না খাইয়ে আরেকবার খাবার মুখে তুলে দেওয়া অন্যথায় অমঙ্গল হবার আশঙ্কা দেখা হয়।

৩) পরিবারে মঙ্গলার্থে রীতি মেনে সবার নতুন কাপড় পরা থেকে (উপাত্ত: ৩৮, ৫০) পুরনো কাপড় সেলাই করার দায়িত্ব পালনও নারী করে থাকেন। যেমন– নতুন কাপড় পরে আগুনে ছ্যাঁকা নেয়া বা গেঞ্জি, জামা পরে থাকা অবস্থায় সেলাই না করে দেয়া।

৪) সময় ভিত্তিক নিষেধাজ্ঞা পালনে–

ক. সকাল বেলার রীতির দায়িত্ব (উপাত্ত: ৩২-৩৪) পালনে নারীকে সচেতন থাকতে হয়। ঘর পরিষ্কার থেকে বাড়ির সবাইকে বাইরে বের হবার আগে খাবার পরিবেশন সঠিক সময়ে না- করলে বাড়ির অমঙ্গল হবার আশঙ্কা কাজ করে, যার সুরক্ষার দায়িত্ব নারীর। পাশাপাশি নারী ঘরের কাজ (উপাত্ত: ৪২) সাবধানে সম্পন্ন না-করলেও অলক্ষণ ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

খ. দুপুরে ভিক্ষা দিলে গৃহস্থের অন্ন ঘাটতি ঘটে এ জন্যে এই সময়ে ভিক্ষা না দেয়ার রীতি রয়েছে। অর্থাৎ দুপুর বেলার (উপাত্ত: ৩৫) রীতি পালনের দায়িত্বেও নারী।

গ. সন্ধ্যাবেলায় ঘরে বাতি দিয়ে ঘর পবিত্র করা এবং ঘরের সবার কাপড় (উপাত্ত: ৩৬, ৩৭, ৪০) বাইরে থেকে আনার রীতি, পাশাপাশি মা এবং তার কন্যা শিশুর চুল খোলা রেখে বাইরে না যাওয়ার রীতি পালন করার দায়িত্বও নারীর।

ঘ. নারীকে রাতের বেলার সাংস্কৃতিক ট্যাবু রীতির (উপাত্ত: ৩৮, ৪৯) দায়িত্ব পালন করতে হয়। যেমন– রাতে ঝাড়ু না দেয়া, ঘরের ময়লা বা রান্নার পরে অবশিষ্ট ময়লা পানি বাইরে না ফেলা প্রভৃতি রীতি পালনে নারী সক্রিয় থাকেন। এ থেকে অনুমেয় যে, আমাদের সমাজে সকাল থেকে শুরু করে রাতের শেষ কাজ পর্যন্ত সংসারের কল্যাণের উদ্দেশ্যে রীতি পালন করেন নারী।

৫.৩ নারীবিষয়ক অভাষিক সাংস্কৃতিক ট্যাবুর উপাত্তের পর্যালোচনা

একটি অঞ্চলে বসবাসরত মানুষের নারীর প্রতি মনোভাব এবং আচরণ সেই সমাজ ব্যবস্থার রীতিনীতি, আদর্শের একটি চিত্র উস্থাপন করে। ব্যক্তি তার প্রতিবেশ লব্ধ বিভিন্ন রীতিনীতি, ধ্যান ধারণা, বিশ্বাস, সঙ্গদ্বারা প্রভাবিত আচরণিক বহিঃপ্রকাশ করে থাকেন।[২৮] বাঙালি সমাজে নারীর প্রতি আচরণে উপরিউক্ত অবাচনিক সাংস্কৃতিক ট্যাবু পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, বহুকাল থেকেই ধর্মীয় বা সামাজিক ভাবেই বেশির ভাগ আদেশ নিষেধ রীতি রেওয়াজ পালনে নারীদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কন্যা শিশু, অবিবাহিত, বিবাহিত, সন্তানসম্ভবা, নিঃসন্তান, বিধবা সকল সামাজিক অবস্থানের নারীর প্রতি রীতি পালনের আচরণে বহু যুগের সামাজিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক রীতির চর্চার একটি চিত্র অনুধাবন করা যায়। যা কাল পরম্পরায় মানুষের অভিজ্ঞতায় ও আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। ইতিবাচক বা নেতিবাচক ধারণাগুলো অভ্যাস হিসেবে গড়ে ওঠে যা ব্যক্তি খুব স্বাভাবিক ভাবেই পালন করতে বাধ্য হয়ে ওঠেন।[২৯] উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমাদের সমাজে ছোট থেকেই নারীকে তার আচরণ, যথা– জোরে হাসা, কথা বলা, জোরে হাঁটা, কপালে হাত দিয়ে বসা (উপাত্ত: ২৩, ২৫, ৪১) নিয়ন্ত্রণ করবার শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে এ জাতীয় ট্যাবু তার অভ্যাসে পরিণত হয়। সাধারণত অভ্যাস প্রবৃত্তির (instincts) মতো কাজ করে।[৩০] তাই পরবর্তীতে এ সকল রীতি পালন একজন নারীর অভ্যাসে পরিণত হয়। নারীকে দমিয়ে রাখতে এ জাতীয় ট্যাবু প্রভাবিত অভ্যাস গড়ে তোলার নেপথ্যে সক্রিয় পুরুষ শাসিত সমাজ অর্থাৎ পুরুষের তৈরি ট্যাবু।

প্রতিবেশগত আচরণ ও প্রচলিত বিভিন্ন রীতি থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা দ্বারা মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।[৩১] এ অঞ্চলের নারীরা যেহেতু বহুকাল ধরে ঘরে অবস্থান করে সংসারের দায়িত্ব পালন করেছেন তাই গৃহস্থালি সংক্রান্ত সকল রীতির দায়ভার যুগযুগ ধরে তারা বহন করে এসেছেন। ঘরের অমঙ্গল রোধে গৃহস্থলি সকল সাংস্কৃতিক ট্যাবু পালনের দায়িত্ব নারীকে করতে দেখা যায়। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, রাত সকল সময়ে (উপাত্ত: ৩৫-৪০, ৪৯) ঘরের সবার সকল সুরক্ষার দায়িত্ব হতে শুরু করে কাউকে ভিক্ষা বা কিছু ধার দেওয়া, ঘরের পরিবার পরিজনের রীতি অনুযায়ী সবার খাবার পরিবেশন, ঘরের শুদ্ধিকরণের সকল দায়িত্ব নারীর। আমাদের সংস্কৃতিতে অতিথি আপ্যায়নে নারীদের ভূমিকা মুখ্য। এ অঞ্চলে অতিথি সেবা (উপাত্ত: ৪৬) না হলে গৃহস্থের

অমঙ্গল হবার ধারণা প্রচলিত। অপরিচিত কেউ পানি চাইলে তাকে খাবারসহ পানি দেবার রেওয়াজ (উপাত্ত: ৪৩) রয়েছে। পাশাপাশি কেউ খাবার দিলে তাকে সেই পাত্র পূর্ণ করে খাবার ফেরত দেওয়ার প্রচলন (উপাত্ত: ৪৫) আমাদের সাংস্কৃতিক প্রতিবেশে খুব স্বাভাবিক দৃষ্টিতেই দেখা হয়। এ জাতীয় আচরণ ব্যক্তি প্রতিবেশ থেকে শিখে পরবর্তী জীবনে তার নিজের আচরণিক উপস্থাপনায় তা প্রকাশ করে থাকে।[৩২] সাংস্কৃতিক ট্যাবুর রীতি পালনের প্রতি পরিবারে মা, বড় বোন, খালা নানি, ফুফু, দাদি অর্থাৎ অভিভাবকস্থানীয় নারীর আচরণিক প্রকাশ থেকে একজন কন্যা শিশু তার অভ্যাসে এসকল রীতি পালন আয়ত্ত করে নেয়।

খাদ্য গ্রহণে রীতি পালন বিশ্বজনীন খুবই পরিচিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক ট্যাবু। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পশিম মালয়শিয়ার ওরাং আসলি (Orang Asli) আদিবাসীর সন্তানসম্ভবা নারীর ছোট প্রাণী যথা, ইঁদুর, কাঠবিড়ালি, ব্যাঙ, ছোট পাখি ও ছোট মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ যাতে তার মধ্যে কোনো ধরনের দুর্বলতার (weak spirits) জন্ম না হয়। পাপুয়া নিউ গিনির ওনাবাসুলু আদিবাসী (Onabasulu) নারীদের জন্যা তাজা মাংস, কলা এবং লাল রঙের ফল গ্রহণ নিষিদ্ধ কারণ তাদের মাসিক (menstruating) হয়। যদি কোনো ঋতুময়ী নারী তাজা মাছ খান তবে যেই ফাঁদ (trap) দিয়ে মাছ ধরা হয়েছে সেই ফাঁদে আর মাছ উঠবেনা। বয়স্ক নারীর জন্যে মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ এবং গর্ভবতী নারী ডিম খেতে পারবেন না। কিরিউইনা দ্বীপের (Kiriwina Islanders) আদিবাসী নারীর কলা, আম খাওয়া নিষিদ্ধ যাতে অনাগত সন্তান সুস্থ ভাবে জন্ম নিতে পারে। বেনিন এবং ইশান (Benin and Ishan) অঞ্চলে নতুন মায়ের তেল এবং তাজা মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ। মধ্য-পশ্চিম নাইজেরিয়ার ইশান, আফেমাই এবং ইসকো (Ishan, Afemai, and Isoko) অঞ্চলের সন্তানসম্ভবা নারীর শামুক এবং আসাবা (Asaba) অঞ্চলে ডিম এবং দুধ গ্রহণ নিষিদ্ধ কারণ এসব অঞ্চলের মানুষ মনে করেন এ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করলে জন্মের পর সন্তানের খারাপ অভ্যাস গড়ে ওঠে।[৩৩] বাংলাদেশের প্রতিবেশ প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, (উপাত্ত: ৪, ৮, ১১, ১৬, ২১, ২২) অবিবাহিত নারীর ক্ষেত্রে বাড়িতে প্রস্তুতকৃত প্রথম পিঠা খাওয়া নিষিদ্ধ, বিবাহিত নারীর পরিবারের সবার শেষে খাদ্য গ্রহণ রীতি, খাবার পরে বাসন চেটে খাওয়া, চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের সময় সন্তান-সম্ভবা নারীর খাদ্য গ্রহণ, হাঁড়িতে ভাত খাওয়া বা জোড়া কলা খাওয়া নিষিদ্ধ। খাদ্য গ্রহণে এ জাতীয় খাদ্যাভাসে সতর্কতাজনিত রীতি (উপাত্ত: ৪, ১১, ২১) পালন বেশির ভাগই সাবধানতা অবলম্বন যাতে নারী কন্যা সন্তানের জন্ম না দেন।

সামাজিক প্রজ্ঞানমূলক (cognition) ধারণায় ছোট থেকেই চারপাশের পরিবেশ হতে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা এবং প্রতিবেশ প্রভাবিত চিন্তা, রীতিনীতি, আদেশ নিষেধ আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।[৩৪] সাংস্কৃতিক ট্যাবু রীতি পালনে নিঃসন্তান এবং বিধবা নারীর প্রতি সমাজের মানুষের নির্দয় আচরণিক ধারণা পাওয়া যায়। কন্যা শিশু জন্মকে হতাশাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে দেখার পাশাপাশি তা রোধে রীতি পালনও আমাদের সমাজের নারী সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির ধারণা পাওয়া যায়। সেই প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের সমাজে পুরুষ অর্থাৎ ছেলের কদর বেশি। ছেলে সন্তান প্রত্যাশিত,[৩৫] কন্যা শিশুর জন্মগ্রহণ অনাকাঙ্ক্ষিত ও নেতিবাচক ধারণা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার পাশাপাশি কন্যা

জন্ম নেবার দায়ভার এবং তা প্রতিকারও নারীর রীতি (উপাত্ত: ২১) পালনের ওপর নির্ভর করে বলে সমাজে চিহ্নিত। অবাচনিক সাংস্কৃতিক ট্যাবু রীতিতে কালো রঙের রূপক উপস্থাপন খুবই চমকপ্রদ কারণ কালোকে অশুভ জ্ঞান করা হয় (উপাত্ত: ৪৭)। গায়ের রঙের ক্ষেত্রেও কালো রঙের প্রতি নেতিবাচক ধারণা পোষণ করা হয়। আবার মা কালো রঙের কাজলের টিপ কপালে লাগিয়ে শিশুকে খারাপ দৃষ্টি থেকে বাঁচাতে (উপাত্ত: ৪৭) ব্যবহার করেন। অর্থাৎ কালো রঙকে অচ্ছুত জ্ঞান করলেও আবার তা অশুভ দৃষ্টি থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। সমাজে রঙের ব্যবহারকে রূপকার্থে ট্যাবু হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কারণ সংজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে মানুষের ভাবগত উপস্থাপন হলো চারপাশের বিষয়কে রূপকগত ভাবে প্রকাশ করা।[৩৬] একেক সমাজের প্রতিবেশে একেক ধরনের রঙের রূপক উপস্থাপনের ভিন্নতা দেখা যায়, চিনে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে লাল রঙ পরিধান নিষিদ্ধ, বাঙালি নারী বিয়েতে সাধারণত লাল রঙের কাপড় পরিধান করে থাকেন। পাশ্চাত্যে সাদা রংকে শুভ ও পবিত্র জ্ঞানকরে নববধূর পোশাক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রাচ্যের বিশেষ করে বাংলা অঞ্চলের প্রতিবেশে বিধবা নারী ছাড়া সকল নারীকে সাদা রং পরিহার করার রীতির (উপাত্ত: ২৮) প্রচলন দেখা যায়।

সামাজিক বা ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি থেকে বিভিন্ন রীতিনীতি ও নিষেধ দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যক্তির অর্থনৈতিক এবং ভৌগোলিক অবস্থানও গুরুত্ব বহন করে। সাধারণত শহরে বসবাসরত ব্যক্তির চেয়ে গ্রামে অবস্থানকারী মানুষ এ জাতীয় রীতি পালনে বেশি তৎপর। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মুসলমান নারীর আজানের সময় মাথায় কাপড় দেওয়া বা সনাতন ধর্মে বিবাহিত নারীর শাঁখা-সিঁদুরের ব্যবহার (উপাত্ত: ১৩, ২৭)। আবার শহরে বা গ্রামেও শিক্ষার আলোতে আলোকিত বা বৈজ্ঞানিক বিষয়ে ধারণালব্ধ ব্যক্তি এ জাতীয় ধারণায় কম প্রাভাবিত হন বা বিশ্বাসী নন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কর্মক্ষেত্রে অংশ নেয়া নারী নতুন কাপড় পরে আগুনে ছ্যাঁকা নেয়া (উপাত্ত: ৪৮), সন্ধ্যায় চুল খোলা রেখে বাইরে যাওয়া (উপাত্ত: ৩৬), অবিবাহিত নারীর রাতের বেলা আয়না না দেখা (উপাত্ত: ১) বা বিয়ের অনুষ্ঠানে নিঃসন্তান বা বিধবা নারীর উপস্থিতির (উপাত্ত: ১৮,১৯) ধারণার সাথে মঙ্গল-অমঙ্গলের সম্পর্ক নেই। মূলত সাংস্কৃতিক ট্যাবু প্রাচীন ধ্যান ধারণা, ধর্মীয় বা সামাজিক নীতি নির্দেশ দ্বারা প্রভাবিত। সমাজে নারীরা পুরুষের তুলনায় রীতি পালনে বেশি আগ্রহী। সমাজের পুরুষ এমনকি নারীরাও আশা করেন যে প্রথা পালনের মাধ্যমে নারীরাই পরিবারের সুরক্ষার দায়িত্ব নেবেন।[৩৭] উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, স্বামীর মঙ্গল কামনায় শাঁখা, সিঁদুর, নাকফুল, হাতে চুড়ি পরিধান করা আবার সাদা রঙের কাপড় (উপাত্ত: ৫, ৯, ১০, ১৩, ২৬, ২৮) পরিধান না করা। গৃহের ও পরিবারের মঙ্গলার্থে (উপাত্ত: ২৯-৩৯) সকল রীতি পালনের দায়িত্ব নারীদের ওপর নির্ভর করে। পাপুয়া নিউগিনির ওনাবাসুলু আদিবাসী (Onabasulu) নারীদের মাসিকের সময় বাড়ির পরিবেশের মঙ্গলার্থে বাড়ি থেকে দূরে গিয়ে অবস্থান করতে হয় এবং খাদ্য রান্না করে স্বামীকে পরিবেশন নিষিদ্ধ। এ রীতি পালন না করলে স্বামী অসুস্থ এমনকি মৃত্যুও হতে পারে বলে তারা বিশ্বাস করেন।[৩৮] অর্থাৎ সমাজ ও সংস্কৃতি প্রভাবিত বিধি নিষেধগুলো যা পরবর্তী সময়ের সাংস্কৃতিক ট্যাবু তা পালনে জীবনাচরণে ইতিবাচক সৌভাগ্যের[৩৯] প্রভাব দেখা যাবে। বাংলা ভাষায় প্রচলিত অভাষিক সাংস্কৃতিক ট্যাবুর প্রতি এ

অঞ্চলের মানুষের বর্তমান আচরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পূর্বে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাবে অনেকে এসকল ধারণা তাদের দৈনন্দিন অভ্যাসে রপ্ত করে থাকলেও, বর্তমানে সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ জাতীয় ধারণাগুলো সম্পর্কে বেশির ভাগ মানুষের কাছেই গ্রহণযোগ্যতা নেই। শিক্ষার প্রসার ও সামাজিক কুসংস্কার থেকে নতুন প্রজন্মের বেরিয়ে আসার চেষ্টা থেকে মূলত এ জাতীয় রীতির গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পায়।[৪০] সর্বস্তরে নারীর অবস্থান প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়োজন অসাম্প্রদায়িক বিজ্ঞানমনস্ক ও মানবতাবোধ সম্পন্ন নতুন প্রজন্মের দৃঢ় অবস্থান।[৪১]

উপসংহার

মানুষ ছোটবেলা থেকে অবাচনিক সাংস্কৃতিক ট্যাবু ধারণা তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অভিজ্ঞতা লাভের পাশাপাশি আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে। বিজ্ঞানসম্মত ধারণা থেকে নয় বরং বিশ্বাস এবং সামাজিক নীতি-রীতি পালনে এর প্রভাব দেখা যায়। ইতিবাচক অর্থাৎ ভবিষ্যতের সৌভাগ্য বা নেতিবাচক দুর্ভাগ্য এড়ানোর চেষ্টায় সমাজে এ জাতীয় ট্যাবু পালন করা হয়ে থাকে। আলোচ্য প্রবন্ধে এ অঞ্চলের মানুষের আচরণে নারী সংক্রান্ত আবাচনিক সাংস্কৃতিক ট্যাবু ও এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ প্রভাবিত আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উপস্থাপিত উপাত্ত এবং তা বিশ্লেষণে নারীর প্রতি আমাদের সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির একটি ধারণা পাওয়া যায়। সংসারের মঙ্গলার্থে নারীকে শিশুকাল থেকেই প্রস্তুত করা হয় সামাজিক বিধি-নীতি-রীতি পালনের। পাশাপাশি পুরুষ শাসিত সমাজের একটি চিত্রও এতে ফুটে উঠেছে। তবে বর্তমান যুগে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারে নারী বিষয়ক অবাচনিক সাংস্কৃতিক ট্যাবু প্রভাবিত নীতি-নির্দেশ মেনে চলার প্রবণতা অনেক কমে গেছে। বাংলা অঞ্চলের অবাচনিক সাংস্কৃতিক ট্যাবু অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ; পরবর্তীতে এ বিষয়ে বিস্তৃত পরিসরে গবেষণাধর্মী কাজের সুযোগ রয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১ মুহাম্মদ আবদুল হাই, *তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা*, সম্পা: হুমায়ুন আজাদ, ১৯৯৪, মুহাম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৫৯, পৃ. ২৯৯

২ Chunming Gao, *A Sociolinguistic Study of English Taboo Language*, Theory and Practice in Language Studies, 2013, pp. 312

৩ Peirong Fu, *Philosophy and Human Life*, Beijing, Renmin University of China Press, 2006

৪ A. Judith Knapp, L. Mark & Hall, *Nonverbal Communication in Human Interaction*, Boston: Wadsworth, 2010

৫ পূর্বোক্ত, A. Judith Knapp, L. Mark & Hall, 2010

৬ Nada Qanbar, *A Sociolinguistic Study of the Linguistic Taboo in the Yemeni Society*, MJAL3: Summer, 2011

৭ Helen Goodluck, *Language Acquisition: A Linguistic Introduction*, London: Blackwell, 1991

৮ পূর্বোক্ত, মুহাম্মদ আবদুল হাই, ১৯৫৯

৯ A. Dickinson, *Actions and Habits: the Development of Behavioural Autonomy,* Philos, Trans, R. Soc, *B Biol, Sci.,* Vol. 308, 1985, pp. 67-78

১০ J. Holmes, *An Introduction to Sociolinguistics*, Longman: London and New York, 1992

১১ S. Epstein, *Demystifying Intuition: What it is, what it does, and how it does it,* Psychological Inquiry, Vol. 21, 2010, pp. 295-312

১২ Lola Yulchiboeva Kalandarovna, Origin and concept of taboo vocabulary, *Innovative Technologica: Methodical Research Journal,* Vol. 3, No. 10, 2022, pp. 184-19033

১৩ পূর্বোক্ত, Helen Goodluck, 1991

১৪ পূর্বোক্ত, Nada Qanbar, 2011

১৫ Farzad Sharifian, *Cultural linguistics and intercultural communication*, In: Language and Intercultural Communication in the New Era, Ed. by F. Sharifian, M. Jamarani, New York, Routledge, 2013, pp. 60-79.

১৬ S. E. Taylor, Adjustment to threatening events: A theory of cognitive adoptation, American Psychologist, Vol. 38, 1983, pp. 1161-1173

১৭ D. H. Schunk, Social cognitive theory, APA educational psychology handbook, Vol. 1, Theories, constructs, and critical issues, American Psychological Association, USA, 2012, pp. 101–123,

১৮ Sekhar Shandra Rao, Cognitive Linguistics: An Approach to the Study of Language and Thought, *Journal for Research Scholars and Professionals of English Language Teaching,* Vol. 5, No. 24, 2021

১৯ Javier Bernacer and Jose Ignasio Murillo, The Aristotelian conception of habit and its contribution to human neuroscience, Frontiers in Human Neuroscience, Vol. 8, No. 883, 2014

২০ Vyvyan Evans and Melanie Green, *Cognitive Linguistics an introduction*, Edinbrugh University Press, 2006

২১ Svenja Caspers *et al*., Moral concepts set decision strategies to abstract values, PLoS ONE, Vol. 6, No. 4, e18451, 2011

২২ Friedrich Ungerer and Hans-Jorg Schmid, *An introduction to cognitive linguistics*, Addison Wesley Longman Limited, UK, 1996

২৩ নাদিয়া নন্দিতা ইসলাম, সমাজভাষিক সংজ্ঞাপনে সন্তোষ–শর্ত পূরণের ভূমিকা বিশ্লেষণ: প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান পত্রিকা*, খণ্ড ১৩, সংখ্যা ২৫-২৬ (যুক্ত), ২০২১

২৪ Luiz Pessoa, *The cognitive-emotional brain*, Cambridge, MA: MIT Press, 2013

২৫ Carol Seger and Brain Spiering, A critical review of habit learning and the basal ganglia, *Front in System Neuroscience*, Vol. 5, No. 66, 2011

২৬ Albert, Bandura, Human agency in social cognitive theory, *American Psychologist*, Vol. 44, No. 9, 1989, pp. 1175-1184

২৭ Albert, Bandura, Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change, *Psychological Review,* Vol. 84, No. 2, 1977, pp. 191-215

২৮ পূর্বোক্ত, Helen Goodluck, 1991

২৯ পূর্বোক্ত, Svenja Caspers *et al.,* 2011

৩০ পূর্বোক্ত, Vyvyan Evans and Melanie Green, *Cognitive Linguistics an introduction*, Edinbrugh University press, 2006

৩১ পূর্বোক্ত, Friedrich Ungerer and Hans-Jorg Schmid, *An introduction to cognitive linguistics*, Addison Wesley Longman Limited, UK, 1996

৩২ পূর্বোক্ত, Nada Qanbar, 2011

৩৩ Victor Benno Meyer Rochow, Food taboos: their origins and purposes, *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine,* Vol. 5, No. 1, 2009

৩৪ পূর্বোক্ত, Carol Seger and Brain Spiering, Front in System Neuroscience, Vol. 5, No. 66, 2011

৩৫ সৌরভ সিকদার ও সালমা নাসরীন, *বাংলা ভাষায় নারী শব্দাভিধান, গবেষণা ও সংকলন*, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৯

৩৬ হাকিম আরিফ, *বাংলা অবাচনিক যোগাযোগ*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা, ২০১৫

৩৭ Sachiko Ide, *Japanese Sociolinguistics Politeness and Women's Language*, Lingua 57, North Holand Publishing Company, 1982, pp. 357-385

৩৮ পূর্বোক্ত, Victor Benno Meyer Rochow, 2009

৩৯ পূর্বোক্ত, Chunming Gao, 2013

৪০ Laura P. Otis and James E. Alcock, Factors affecting extraordinary belief, *The Journal of Social Psychology,* 1982, Vol. 118, pp. 77-85

৪১ সৌরভ সিকদার, *বাংলাদেশের সংস্কৃতির বিবর্তন*, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৯

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বিয়াল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩১/ডিসেম্বর ২০২৪

রবীন্দ্রনাথের 'ঠাকুরদা' ও বাউলদর্শন

মাহফুজা হিলালী*

সারসংক্ষেপ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) অনেক লেখায় বাউলদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় কয়েকটি নাটকের ঠাকুরদা বা দাদাঠাকুর চরিত্রে। রবীন্দ্রনাথ রূপসাগরে ডুব দিয়ে অরূপরতনের সন্ধান করেছিলেন। ঠাকুরদার জীবনবোধ তাঁর অরূপরতন প্রাপ্তির পথ। রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা একজন নয়– অনেকজন। এরা প্রত্যেকই আলাদা। কিন্তু একটি জায়গায় এক, তা হলো সকলেই সংসারবিবাগী এবং বিশ্বসংসারের অপরিহার্য অংশ। এরা সংসার বিবাগী হয়ে সংসারের দায় কাঁধে তুলে নিয়েছেন। যদিও বাউলদের পথ এবং রবীন্দ্রনাথের পথ এক নয়, কিন্তু উভয়ের লক্ষ্য এক। বাউলরা যে মনের মানুষের সন্ধান করেন, ঠাকুরদা সেই মনের মানুষের সেবা করেন। ঠাকুরদা বৈরাগী এবং তাঁর ভেতরে মানবধর্ম ও ইহজাগতিকতা স্পষ্ট। তবে ঠাকুরদার জীবনাচরণে বাউলদের দেহতত্ত্ব পাওয়া যায় না। তাই বাউলদর্শনের সাথে ঠাকুরদা চরিত্রের কিছু অমিল রয়েছে। এ প্রবন্ধে বাউলতত্ত্বের সাথে ঠাকুরদার তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া আরও দেখানো হয়েছে বাউলতত্ত্ব কী, লালনের কোন প্রভাব রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রকট। বাউলতত্ত্বের সাথে রবীন্দ্রনাথের বাউলমনের মিল এবং অমিল কোথায়। রবীন্দ্রনাথ কতো রকমের বাউলের কথা বলেছিলেন; রবীন্দ্রনাথ কেন ঠাকুরদা চরিত্র নির্মাণ করেছিলেন; এই চরিত্রটি কেন বাউলচরিত্র হয়ে উঠলো; সমাজব্যাবস্থায় ঠাকুরদা কী প্রভাব ফেললেন ইত্যাদি। সর্বোপরি, বাউলদর্শন মানবজীবনে কী প্রভাব ফেলে বা ফেলতে পারে তা-ও দেখানো হয়েছে প্রবন্ধে।

চাবি শব্দ: রবীন্দ্রনাথ, বাউলদর্শন, ঠাকুরদা, মানবধর্ম।

একুশ বছর বয়সে 'সাধরে আজিকে প্রাণের সাধন' অনুভবের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)-এর প্রাণের সাধনা শুরু হয়েছিলো এবং সমস্ত জীবন ধরে চলেছিল তার প্রবাহ। তাঁর প্রাণের সাধনা আনন্দের সাধনা। মনের চাওয়া-পাওয়াই এখানে মূল কথা। মনের চাওয়া-পাওয়াকে প্রাধান্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক ছড়া, কবিতা, গান লিখেছিলেন। আবার চরিত্রও চিত্রায়ণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে ঠাকুরদা প্রধান। ঠাকুরদা কখনো কখনো দাদাঠাকুর নামেও প্রকাশিত হয়েছে। ঠাকুরদার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো– তাঁর বৈষয়িক বিষয়ে কোনো আগ্রহ নেই, আপন মনে আনন্দের সন্ধান করেন তিনি। অর্থাৎ, আচারধর্মের প্রতি এঁদের কোনো আকর্ষণ নেই, হৃদয়ধর্মে এঁদের পথ চলা। তাই এঁরা জাত-পাতের ধার ধারেন না–মানুষই মুখ্য। এদের ঘরের উল্লেখ নেই, পথের উল্লেখ আছে। এরা মানুষের কল্যাণকামী। ঠাকুরদা চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলো বাউলদের বৈশিষ্ট্য। তবে বাউলদের সব বৈশিষ্ট্যই ঠাকুরদাদের মধ্যে নেই। আবার ঠাকুরদাদের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা বাউল দর্শনে নেই। তাই ঠাকুরদা চরিত্র গবেষণার দাবি রাখে।

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

প্রশ্ন হলো ঠাকুরদাকে কি বাউল বলা যায়? কোন অর্থে তিনি বাউল। রবীন্দ্রনাথ কি নতুন বাউল-সত্তার সন্ধান করেছেন? ঠাকুরদা কি রবি বাউল? ঠাকুরদা-সত্তার মধ্য দিয়ে রবি বাউলের স্বরূপ কতোটা উন্মোচিত হয়েছে; বাউল দর্শন বা লালনের দর্শনের সাথে রবি বাউলের পার্থক্য কোথায়। কিংবা রবীন্দ্রনাথ কি বাউল-দর্শনকে সংস্কার করে ভিন্ন এক বাউল দর্শনের কথা বলেছিলেন? বক্ষ্যমাণ গবেষণায় এসব প্রশ্নের সমাধান খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ রূপসাগরে ডুব দিয়ে অরূপরতনের সন্ধান করেছিলেন। ঠাকুরদার জীবনবোধ তাঁর অরূপরতন প্রাপ্তির পথ। রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা একজন নয়–অনেকজন। *শারদোৎসব*, *রাজা*, *ডাকঘর*, *অচলায়তন*, *গুরু*, *অরূপরতন* প্রভৃতি নাটকে সাতজন ঠাকুরদাকে পাওয়া যায়। কিন্তু একটি জায়গায় এক, তা হলো এঁরা সকলেই সংসারবিবাগী এবং মানবপ্রেমী। এদের বেশিরভাগেরই সংসারের কোনো পরিচয় নেই। কখন কোথা থেকে আসেন তাও বলা নেই। কিন্তু তাঁরা বিশ্বসংসারের অপরিহার্য অংশ। তাঁরা সংসার বিবাগী হয়ে সংসারের দায় কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এ বৈশিষ্ট্যও বাউলদের বৈশিষ্ট্য। এছাড়া *প্রায়শ্চিত্ত*, *মুক্তধারা* নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগী এবং *বসন্ত* নাটকে 'কবি'কে পাওয়া যায়। এঁরাও বাউলদর্শনে বিশ্বাসী। আবার সন্ন্যাসী (রাজা বিক্রমাদিত্য), উপনন্দ, সুরঙ্গমা, পঞ্চকরাও এক ধরনের বাউল চরিত্র। এঁরা সকলেই প্রাণের সাধনা করেন। এঁদের কেউ মনের মানুষকে পেয়েছেন, কেউ খুঁজছেন। রবীন্দ্রনাথ বাউল কবিতায় লিখেছিলেন:

আর কিছু না চাই,
যেন আকাশখানা পাই,
আর পালিয়ে যাবার মাঠ।[১]

এ লাইনগুলোর মধ্য দিয়ে বোঝা যায় ঘরের দরকার নেই। আকাশ আর মাঠ হলেই বাউলদের চলে। রবীন্দ্রনাথেরও তাই। *ছিন্নপত্রাবলী*-র ১৫৪ সংখ্যক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'সন্ন্যাসীরা যে রকম করে বেড়িয়ে বেড়ায় তেমনি করে ভ্রমণ করা যদি আমার পক্ষে সহজ হত তা হলে এই অবারিত পৃথিবীর হাতে আপনাকে সমর্পণ করে দিয়ে একবার দেশে দেশান্তরে ঘুরে আসতুম।'[২] এতে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের মনে একজন বাউল বাস করতেন। পূর্ববঙ্গে এসে তিনি বাউলদের গান বেশি করে শুনেছিলেন এবং বাউলদর্শন অনুভব করেছিলেন।

বাংলাদেশে বহু লোকসংস্কৃতি বা লোকদর্শনের মধ্যে অন্যতম হলো বাউল দর্শন। বাউলরা কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম মানেন না। তারা মনে করেন মানুষের ভেতরেই ঈশ্বর বাস করেন। ঈশ্বরকে এঁরা বলেন মনের মানুষ। মনের মানুষকে পাওয়ার জন্যই এঁদের সাধনা। আশুতোষ ভট্টাচার্য বাউলদের সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'আধ্যাত্মিক সাধনার বিশিষ্ট একটি প্রণালীর নামই বাউল, যাহারা এই প্রণালীর সাধক তাহাদিগকে বাউল বলে। ইহা একটি আধ্যাত্মিক অনুভূতি, বিশিষ্ট প্রণালীর সাধকদিগের নিকটই এই অনুভূতির উপলব্ধি হয়–ইহা ভগবানের সঙ্গে মানবের একটি অবিচ্ছেদ্য ও সুনিবিড় সম্পর্ক বোধের অনুভূতি; ভগবানই স্বামী (সাঁই) বা একমাত্র প্রভু; তাহার সঙ্গে বাউল অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যস্থতা ব্যতীতই সুনিবিড় মিলনের আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে।'[৩] তবে, 'বাউল গানে ধর্মের চেয়ে জীবন প্রাধান্য পেয়েছে।'[৪] তাছাড়া, 'বাউলদের কোনো ধর্মগ্রন্থ অথবা শাস্ত্র নেই।

আনুষ্ঠানিক ধর্মও নেই। কিন্তু তাঁরা ভক্তিবাদী এবং একজন গুরুতে বিশ্বাসী।'[৫] বাউলদের ধর্মগ্রন্থ এবং আনুষ্ঠানিক ধর্ম না থাকলেও বাউলরা পরিষ্কার দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। গোলাম মুরশিদ লিখেছেন:

> এক দলের ধর্ম ইসলামী ঐতিহ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেই সঙ্গে মিশেছে সুফীবাদী দর্শন ও দেহতত্ত্বের রীতিনীতি ও নিয়ম-কানুন। বাউলদের অন্য দলের ধর্মের ভিত্তি বৈষ্ণবধর্ম, প্রধানত নিম্নবর্ণের বৈষ্ণবধর্ম। চৈতন্যদেব জাতিভেদ প্রথা অগ্রাহ্য করে তাঁর শিষ্যদের সামাজিক ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। এর ফলে সমাজের নীচের তলার বহু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দীক্ষা নিয়েছিলো বৈষ্ণবধর্মে। কিন্তু চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর তাঁর ছয় গোস্বামীর নেতৃত্বে বৈষ্ণব ধর্মে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। গোস্বামীরা সংস্কৃতায়নের পথ ধরে প্রায় নিঃশব্দে বৈষ্ণবধর্মে পুরোনো জাতিভেদের দেয়ালগুলো পুনর্নির্মাণ করেন। নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণবরা তখন বোষ্টম-বোষ্টমী নামের আড়ালে মূলধারা বৈষ্ণবধর্ম থেকে ধীরে ধীরে সরে গেলো। ... কেউ কেউ বাউলদের দলে ভিড়লো। এই বিশেষ শ্রেণীর বাউলরা রাধাকৃষ্ণের ভজনা করে, সেই সঙ্গে দেহতত্ত্বের নামে যৌনতার সাধনা করে। সুতরাং মোটা কথায় বললে একদল বাউল হলো দলছুট 'মুসলমান', যারা নিজেদের বলে 'ফকির'। আর-এক শ্রেণীর বাউল আসলে দলছুট 'বৈষ্ণব', যারা নিজেদের বাউল বলে চিহ্নিত করে।[৬]

তবে এই দুদলের কেউ-ই আনুষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাস করে না, মানবধর্মে বিশ্বাস করে।

বাউলদের গুরু হলেন লালন শাহ। 'লালন ফকির নিজেকে 'ফকির' বলে আখ্যায়িত করেছেন তাঁর গানে। তাঁর সাধনা গুপ্ত এবং দেহভিত্তিক হলেও মনের মানুষের অন্বেষণ ছিল তাঁর সাধনার ভিত্তি। তাঁর গানে আল্লাহ, নবী, বেহেস্ত, দোজখ গুরুত্ব পেলেও তিনি কোনো মূলধর্মের অনুসারী ছিলেন না। তাঁর সাধনা গুরুবাদী এবং কেবল দীক্ষিতজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।'[৭] মানুষ ভজনই বাউল দর্শনের মূল কথা; লালনেরও। লালন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন আত্মাকে। তাঁর মতে, আত্মাকে জানলেই সৃষ্টিকর্তাকে জানা যায়। 'মানুষের মধ্যেই সৃষ্টিকর্তা' এটাই লালন দর্শনের অন্যতম প্রধান মতবাদ। তাই ধর্ম তাঁর কাছে গৌণ–মানুষই সমস্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভেতরে একজন বাউলসত্তা বাস করতো। এ কারণে রাঙা মাটির পথ বার বার তাঁর মন ভুলিয়েছে। এ কারণেই তাঁর গানের ওপারে প্রেমপ্রতিমা দাঁড়িয়ে থেকেছে এবং এ কারণেই তিনি বলতে পেরেছেন, 'তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে আমি ডুবতে রাজি আছি।' রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে বাউলসত্তা প্রকট, তার প্রমাণ পাওয়া যায় আশুতোষ ভট্টাচার্যের আরেকটি মন্তব্যে। তিনি লিখেছিলেন, 'ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বাউলদর্শনকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। যখন তিনি নিখিল ভারত মহাসম্মেলনের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার অভিভাষণে বাউলসংগীত উদ্ধৃত করিয়া তাহার দার্শনিক মূল্যের যে ভাব বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, তাহাদের ষড়দর্শনের মধ্যে আর কোনো দর্শনকে সেইভাবে বিচার করিয়া দেখেন নাই। তাঁহার সেই অভিভাষণের অভিনবত্ব সেদিন সকলকেই অভিভূত করিয়াছিল।'[৮] আগেই উল্লেখ করা হয়ছে যে, শুধু গান-কবিতা নয়, নাটকের চরিত্রতেও তিনি বিভিন্ন বাউলসত্তা চিত্রায়ণ করেছিলেন। এমনকি *গোরা* উপন্যাসে আছে– রাস্তায় বাউল গান গাইছে। নাটকে তিনি বাউলসত্তা এনেছেন মনের পরিপূর্ণ

আবেগ মন্থন করে। এবং তা এক রকম করে নয়, বিভিন্নভাবে। এই বিভিন্ন রকমের মধ্যে ঠাকুরদা বা দাদাঠাকুর চরিত্রটি বাউলসত্তায় অঙ্কিত। তবে ঠাকুরদা বাউল-বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি ধারণ করেন না।

শারদোৎসব নাটকে একজন ঠাকুরদা আছেন। তিনি শরতের ছুটিতে বালক দলকে নিয়ে গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন। বেতসিনীর তীরে বনের ভেতরে তাদের শরতের উৎসব হয়। ঠাকুরদা বালকদের বলেছেন, 'না ভাই, আমি ভাগাভাগির খেলায় নেই; ... আমি সকল দলের মাঝখানে থাকবো, কাউকে বাদ দিতে পারবো না।'[৯] এখানে ভেদাভেদ বা দলাদলি দূর করার কথা বলা হয়েছে। *অচলায়তন*-এর দাদাঠাকুর সম্পর্কে প্রথম শোণপাংশু বলেছে, 'আমাদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে আবার দল কিসের। উনি সব দলের শতদল পদ্ম।'[১০] এখানে বাউলদের অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ফুটে উঠেছে। লালনের 'সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে, লালন বলে জাতের কী রূপ দেখলাম না এ নজরে।'– এর সাথে এই অংশের তুলনা করা চলে। শোণপাংশুরা গানের মধ্যে দাদাঠাকুরকে 'মনের মানুষ' বলেছে। বাউলরা যে মনের মানুষের সন্ধান করেন দাদাঠাকুরকে সেই মনের মানুষ বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। বাউলরা মনে করেন মানুষের মনের মধ্যেই মনের মানুষের বাস। এই মনের মানুষ গুরু বা ঈশ্বর। দাদাঠাকুর তাই ঈশ্বরকে অবমাননা করতে পারেন না। অর্থাৎ কোনো মানুষকে তিনি অবমাননা করেন না। আবার 'গুরুও পরম্পরা।'[১১] তাই লালন যেমন বাউল বা ফকির, তিনি তেমনি গুরুও। আবার লালনের গুরু সিরাজ সাঁই। তিনিও বাউল বা ফকির ছিলেন। সুতরাং তাঁরা একদিকে মানুষ, অন্যদিকে তাঁদের মধ্যেই মনের মানুষের বাস। এটাই বিশ্বাস করেন বাউলরা। তাই দাদাঠাকুর একদিকে যেমন বাউল, অন্যদিকে শোণপাংশুদের মনের মানুষ। তবে রবীন্দ্রনাথ দাদাঠাকুরকে আরও অনেকগুলো বিশেষণে বিশেষায়িত করেছেন, সেগুলো হলো– 'একলা মোদের হাজার মানুষ', 'মজার মানুষ', নানা কাজে, নানা সাজে 'খেলার মানুষ', 'সব মিলনে মেলার মানুষ', হাসির দলে, চোখের জলে 'সকল ক্ষণের মানুষ', ঘরে ঘরে বাহির করে 'আমাদের কোণের মানুষ'।–এর পরই বলা হয়েছে 'আমাদের মনের মানুষ'। এই বিশেষণগুলো রবীন্দ্র-মানসেরও প্রতিচ্ছবি। রবীন্দ্রনাথ সত্য শিব সুন্দরের কবি। তিনি বলেছিলেন, 'জগতের আনন্দলোকে আমার নিমন্ত্রণ।' অর্থাৎ জগতের নিমন্ত্রণেই তিনি জগতে পদার্পণ করেছেন। হেসেখেলে জীবন পার করতেই তিনি আগ্রহী। এখানেই তাঁর বাউল মন–বাউলসত্তা; এখানেই তিনি রবি বাউল। তাই বলা যায়, 'চরিত্রটি (দাদাঠাকুর) রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শের বেশ খানিকটা ধারণ করে।'[১২] রবীন্দ্রনাথ মানুষের জীবযাপনকে যেভাবে দেখতে চেয়েছেন দাদাঠাকুর চরিত্রের চিত্রায়ণ সেভাবেই করেছেন। যেন ঠাকুরদা একবার পঞ্চককে বলে, 'যেদিন তোমার আপনার মধ্যে হুকুম উঠবে সেইদিন আমি হুকুম করব।'[১৩] এখানে বোঝা যায় হৃদয়ের ডাককেই রবীন্দ্রনাথ প্রধান বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আরোপিত কোনো হুকুম বা আদেশ চাপিয়ে দিতে চাননি। সে হুকুম যদি বাউল মনের হুকুম হয়, তাও নয়। অর্থাৎ 'প্রাণের সাধনা'ই মূল কথা। দাদাঠাকুর জাতপাতের ধার ধারেন না। তাই শোণপাংশু আর দর্ভকদের ছোঁয়া খাদ্য খান তিনি। এরাই তার খেলার সাথি, গান গাওয়ার সাথি। যারা জগৎ-সংসারকে জটিল-কঠিন করে তোলে, তাদের পাপের ঘড়া পূর্ণ হলে দাদাঠাকুর নিজে যান পাপমোচন করতে। সেখানে তার রুদ্রমূর্তি। তখন আর তিনি দেরি করেন না, অনুসারীদের আদেশ দেন। সমস্ত অনাচারকে ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে জগতে আনন্দ প্রবাহিত করাই তখন তার কাজ

হয়ে ওঠে। অচলায়তনে নিয়মের অনাচারে যখন শিশু-বৃদ্ধ সকলেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন, তখন তিনি আয়তনের প্রাচীর আকাশের সাথে মিলিয়ে দিয়ে আনন্দের ধারা বইয়ে দেন। আচার্যকে তিনি বলেছেন,

> ভাবনা নেই আচার্য, ভাবনা নেই–আনন্দের বর্ষা নেমে এসেছে–তার ঝর ঝর শব্দে মন নৃত্য করছে আমার। বাইরে বেরিয়ে এলেই দেখতে পাবে চারিদিক ভেসে যাচ্ছে। ঘরে বসে ভয়ে কাঁপছে তারা। এ ঘনঘোর বর্ষার কালো মেঘে আনন্দ, তীক্ষ্ণ বিদ্যুতে আনন্দ, বজ্রের গর্জনে আনন্দ। আজ মাথার উষ্ণীষ যদি উড়ে যায় তো উড়ে যাক, গায়ের উত্তরীয় যদি ভিজে যায় তো ভিজে যাক–আজ দুর্যোগ একে বলে কে! আজ ঘরের ভিত যদি ভেঙে গিয়ে থাকে যাক-না–আজ একেবারে বড়ো রাস্তার মাঝখানে হবে মিলন।[১৪]

উন্মুক্ত স্থানে সকলের সাথে মিলনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন দাদাঠাকুর। দাদাঠাকুরের বাড়ি কোথায় তা রবীন্দ্রনাথ বলেননি। পথেই সকলের সাথে তার দেখা হয়। কিন্তু তিনি গুরু। রবীন্দ্রনাথ গুরুর সাথে সকলের মিলন ঘটিয়েছেন। বাউলদর্শনে গুরুই ঈশ্বর। 'বাউলরা গুরুবাদী। গুরুকে এরা ঈশ্বর বা আল্লাহর অবতার বলে জানে।'[১৫] দাদাঠাকুরের সাথে আচার্যকে মিলিয়ে দিতে চান পঞ্চক। ঠাকুরদার সাথে মিলেছেন পঞ্চক, আচার্য, উপাধ্যায়সহ অচলায়তনের অনেকেই। কিন্তু মহাপঞ্চক মিলতে পারেনি। কারণ সে আচারধর্ম পালন করে। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যারা আচারধর্ম পালন করে, তারা প্রাণের ধর্মে মিলতে পারে না। বাউল দর্শনের সাথে এখানে তার মিল। *শারদোৎসবের* ঠাকুরদা বালকদের সাথে নিয়ে গেয়ে ওঠেন, 'আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি/ কাটবে সকল বেলা।'[১৬] বিনা কাজে বাঁশি বাজানো হৃদয়ধর্মের আরাধনা করা। রবীন্দ্রনাথের নিজের 'আসমানদারি'র মতো। ঠাকুরদা সন্ন্যাসীর মনের ভাব বুঝে তাই বলতে পারেন, 'বিদ্যের বোঝা সমস্ত ঝেড়ে ফেলে দিব্যি একেবারে হালকা হয়ে সমুদ্র পাড়ি দেবেন!'[১৭] এর অর্থ আত্মার তৃপ্তিতে জীবন চলা। বাউলরা মনের মানুষকে খুঁজে চলেন প্রতিনিয়ত আর রবি বাউল খোঁজেন আত্মার সুখ। ঠাকুরদা তাই গানে গানে বলেন দুখের তরী পাড়ি দিতে গান গেয়ে পালের রশি কষে ধরেন। দুখের তরী পাড়ি দিয়েই মনের মানুষকে পেতে হয়। *রাজা* নাটকে সুদর্শনার রাজাকে সন্ধান করা মনের মানুষকে সন্ধান করা। মনের মানুষের সন্ধানে সুদর্শনা এখানে ওখানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছিলেন, 'ইহার (*রাজা* নাটক) মধ্যেই বাংলার বাউলসাধনার ভাবটির পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল বিচ্ছিন্ন সংগীত ও সংলাপের মধ্য দিয়া নহে, একাধিক চরিত্রের মধ্য দিয়া নহে, একাধিক চরিত্রের মধ্য দিয়া আনুপূর্বিক এই ভাবটিকে প্রকাশ করা হইয়াছে। এমন কি, বাউলের ভাষাতেই ইহাতে রবীন্দ্রনাথ বাউলের সংগীত রচনা করিয়াছেন।'[১৮] সুদর্শনা এবং রাজা সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য আরও লিখেছিলেন,

> বাংলার বাউল সাধনায় এই কথাই বলা হইয়াছে যে আমার প্রভু আমার মনের ভিতর থাকিয়া আমার নিভৃত অবসরে আমার সঙ্গে কথা বলেন, কিন্তু তাহাকে আমরা চোখে দেখিতে পারি না। বাউলসাধকগণ তাহাকে অধর বা অধরা অর্থাৎ যাহাকে ধরিতে পারা যায় না, তিনি ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে, এ কথাই বলিতে চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকের 'রাজা' চরিত্রও তাহাই। সুদর্শনার মনের ভিতর থাকিয়া তাঁহার সঙ্গে তিনি কথা বলেন, কিন্তু সুদর্শনা যখন তাহাকে বাহিরে বিশেষ কোনো রূপের

> ভিতরে দেখিতে চাহেন, তখন তিনি তাহা পারেন না। ... সুদর্শনার মনের মধ্যেই তাহার মনের মানুষ ছিল, কিন্তু সুদর্শনা তাহাকে মনের মধ্যে তাহার সন্ধান না করিয়া তাঁহাকে বাহিরে খুঁজিতে গিয়াছিলেন।[১৯]

এ তো গেলো সুদর্শনার কথা। এ নাটকে ঠাকুরদাও উপস্থিত। *রাজা* নাটকে ঠাকুরদা মনের মানুষের সন্ধান পেয়ে গেছেন আগেই। তাই তাকে আমরা গুরু হিসেবেও চিহ্নিত করতে পারি। তিনি সাধারণ লোকদের বলেন যে, 'আমাদের রাজা এক জায়গায় দেখা দেয় না বলেই তো সমস্ত রাজ্যটা একেবারে রাজায় ঠাসা হয়ে রয়েছে– তাকে বল ফাঁকা! সে যে আমাদের সবাইকেই রাজা করে দিয়েছে!'[২০] বাউলদর্শন এ কথাই বলে যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ঈশ্বর বাস করেন। সুতরাং সকলকে রাজা করে দেওয়া মানে সকলের মনের ঈশ্বরের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। ঠাকুরদা গান গেয়ে ওঠেন– 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে,'[২১]–এই রাজ্যের রাজাকে দেখা যায় না, কিন্তু রাজ্য চলে নির্বিঘ্নে। এটা কী করে সম্ভব! সম্ভব হয় এ জন্য যে, রাজ্যের সবাই রাজা।

এরপর ঠাকুরদা বিভিন্নভাবে রাজার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন রাজার ধ্বজায় পদ্মফুলের মাঝখানে বজ্র আঁকা। আবার একজন রাজা সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে জেনে তিনি কুম্ভকে বলেন, 'আমাদের রাজা যদি-বা দেখা দিত তোদের চোখেই পড়ত না। দশের সঙ্গে তাকে আলাদা বলে চেনাই যায় না– সে সকলের সঙ্গেই মিশে যায় যে।'[২২] এভাবে ঠাকুরদা নানাভাবে সবার সামনে মনের মানুষের কথা বলেছেন। কিন্তু এই গূঢ় তত্ত্ব সাধারণের বোঝার অসাধ্য। কেউ তার সন্তান মারা গেছে বলে 'রাজা নেই' বলছেন, অন্যদিকে ঠাকুরদার পাঁচ ছেলে মারা যাওয়ার পরও 'রাজা আছেন' বলছেন। এই 'রাজা' তার মনের মধ্যে স্থাপিত। *রাজা* নাটকে সরাসরি বাউলেরও উপস্থিতি রয়েছে। তারা গান গেয়ে রাজার পরিচয় দিয়েছেন:

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,
তাই হেরি তায় সকল খানে।[২৩]

অর্থাৎ মনের মধ্যে যে ঈশ্বর রয়েছেন, তাকে বাইরে খুঁজতে যাওয়া যায় না। অন্তরের গহনে ডুব দিতে হয়। তাঁকে পেলেই মুক্তি ঘটে। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন আত্মার মুক্তি।

রাজা নাটকের 'রাজা' বাউলের মনের মানুষ, প্রাণের মানুষ, গুরু বা ঈশ্বর-এর সমরূপ। ঠাকুরদা নিজেকে তাঁর বন্ধুও বলেছেন। রাজার পুরস্কার দেওয়া সম্পর্কে বলেছেন, 'বন্ধুকে কি কেউ কোনোদিন পুরস্কার দেয়।'[২৪] এতে বোঝা যায় পুরস্কারের আশায় তিনি রাজার কাজ করেন না; ভালোবেসে করেন।

ঠাকুরদা রাজা সম্পর্কে গানে গানে বলেছেন:

আমার সকল নিয়ে বসে আছি
সর্বনাশের আশায়।
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি
পথে যে জন ভাসায়।

যে জন দেয় না দেখা, যায় যে দেখে,
ভালোবাসে আড়াল থেকে,
আমার মন মজেছে সেই গভীরের
গোপন ভালোবাসায়।।[২৫]

এ গানের বিশ্লেষণ মানব জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যিনি দেখেন কিন্তু দেখা দেন না অথচ, আড়াল থেকে ভালোবাসেন, তিনিই তো বাউলের মনের মানুষ আর সাধারণের ঈশ্বর। তাঁরই ভালোবাসায় ঠাকুরদার মন মজে আছে।

শুধু সাধারণের কাছেই নয়, রানি সুদর্শনার কাছেও রাজাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন ঠাকুরদা; বলেছেন, 'সুখে দুঃখে তাকে চিনে নিয়েছি– এখন আর সে কাঁদাতে পারে না।'[২৬] আবার সুদর্শনাকে চিনতে দেওয়া সম্পর্কে বলেছেন, 'দেবে বৈকি– নইলে এত দুঃখ দিচ্ছে কেন। ভালো করে চিনিয়ে তবে ছাড়বে। সে তো সহজ লোক নয়।'[২৭] কাঞ্চী রাজাকে জানিয়েছেন যে, পথে বের করাই রাজার স্বভাব। কাঞ্চীরাজকেও রাজা পথে বের করেছেন। আবার রানি সুদর্শনাও পথে বেরিয়ে বেঁচে ওঠেন। এরা সকলেই বাউল সাধক। মনের মানুষের খোঁজে এদের পথে বের হওয়া। তাই সুদর্শনার মন বদলে গেছে। বাহ্যিক সমারোহের পরিবর্তে তিনি হৃদয়ের স্নিগ্ধতার কাছে ফিরেছেন। তাই ঠাকুরদা যখন বলেছেন রাজার কোনো বাহ্য-সমারোহ নেই, তখন সুদর্শনা বলেছেন, 'বল কী, সমারোহ নেই? ঐ-যে আকাশ একেবারে রাঙা, ফুলগন্ধের অভ্যর্থনায় বাতাস একেবারে পরিপূর্ণ।'[২৮] আর ঠাকুরদা গুরু হিসেবে শিষ্য সুদর্শনা আর কাঞ্চীর উদ্দেশে বলেছেন, 'এখন আমাদের বসন্ত উৎসবের শেষ খেলাটাই চলুক– ফুলের রেণু এখন থাক, দক্ষিণে হাওয়ায় এবার ধুলো উড়িয়ে দিক। সকলে মিলে আজ ধূসর হয়ে প্রভুর কাছে যাব। গিয়ে দেখব তার গায়েও ধুলো মাখা। তাকে বুঝি কেউ ছাড়ে মনে করেছ? যে পায়, তার গায়ে মুঠো মুঠো ধুলো দেয় যে! সে ধুলো সে ঝেড়েও ফেলে না।'[২৯]

*রাজা*র ঠাকুরদা গৃহী। নাটকে ঠাকরুনদিদির কথা এসেছে। আবার তার পাঁচ ছেলে মারা যাওয়ার কথাও উল্লেখ আছে। গৃহী হওয়ায় ঠাকুরদার বাউল-আচরণের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। কারণ বাউল সম্প্রদায় দু রকম: পথের বাউল বা বৈরাগী বাউল আর গৃহী বাউল। বৈরাগী বাউলরা ভিক্ষাজীবী আর গৃহী বাউলরা সাধারণ গৃহকর্মের মাধ্যমে জীবনধারণ করে এবং গৃহে থেকেই সাধন-ভজন করে। *রাজা* নাটকের ঠাকুরদা দ্বিতীয় ধরনের। কিন্তু *শারদাৎসব*এর দাদাঠাকুর পথের বাউল। *অচলায়তন*-এর ঠাকুরদারও ঘরের উল্লেখ নেই।

ডাকঘর-এর ঠাকুরদা সম্পর্কে প্রথমেই বলা হয়েছে 'ছেলে খেপাবার সর্দার'। এবং 'ছেলেগুলোকে ঘরের বার করাই' তার বুড়ো বয়সের খেলা। নিজের সম্পর্কে মাধব দত্তের কাছে এই বিশেষণগুলো শুনে, তিনি আর মাধব দত্তের পোষ্যপুত্র অমলের সাথে দেখা করতে যান না। বরং নিজের কাজকর্ম সেরে পরে এসে ভাব করতে চান। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার অন্য মতলব থাকে। অমলকে ঘরে আটকে রাখতে তিনি ফকির সেজে অমলের সাথে ভাব করেন। অমলকে যতো রাজ্যের গল্প বলে একটু আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করেন। মাধব দত্ত ঠাকুরদাকে বলেছেন, 'তুমি যে কী নও তা তো ভেবে

পাই নে।'[৩০] একটি মৃত্যুপথযাত্রী বালককে মানসিক শান্তি দেন ঠাকুরদা। মৃত্যু অবধারিত জেনে অমলকে স্বপ্ন রাজ্যে পৌঁছে দেন তিনি। অন্তত অসুস্থতার কষ্ট যেন তার লাঘব হয়। এখানে মানবধর্ম মূর্ত হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে, *গুরু* নাটক *শারদোৎসব* এর সংক্ষিপ্ত রূপ। যুনক এবং দর্ভকদল গুরুকে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে গান গেয়ে–

প্রভাতসূর্য, এসেছে রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে
মৃত্যুর হোক লয়।
তোমারই হউক জয়।[৩১]

আবার, *মুক্তধারা* নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগী প্রবেশ করেন গান গাইতে গাইতে–

আমি মারের সাগর পাড়ি দেব বিষম ঝড়ের বায়ে
আমার ভয়-ভাঙা এই নায়ে।[৩২]

প্রায়শ্চিত্ত-এর ধনঞ্জয়ের সাথে এই ধনঞ্জয়ের প্রায় পুরোটাই মিল। এখানেও তিনি রাজার সাথে সত্য বলতে ভয় পান না। কারণ তিনি মনের মানুষকে পেয়েছেন। তাই রাজাকে অবলীলায় বলেন, 'আমার উদবৃত্ত অন্ন তোমার, ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়।'[৩৩] যদিও তিনি পথের মানুষ, তাকে খাজনা দিতে হয় না তবু দরিদ্র মানুষগুলোকে তিনি বাঁচাতে চান। তাই রাজার কাছে গিয়ে তিনি নিজে কথা বলেন। আবার অনন্তযাত্রাকে মুক্তি বলে নির্দেশ করেন। যুবরাজ মানুষের জন্য আত্মাহুতি দিলে তিনি মনে করেন যুবরাজের মুক্তি ঘটেছে।

বসন্ত নাটকের কবিও ঠাকুরদার অন্য সংস্করণ। তার মধ্যেও এক ধরনের বাউলসত্তা রয়েছে। তাই তিনি অর্থসচিবকে দিয়ে পর্যন্ত নাচ করিয়ে নেন। বলেন, 'ওঁর-যে থলি শূন্য হয়ে গেছে, তাই নাচে টেনেছে। বোঝা ভারী থাকলে গৌরবে নড়তে পারতেন না। আজ আমাদের অগৌরবের উৎসব।'[৩৪] বৈষয়িক বিষয়গুলো বাদ দিলে হৃদয়বৃত্তিগুলো বেরিয়ে আসে। বাউলরা সব সময়ই বিষয়সম্পত্তির প্রতি উদাসীন হন। বৈরাগ্যেই তাঁদের সাধনা। বোঝা যাচ্ছে, কবিও বাউলদের দলে। তিনি তাই অগৌরবের উৎসব দেখে খুশি হয়ে ওঠেন। এবং সগৌরবে ঘোষণা করেন, রাজগৌরব টিকলো না– 'তাই তো ঋতুরাজ আজ রাজবেশ খসিয়ে দিয়ে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে চলেছেন। এবার ধরণীতে তপস্যার দিন এসেছে, অর্থসচিবদের হাতে কাজ থাকবে না।'[৩৫]

শারদোৎসব-এর সন্ন্যাসী (রাজা বিজয়াদিত্য) বাউলদর্শনের ধ্বজাধারী। তাই প্রাণের সাধনায় রাজকাজ ফেলে সন্ন্যাসী সেজে তিনি শরতের উৎসব দেখতে বের হন। বালকদের চেলা সাজতে তার ইচ্ছে করে। বালকদের গান শুনতে তার ভালো লাগে। তার দর্শন হলো যে কাজে মানুষ আনন্দ পায়, সেই কাজের মধ্যেই তার উৎসব। তাই উপনন্দ গুরুর ঋণ শোধের জন্য উৎসবের আনন্দ

ছেড়ে পুঁথি নকল করছে দেখে তিনি বলেন, 'আজ এই বালকের ঋণশোধের মতো এমন শুভ্র ফুলটি কি কোথাও ফুটেছে– ... তুমি পঙক্তির পর পঙক্তি লিখছ, আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ। ... দাও বাবা, একটা পুঁথি আমাকে দাও, আমিও লিখি। এমন দিনটা সার্থক হোক।'[৩৬] ঠাকুরদাদা এবং বালকরাও সেই পুঁথি নকল করতে বসে যান। এখানে গোষ্ঠীবদ্ধতার ইঙ্গিত আছে। বাউলরা এককভাবে থাকেন না। এঁরা একটি সম্প্রদায়। তাই ঠাকুরদাকেও দেখতে পাই বালকের দল নিয়ে ঘুরতে। আর পুরো দলকে উপনন্দের কাজে বসিয়ে দেন সন্ন্যাসী। তবে তিনি কাউকেই পুঁথি লেখার কাজে হাত দিতে বলেননি। বরং নিজে লিখতে বসেছেন। আর তাই দেখে ঠাকুরদা এবং বালকগণ লিখতে বসে যান। এখানে সন্ন্যাসীর মধ্যে বাউলদের সাধনা স্পষ্ট। বাউলরা কখনো কাউকে নিজের দলে ভেড়ানোর জন্য জোর করেন না। তাঁরা তাঁদের সাধনা করে চলেন। যার যা শিখবার বা অনুসরণ করবার, তা করে নেন।

উপনন্দের আনন্দও রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব দর্শন। উপনন্দের একটি দীর্ঘ সংলাপ বাউল-ভাবনার স্বরূপ উন্মোচন করেছে। সংলাপটি হলো–

> মনে করেছিলেম, লক্ষেশ্বর যখন আমাকে অপমান করেছে তখন ওর কাছে আমি আর ঋণ স্বীকার করব না। তাই পুঁথিপত্র নিয়ে ঘরে ফিরে গিয়েছিলাম। সেখানে আমার প্রভুর বীণাটি নিয়ে তার ধুলো ঝাড়তে গিয়ে তারগুলি বেজে উঠল–অমনি আমার মনটার ভিতর যে কেমন হল সে আমি বলতে পারি নে। সেই বীণার কাছে লুটিয়ে পড়ে বুক ফেটে আমার চোখের জল পড়তে লাগল। মনে হল আমার প্রভুর কাছে আমি অপরাধ করেছি। লক্ষেশ্বরের কাছে আমার প্রভু ঋণী হয়ে রইলেন, আর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। ঠাকুর, এ তো আমার কোনোমতেই সহ্য হচ্ছে না। ইচ্ছা করছে, আমার প্রভুর জন্যে আজ আমি অসাধ্য কিছু-একটা করি। আমি তোমাকে মিথ্যা বলছি নে, তাঁর ঋণ শোধ করতে যদি আজ প্রাণ দিতে পারি তা হলে আমার খুব আনন্দ হবে–মনে হবে, আজকের এই সুন্দর শরতের দিন আমার পক্ষে সার্থক হল।[৩৭]

এখানে উপনন্দ মনের ডাকে কাজ করেন। তাকে কেউ বাধ্য করেনি। কিন্তু মনে মনে তিনি গুরুর ঋণ স্বীকার করতে চান। তাই তার এই সাধনা। এটা হলো উপনন্দের আত্মার মুক্তি।

পঞ্চক-এর মধ্যেও বাউল-সত্তা দেখা যায়। তিনিও প্রাণের সাধনার পক্ষে। তাই সুভদ্র তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছরের বন্ধ জানলা খুলে আয়তনের সবার কাছে অপরাধ করলে পঞ্চক তাকে আলিঙ্গন করেন। সুভদ্র ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে আতঙ্কিতভাবে যখন উপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করেছে, 'আমার কী হবে।' তখন পঞ্চক বলেছেন, 'তোমার জয়জয়কার হবে সুভদ্র। তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছরের আগল তুমি ঘুচিয়েছ।'[৩৮] রবীন্দ্রনাথের কাঙ্ক্ষিত আদর্শে পুষ্ট এ চরিত্র অস্পৃশ্য জাতির সঙ্গে মেশে, তাদের সঙ্গে নাচ-গান করে, এমনকি বনভোজন করতেও পিছপা হয় না।[৩৯] কঠোর নিয়মের অচলায়তনে আবদ্ধ থেকে সে নিচু জাতের সাথে বন্ধুত্ব করে। এটা তার চরিত্রে বাউল বৈশিষ্ট্যের অন্যতম দিক। তিনি অচলায়তনের আচার্যের সাথে দাদাঠাকুরকে মিলিয়ে দিতে চান। তার কাছে মনে হয় দাদাঠাকুরকে অচলায়তনে নিয়ে গেলে অচলায়তনের সব দুঃখ দূর হবে। অবশ্য আয়তনের সদস্যরা একে দুঃখ বলে মনে করে না। কিন্তু পঞ্চক জানেন এটা মানবতার জন্য দুঃখ। তাই তিনি এই দুঃখ মোচন করতে চান। দাদাঠাকুর এবং পঞ্চকের কথোপকথনে গুরু-শিষ্যের আভাস পাওয়া যায়।

পঞ্চক বলেছেন দাদাঠাকুর তাকে অস্থির করে তুলেছে। আবার দাদাঠাকুর বলেছেন তিনি নিজে অস্থির হয়ে আছেন বলেই পঞ্চকের মনে অস্থিরতার ঢেউ লেগেছে। পঞ্চক আয়তনে ফিরে যাবার সময় একবার দাদাঠাকুরকে বলেছেন, 'ঠাকুর, যতবার বাইরে এসে তোমার সঙ্গে দেখা হয় ততবার ফিরে গিয়ে অচলায়তনে আমাকে যেন আর ধরে না। হয় ওটাকে বড়ো করে দাও, নয় আমাকে আর বাড়তে দিয়ো না।'[৪০] –এখানে পঞ্চকের মানসিক অবস্থা ফুটে উঠেছে। সে মানসিকভাবে উদার হয়ে উঠছে, মানবিক হয়ে উঠছে, কিংবা ঈশ্বরের দেখা পেয়েছে, তাই নিজস্ব সমাজে প্রতিনিয়তই কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছে। এখানেও বাউলদের সামাজিক অবস্থান চিহ্নিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

প্রায়শ্চিত্ত নাটকে ঠাকুরদা নাম না দিয়ে বৈরাগী হিসেবে ধনঞ্জয় নামের একজনকে চিত্রায়ণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি মনের মানুষের সন্ধান করেছেন। তার প্রতিই ধনঞ্জয়ের সকল ভরসা। তিনি মনে করেন রাজদরবারে রাজার সাথে আরও একজন বসে থাকেন, প্রভু বা মনের মানুষ। তিনি প্রজাদের কথা শোনেন। তিনি একদিন প্রজাদের আর্জি মঞ্জুর করবেন। তিনি আরও বলেন, যখন কোনো কিছু চূড়ান্ত রূপে পৌঁছায়, তখনই শান্তি আসে। ধনঞ্জয় বৈরাগী পথের মানুষ। তার চাল-চুলো নেই, ঘর-দোর নেই। গানই তার সম্বল। রাজা-প্রজা সকলকেই সে বলতে পারে–

ভাবছ হবে তুমিই যা চাও,
জগৎটাকে তুমিই নাচাও,
দেখবে হঠাৎ নয়ন খুলে
হয় না যেটা সেটাও হবে।[৪১]

ধনঞ্জয় বৈরাগী বাউল। পথেই তার রাজত্ব। আবার রাজার রাজত্বকেও তিনি পথ মনে করেন। রাজাকে এ কথা তিনি শোনাতে ছাড়েন না। তিনি কখন কোথায় যান, তা তিনি জানেন না। পথই তাঁকে নিয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা বা দাদাঠাকুরের মধ্যে বৈরাগী এবং গৃহী দুরকম বাউলই আছেন। বাউলদের এই দুই ভাগ। তাই ঠাকুরদার সাথে বাউলদের এখানে কোনো বিভেদ নেই। বাউলদের সাথে ঠাকুরদা বা দাদাঠাকুর বা রবি বাউলের মূল পার্থক্য হলো দেহতত্ত্ব এবং সাধনসঙ্গী। ঠাকুরদার কোনো সাধনসঙ্গী নেই। গোলাম মুরশিদ লিখেছিলেন, 'বাউলগীতি একই সঙ্গে এর সহজ সরল বাণী এবং গভীর দার্শনিক তত্ত্বের জন্যে হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু সবচেয়ে দুর্বোধ্য এ সব গানের দেহতত্ত্ব।'[৪২] এই দেহতত্ত্ব ঠাকুরদা চরিত্রে অনুপস্থিত। বরং দেহ সম্পর্কে এক ধরনের শুচিতা রয়েছে। অধ্যাত্ম সাধনা এখানে মূল কথা। আর আত্মিক আনন্দ এর প্রাণ। 'লালন ফকিরের সাধনায় সুফি ও সহজিয়া মতাদর্শ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এ সাধনা যুগলধর্মী হওয়ায় নারী-পুরুষ উভয়েই তাঁর সাধনায় দীক্ষিত ছিল। নারী সঙ্গিনীকে সেবাদাসী বলা হয়। ... লালনের অনুসারীদের মধ্যে ইদানীং অনেকেই গৃহী এবং সন্তানাদি নিয়ে সংসার যাপন করে। কিন্তু লালনের মূলনীতি অনুসারে সংসার ও সন্তানাদি পরিহারের উল্লেখ আছে। দীক্ষা নেবার পর সন্তান ধারণ করা যাবে না। তবে নারী-পুরুষ দৈহিক মিলন সাধন-জন অনুসারে অপরিহার্য।'[৪৩] বাউলদের সাথে রবি বাউলের এখানে মূল পার্থক্য। 'আত্মাকে বাউলগানে 'অচিন পাখি' এবং 'মনের মানুষ' 'অধর মানুষ' নামে চিহ্নিত

করা হয়েছে। ... বাউলসাধনা দেহবাদী সাধনা হওয়ায় তা গুপ্ত এবং কেবল দীক্ষিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এদের গানে মিথুনাত্মক দেহসাধনার কথাকে সাধারণের কাছে শব্দপ্রয়োগের মাধ্যমে রহস্য সৃষ্টি করে উপস্থাপন করা হয়। দীক্ষিত সাধক ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে এর যথার্থ অর্থ এবং গূঢ় তত্ত্ব জানা সম্ভব হয় না।'[৪৪] রবি বাউলের গানে মিথুনাত্মক দেহসাধনার রূপক নেই। বরং প্রকৃতির বিভিন্ন রূপকের মাধ্যমে তিনি ঈশ্বরকে পাওয়ার বাসনা করেছেন এবং আত্মার মুক্তি ঘটাতে চেয়েছেন।

'বাউলগানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর অসাম্প্রদায়িকতা এবং সুগভীর জীবনবোধ। বাউলসাধনাকে এর অনুসারীরা মানবধর্ম বলে থাকে। ... বাউলগানে মানুষই মুখ্য। মানুষের মধ্যেই স্রষ্টার অবস্থান। তিনি তার পরম পুরুষ। বাউল তাকে 'মনের মানুষ' নামে আখ্যায়িত করেছে। তাঁর স্বরূপ সন্ধানই বাউলের সাধনা।'[৪৫] ওপরের আলোচনায় ঠাকুরদা বা দাদাঠাকুর চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা গেছে। আমরা জানি, 'ভিক্ষাবৃত্তি এই সম্প্রদায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।'[৪৬] সন্ন্যাসীকে লক্ষেশ্বর যখন ভিক্ষা দিতে চায়, সন্ন্যাসী তা নিতে রাজি হন। এখানে সন্ন্যাসী এবং ঠাকুরদাদের ভিক্ষাবৃত্তির বিষয়টি স্পষ্ট হয়। 'বাউলরা তাদের সাধনার প্রেক্ষিতে মানুষের জীবনকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করে থাকে। একটি, বস্তুকেন্দ্রিক, জৈবিক; অপরটি আধ্যাত্মিক। এমনিভাবে মানবদেহকেও তারা দুটি অংশে বিভাজন করেন। প্রথমটি, ইন্দ্রিয় আচারসর্বস্ব বা কামকেন্দ্রিক, দ্বিতীয়টি, ইন্দ্রিয়াতীত কামবর্জিত; আধ্যাত্মিক।'[৪৭] রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় পর্যায়ের সাধক—

> ... রবীন্দ্রনাথ সহজজীবনের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে বিশ্বাসী ছিলেন। বাউলসাধনার সঙ্গে এখানে তাঁহার অনুভূতির কোনো পার্থক্য নাই। ধর্মের মধ্যে কোনো আচার পালনকে সুফিসম্প্রদায় স্বীকার করে না, প্রত্যক্ষ ভাবেই তাহারা ঈশ্বরানুভূতি লাভ করিয়া থাকে, ইহাই বাউলসম্প্রদায়ের ভাবাদর্শ হইয়াছিল। ইহার সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচিন্তার ঐক্য আছে। রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই আচারধর্মকে অস্বীকার করিয়া হৃদয়ধর্মকে প্রাধান্য দিয়াছেন। এই বিষয় লইয়াই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কয়খানি নাটক রচিত হইয়াছে, যেমন 'বিসর্জন', 'মালিনী', 'অচলায়তন' ইত্যাদি। ... রবীন্দ্র-সাধনার ইহা একটি মূল কথা। বাউল সাধনারও ইহাই মূল কথা।[৪৮]

সুতরাং কিছু মিল আর অমিল মিলেই রবি বাউলের সৃষ্টি ঠাকুরদা বা দাদাঠাকুর। ওপরের বিশ্লেষণে দেখা গেছে সবগুলো ঠাকুরদা এবং দাদাঠাকুর চরিত্র মানুষের আত্মিক উন্নয়ন ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। যেমন, *রাজা* নাটকে শুধু সুদর্শনা নয়, কাঞ্চির রাজার পর্যন্ত মানসিক উন্নয়ন ঘটিয়েছেন ঠাকুরদা। এছাড়া, সাধারণ মানুষেরা ঠাকুরদার কথায় রাজার অস্তিত্ব সম্পর্কে ভাবতে শিখেছেন এবং নিজেদের আত্মার শুদ্ধতা উপলব্ধি করেছেন। এ রকম উদাহরণ সবগুলো ঠাকুরদা চরিত্রেই রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের মানসগঠনে উপনিষদের প্রভাব রয়েছে প্রকটভাবে, তবে বাংলার বাউলের প্রভাবও অনেক। এ কারণেই তাঁর ঠাকুরদা চরিত্রটি সৃষ্টি হয়েছে। আলোচনায় দেখা গেছে ঠাকুরদা বা দাদাঠাকুর বা ধনঞ্জয় ইত্যাদি চরিত্র বাউলের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে। রবীন্দ্রনাথ নিজের বাউলসত্তা ঠাকুরদার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। তাই তাঁকে রবি বাউল বলা হয়। তবে তাঁর বাউলসত্তা একটু ভিন্ন। দেহতত্ত্বকে বাদ দিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনা করেছেন তিনি। তাঁর সাধনা একান্ত তাঁর নিজস্ব

দর্শন, যার বেশিরভাগ বাউলদর্শনের সাথে মিলে যায়। বাউল দর্শনের সাথে রবীন্দ্রনাথের বাউল সাধনার মূল পার্থক্য দেহতত্ত্ব বিষয়ে। তিনি দেহতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। দেহতত্ত্ব বিষয়টি সাধারণ সমাজ-সংসারের কাছে বিবেকেরও প্রশ্ন। সমাজে বাস করে বাউলের দেহতত্ত্বকে গ্রহণ করলে সমাজে থাকা সম্ভব নয়, সমাজের বাইরে গিয়ে সাধনা করতে হবে। তাই গৃহীর জন্য এই দর্শন অকার্যকর। কিন্তু রবি বাউলের দর্শন সংসারের যে কোনো মানুষ গ্রহণ করতে পারবে। এবং এই দর্শনে জীবন যাপন করতে পারবে। তাই বলা যায় বাউল দর্শনকে সংস্কার করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভিন্ন এক বাউল দর্শনের চিত্র এঁকেছেন। তাই এটি হয়ে উঠেছে রবি বাউলের দর্শন।

তথ্যনির্দেশ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাউল, *শিশু ভোলানাথ*, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ৭১
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছিন্নপত্রাবলী*, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৪১১, পৃ. ২৩৩
৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোক-সাহিত্য*, কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৫, পৃ. ৫৬
৪. সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলার বাউল: কাব্য ও দর্শন*, কলকাতা: জে. এন. বস এ্যান্ড কোং, ১৯৫৪, পৃ. ৬৫
৫. গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, ঢাকা: অবসর, ২০০৬, পৃ. ৩২৪
৬. গোলাম মুরশিদ, গোলাম মুরশিদের ধারাবাহিক রচনা: বাউল গান, বিডিনিউজ২৪.কম, ৩১ জুলাই ২০২০
৭. আনোয়ারুল করীম, *বাংলাদেশের বাউল: সমাজ, সাহিত্য ও সংগীত*, ঢাকা: কথাপ্রকাশ, কথাপ্রকাশ সংস্করণ: ২০১৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৭, পৃ. ৮৯
৮. বেলাল হোসেন (সম্পা.), *ফোকলোরিক রবীন্দ্রনাথ*, ঢাকা: শোভা প্রকাশ, ২০১৯, পৃ. ১৪৩-এ সংকলিত আশুতোষ ভট্টাচার্য-এর 'রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি' প্রবন্ধ।
৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ৩৭৭
১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ৩২২
১১. স্বরোচিষ সরকার, সাক্ষাৎকার, তারিখ: ১৮.১১.২০২২
১২. স্বরোচিষ সরকার, *অস্পৃশ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ*, ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা, ২০০৫, পৃ. ৭০
১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ৩২৯
১৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫০
১৫. আনোয়ারুল করীম, *বাংলাদেশের বাউল: সমাজ, সাহিত্য ও সংগীত*, ঢাকা: কথা প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ: ২০০২, কথাপ্রকাশ সংস্করণ: ২০১৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ: ২০১৭, পৃ. ১০০
১৬. *প্রাগুক্ত*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ৩৭৮
১৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৮
১৮. বেলাল হোসেন (সম্পা.), *ফোকলোরিক রবীন্দ্রনাথ*, ঢাকা: শোভা প্রকাশ, ২০১৯, পৃ. ১৪০-এ সংকলিত আশুতোষ ভট্টাচার্য-এর 'রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি' প্রবন্ধ।
১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১
২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ২৭৮
২১. *প্রাগুক্ত*।
২২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮২।

২৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮০
২৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৮
২৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৩
২৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১২
২৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১২
২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৭
২৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৭
৩০. *প্রাগুক্ত*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ৩৬৫
৩১. *প্রাগুক্ত*, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ২৫৮
৩২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৮
৩৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৪
৩৪. *প্রাগুক্ত*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ৩৫১
৩৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫১
৩৬. *প্রাগুক্ত*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ৩৭৯
৩৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৬।
৩৮. *প্রাগুক্ত*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ৩১৩
৩৯. স্বরোচিষ সরকার, *তদেব*, পৃ. ৬৯
৪০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ৩৩০
৪১. *প্রাগুক্ত*, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ২৩৯
৪২. গোলাম মুরশিদ, *প্রাগুক্ত*।
৪৩. আনোয়ারুল করীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯
৪৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫
৪৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২
৪৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০
৪৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯

বেলাল হোসেন (সম্পা.), *ফোকলোরিক রবীন্দ্রনাথ*, ঢাকা: শোভা প্রকাশ, ২০১৯, পৃ. ১৩৮-এ সংকলিত আশুতোষ ভট্টাচার্য-এর 'রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি' প্রবন্ধ।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বিয়াল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩১/ডিসেম্বর ২০২৪

শহীদুল জহিরের *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল* : উত্তর-আধুনিক পাঠ

নিপা জাহান*

সারসংক্ষেপ

সে রাতে পূর্ণিমা ছিল (১৯৯৫) শহীদুল জহিরের (১৯৫৩-২০০৮) প্রকাশিত দ্বিতীয় উপন্যাস। এই উপন্যাসের বিশ্লেষণাত্মক পাঠে উত্তর-আধুনিক তত্ত্বের বিবিধ দিকের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। বয়ন-বৈশিষ্ট্যের বিশেষত্ব এই টেক্সটকে বর্ণনবিদ্যার সূত্রে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে উৎসাহিত করে। উপন্যাসটির ন্যারেটিভের ভেতর প্রবিষ্ট ইন্টারটেক্সটুয়ালিটি, হিস্টোরিগ্রাফি, আইরনি, জাদুবাস্তববাদী অনুষঙ্গসহ উত্তর-আধুনিক অপরাপর কলাকৌশল। রূপকথা বা কিংবদন্তির আদলে, ইতিহাসের ফ্রেম ব্যবহার করে, দেশজ নাট্যরীতির আবহ ও উপস্থাপনশৈলীর প্রয়োগে সুহাসিনীর মফিজুদ্দিন মিয়ার জীবন ও ক্ষমতা-অক্ষমতার দ্বন্দ্বের প্রথাগত প্লটকে অস্বীকার করে এই উপন্যাসে প্রাবল্য পেয়েছে। তবে এই টেক্সটের বয়ন সম্পাদনে ঔপন্যাসিক এর সঙ্গে কয়েকটি উপাখ্যান যুক্ত করেছেন। এতে মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাঙালির রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতার গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন লেখক তাঁর নিজস্ব উপস্থাপনরীতিতে। উত্তর-আধুনিকবাদী তত্ত্বের প্রয়োগ ও ডিফেমিলারাইজড উপস্থাপনে ঔপন্যাসিকের নিরীক্ষা কীভাবে এই উপন্যাসে সাফল্য লাভ করেছে তা দেখবার একটি প্রচেষ্টা এই প্রবন্ধ।

চাবি শব্দ: উত্তর-আধনিকতাবাদ, বর্ণনবিদ্যা, ইন্টারটেক্সটুয়ালিটি, জাদুবাস্তববাদ।

এক

পরিণত পুঁজিবাদী (লেট ক্যাপিটালিস্ট) সময়ের সাংস্কৃতিক মতবাদ হিসেবে উত্তর-আধুনিকবাদ পরিচিত। সাধারণভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) পরবর্তীকালে বিশ্বজুড়ে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক বিপর্যয় তথা সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে এই মতবাদের উদ্ভব ঘটেছিল। কেন্দ্রবিমুখতা বা বিকেন্দ্রীকরণ (ডিসেন্ট্রালাইজেশন) এই তত্ত্বের প্রধান বিশেষত্ব। ইহাব হাসানসহ বেশ কয়েকজন তাত্ত্বিক উত্তর-আধুনিকবাদের ধারণা পরিণত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছেন। তবে জঁ ফ্রাঁসোয়া লিয়োতারের *দি পোস্টমডার্ন কন্ডিশন : অ্যা রিপোর্ট অন নলেজ*-কে এই তত্ত্বের মেনিফেস্টো হিসেবে ধরা হয়। উন্নত রাষ্ট্রসমূহের উচ্চবিকশিত সমাজ (হাই সোসাইটি) সম্পর্কিত এই রিপোর্ট ক্রমে বিশ্বের সব রাষ্ট্রে কমবেশি চর্চিত ও প্রভাব বিস্তারকারী হয়ে উঠেছে। লিয়োতার একে চিহ্নিত করেছেন 'অবযুক্তি' (প্যারালগিজম)-র দর্শন হিসেবে। মহা আখ্যানের (গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ) পরিবর্তে ক্ষুদ্র আখ্যান বা ডিসকোর্স তৈরি, অ্যান্টিফর্ম, বিনির্মাণ, অন্তর্বয়ান, আয়রনি, জাদুবাস্তববাদের প্রকাশে উত্তর-আধুনিকবাদ সাহিত্যে রূপায়িত হয়। পপুলারিজম, প্লুরালিজম, কার্নিভালিজম পোস্টমডার্নিজমের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক নানা বিষয় এই তত্ত্বের অন্তর্গত। উত্তর-আধুনিক শিল্প-সাহিত্যের প্রতিপাদ্য

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পর্কে লিয়োতার তাঁর রিপোর্টে বলেন– 'উপস্থাপন-অযোগ্য' (আনপ্রেজেন্টেবল)–কে সামনে অগ্রসর করানো ও 'নতুন উপস্থাপনার সূত্র সন্ধান' করা। জ্ঞানতাত্ত্বিক সীমা নির্ধারণ এই তত্ত্বের জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ বর্তমানকেও এই তত্ত্ব অধিগ্রহণ করেছে। তবে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণের সাহায্যে সাহিত্যে এই তত্ত্বের উপস্থিতি শনাক্ত করা যায়, সেই সূত্রেই সম্ভব উত্তর-আধুনিক সাহিত্য-বিশ্লেষণ ও গবেষণা।

উত্তর-আধুনিকবাদ বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে একটি গুচ্ছতত্ত্ব। বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদ হিসেবে এই তত্ত্ব মানবচিন্তার ইতিহাসে যেকোনো বিষয়কে বিবেচনা-পুনর্বিবেচনা ও প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়। প্রতিষ্ঠিত, আরোপিত ও পূর্ব-নির্ধারিত সিদ্ধান্ত পরিহার করে এই তত্ত্ব নিজস্ব ধারায় ঘটনা, বিষয় বা ইতিহাসকে অ-বিনির্মাণ করে। তাই সাহিত্যে বিশেষত কথাসাহিত্যের অন্তর্গত উপর্যুক্ত ব্যাপারাদিকে এই প্রক্রিয়ায় সাহিত্যিক উপস্থাপন করতে পারেন। আবার বহুত্ববাদকে উত্তর-আধুনিকেরা গুরুত্ব দেবার ফলে একই ঘটনা বা কাহিনির নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, অব-নির্মাণের সুযোগ সাহিত্যের বৈচিত্র্যের জন্য প্রয়োজন। আবির্ভাবগত বিবেচনায় দীর্ঘ[১], আলোচনার পরিধিতে বিশাল ও বাইনারিপূর্ণ তত্ত্ব উত্তর-আধুনিকবাদ সম্পর্কে প্রারম্ভিক সংক্ষিপ্ত সূত্রসমূহ শহীদুল জহিরের উপন্যাস *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল* (১৯৯৫)-এর পাঠ ও বিশ্লেষণে খুবই প্রাসঙ্গিক।

দুই

শহীদুল জহির সাম্প্রতিক বাংলাভাষার সর্বাধিক আলোচিত কথাকার। জীবদ্দশায় প্রায় অনালোচিত এই কথাসাহিত্যিক পাঠক-গবেষকের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছেন তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে[২], অর্থাৎ চলমান শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষ থেকে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর মাত্র তিনটি গল্পগ্রন্থ ও চারটি উপন্যাস তাঁকে লেখক হিসেবে খ্যাতির চূড়ায় আসীন করেছে। শহীদুল জহিরের দ্বিতীয় প্রকাশিত উপন্যাস *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল*। কিছুটা নিওক্রিটিক ও খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গিযোগে তাঁর এই টেক্সট আলোচনা ও মূল্যায়নের কিছু প্রয়াস লক্ষণীয়[৩] হলেও উত্তর-আধুনিকবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয়নি। অথচ *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল* উপন্যাসটির বিশ্লেষণে এই মতবাদ গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানত, বর্ণনবিদ্যার (ন্যারেটোলজি) বিবিধ কলাকৌশলের সাহায্যে এই উপন্যাস বিশ্লেষণযোগ্য। তাছাড়া উত্তর-আধুনিকবাদী উপন্যাস হিসেবে এতে ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি, হিস্টোরিগ্রাফি, আইরনি ও জাদুবাস্তববাদী অনুষঙ্গের প্রয়োগ লক্ষণীয়। উল্লেখ প্রয়োজন, উপন্যাসের ন্যারেটিভের ভেতর অপরাপর অনুষঙ্গসমূহের উপস্থিতি।

তিন

রূপকথা বা কিংবদন্তির আদলে ইতিহাসের ফ্রেম ব্যবহার করে সুহাসিনীর মফিজুদ্দিন মিয়ার জীবন ও ক্ষমতা-অক্ষমতার যে মূল আখ্যান প্রথাগত প্লটকে অস্বীকার করে এই উপন্যাসে প্রাবল্য পেয়েছে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বেশ কয়েকটি উপাখ্যান। *শহীদুল জহির নির্বাচিত উপন্যাসের ব্লার্বে সে রাতে পূর্ণিমা ছিল* প্রসঙ্গে লেখা আছে–

> এই গল্প একটা গ্রামের, মফিজউদ্দিন এবং চন্দ্রভান, মোল্লা নাসিরউদ্দিন এবং দুলালি, আবু বকর সিদ্দিক এবং আলেকজানের। এই গল্প মফিজউদ্দিনের বন্ধু করিম খাঁর ছেলে আফজাল খাঁর পরিবারেরও। গরীব কৃষকের বংশধর, আমরা, আমাদের পথচলার গল্প এটা, এই গল্প আমাদের উত্থান এবং পতনের। একটা গ্রাম তো একটা দেশই – আমরা বিবর্তিত হই, আমাদের গ্রামের সামাজিক সম্পর্কের সূত্রগুলো পাল্টায় এবং আমরা দেখি আমাদের দেশই বদলে যাচ্ছে। এই ধারা চলে। অথবা এই গল্প হয়তো শুধুই ভালবাসার, প্রেমের, ভালবাসার আলৌকিক আনন্দের এবং বেদনার হেমকান্তি সৌন্দর্যের।[৪]

এই বক্তব্যে আলোচ্য উপন্যাসের আখ্যান-উপাখ্যানের বৃত্তান্ত এবং অংশত বিশ্লেষণের সূত্র পাওয়া গেলেও উত্তর-আধুনিকবাদী নির্মাণ হিসেবে এর বিশ্লেষণের লক্ষ্যে প্রয়োজন হয় আরো গভীর পাঠের, নিবিষ্ট মনোযোগের। 'গরীব কৃষকের বংশধর' যে 'আমরা', অর্থাৎ বাংলাদেশী জাতীয়তার পরিচয়ধারীরা তাদের উত্থান-পতন, তাদের সামাজিক এবং বিশেষত রাজনৈতিক সম্পর্কের সূত্রসমূহের পরিবর্তনে ইতিহাসের গভীর ও তাৎপর্যমণ্ডিত এক চোরাস্রোত এই উপন্যাসের প্রেমঘটিত ও ক্ষমতাজনিত সম্পর্কসমূহের গল্পগুলো ছাপিয়ে একে হিস্টোরিগ্রাফিক মেটাফিকশন[৫] হিসেবে পাঠ করতে পাঠককে উদ্বুদ্ধ করে। ক্ষমতা ও মান্যতায় সুহাসিনীর যে মফিজুদ্দিন মিয়া ঐ লোকালয়ে বিস্ময় ও কিংবদন্তি সৃষ্টিকারী 'আততায়ীদের হাতে ভাদ্র মাসের এক মেঘহীন পূর্ণিমা রাতে' 'সপরিবারে নিহত হওয়ার' পর গ্রামবাসী এই 'ঘটনার আকস্মিকতার বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে পারে না' এবং এই 'রাতের ঘটনা একটি দূরবর্তী দুঃস্বপ্নের মতো ভেসে থাকে'। কেবল তা-ই নয়–

> তারা (গ্রামবাসীরা) কেবল এই বিষয়টি ভেবে বিস্মিত হতে থাকে যে, মফিজুদ্দিন মিয়া কি করে মারা যেতে পারে, এ রকম তো হওয়ার কথা ছিল না, তার তো ১১১ বৎসর বেঁচে থাকার কথা ছিল এবং তার বয়স তো মাত্র ৮১ বৎসর হয়েছিল বলে তারা জেনেছিল।[৬]

সুহাসিনীর মফিজুদ্দিন মিয়ার সপরিবারে নিহত হবার ঘটনা এবং এই ঘটনার আকস্মিকতায় গ্রামবাসীর বিস্ময়-বিমূঢ়তা ও আলোচ্য হিসেবে এই উপন্যাসের উদ্ধৃত অংশে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সপরিবার শহিদ হওয়ার পর এদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর দুঃস্বপ্নবৎ বিস্ময় এবং এই ঘটনার অন্তরালের রহস্য সম্পর্কে বিহ্বলতা ও দ্বিধাগ্রস্ততাই যেন প্রকাশ পায়। জনমুখিতা, সাংগঠনিক দক্ষতা, দূরদর্শিতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সাহস আর দৃঢ়চেতা মনোবলের মাধ্যমে বাংলার এক সাধারণ পরিবারের যে সন্তান হয়ে উঠেছিলেন বাঙালির স্বপ্ন-আশা-স্বাধীনতার প্রতীক, সুহাসিনীর মফিজুদ্দিন মিয়া যেন তাঁরই ছায়া। তাই (তোরাপ আলির বয়ানে) মফিজুদ্দিন মিয়া জোর দিয়ে বলতে পারে–

> যে জিনিস ঝইরা পড়ে তোরাপ, তা হইত্যাছে জেবন, এই হাত থেইক্যা যা ঝইরা পড়ে তা হইলো ত্যাজ; আমার এই বাড়ি আর এই গেরামে আমি কি জেবন আর ত্যাজের আবাদ করি নাই?[৭]

'ত্যাজ' প্রেরণার সমার্থক এখানে। সুহাসিনীতে হাট বসানো, খাল কাটার কাজ মফিজুদ্দিনের নির্দেশমাত্রই সম্পাদিত হয়। ইচ্ছা আর জেদের কাছে হার-না-মানা মফিজুদ্দিনকে উপন্যাসে কেবল মানবিক প্রশ্নেই নমনীয় হতে দেখা যায়, অন্তত দুলালির মৃত্যুর পর। ক্ষমতাকে ক্ষমতা দিয়ে, কৌশলকে কৌশল দিয়ে প্রতিহত করা মফিজুদ্দিন প্রকৃতপক্ষেই তার বাড়ি ও গ্রামে ত্যাজ-

এর আবাদ করেছেন – বাংলাদেশ ও এই ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতিতে যেমনটি করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মূলত ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি উপনিবেশ হিসেবে শাসিত ও শোষিত বাঙালিকে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তি হয়ে ওঠেন শেখ মুজিবুর রহমান।

রায়গঞ্জ যখন থানা থেকে উপজেলায় পরিণত হয় তখন সবার মঙ্গলার্থে মফিজুদ্দিন নতুন এই উপজেলার চেয়ারম্যান হবার দৃঢ় ইচ্ছের কথা জানান দিয়ে সুহাসিনীতে দীর্ঘদিন ধরে সম্পাদিত তার কাজের কথা গ্রামবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে–

> ...এইখানে যখন কেউ পারে নাই তখন এই জেলা বোর্ডের রাস্তার উপুর এই গেরামের মাইনষের অনেক কিছু করি নাই? দশগেরামের মানুষ যখন খরায় কষ্ট পাইত্যাছিল, মাঠে ফসল আর ঘরে সুখ আছিল না, তহন এই যে গেরামের ভিতর জালের নাহাল পানি ভরা খাল, এইগুলান কি আমি খোঁড়ার ব্যবস্থা করি নাই? আমি কি তোমাগোরে দুঃখ-দুর্দশায় সক্কলের আগে খাড়া হই নাই, আর, আমি কি এই রায়গঞ্জে, এই বরমোগাছা আর তোমাগোরের সুহাসিনীর নেইগ্যা অত্যাচার সইহ্য করি নাই? গ্রামের ভিতরে কুত্তা মারার মাঠের উপুর দিয়্যা যুদি তাকাও, যুদি মাটি শুঁইক্যা দেখ তাইলে আমার শরীলের ঘামের গন্ধ কি পাওয়া যায় না?
> সুহাসিনীর লোকদের তখন কুকুর মারার মাঠের কথা মনে পড়ে এবং গ্রামের যারা প্রবীণ, তারা দেখতে পায় যে, তাদের জীবনের সমুদয় গল্পের সঙ্গে ঘাস এবং লতার মতো জড়িয়ে আছে মফিজুদ্দিন মিয়ার অস্তিত্ব।[৮]

বাংলার জনগণের স্বাধিকার লাভ ও ভোটাধিকার প্রয়োগের স্বপ্ন সুহাসিনীর বাসিন্দাদের নিয়তি ও বাস্তবতার সঙ্গে সমীকৃত হয়ে আছে এই উপন্যাসে। তাই–

> মফিজুদ্দিন একনাগাড়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন নির্বাচনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যায়। সুহাসিনীর মানুষের এই কথাটি জানা ছিল যে, মফিজুদ্দিন এক শ এগারো বছর জীবিত থাকবে, এবং যেকোনো কারণেই হোক, এ কথায় তাদের যেহেতু আস্থা জন্মে গিয়েছিল, তারা একসময় ধরে নিয়েছিল যে, মফিজুদ্দিনের এক শ এগারো বছর তাদের আর ভোট দেয়ার কোনো ব্যাপার নাই। তাদের এই জ্ঞান এবং এই জ্ঞানের যথার্থতার ধারণা নিয়ে তারা ব্রিটিশ আমলের শেষাংশ পাকিস্তানের যুক্তফ্রন্ট এবং আইউব খানের বিডি চেয়ারম্যানের কাল, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ন মাস এবং মুক্তিযুদ্ধোত্তর স্বাধীন বাংলাদেশের সময়কালের ভেতর দিয়ে পার হয়ে আসে এবং এই সুদীর্ঘকাল মফিজুদ্দিনের পরাজয়ের প্রশ্ন কখনো ওঠে নাই, কারণ, প্রথম দিকে গ্রামের লোকেরা নিজেদের আগ্রহের কারণেই তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীনভাবে নির্বাচিত করতে চাইত, পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন নির্বাচনে মফিজুদ্দিন এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে, গ্রামের মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিষয়টি গৌণ হয়ে পড়ে এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভের ধারণা তার কাছে অপমানকর বলে মনে হয়; এই সময় কখনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা গেলে পরিণতিতে প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরে পড়তে হতো।[৯]

উদ্ধৃতাংশে একদিকে সুহাসিনী তথা বাংলার মানুষের 'ভোট' অর্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতির রূপরেখা উঠে এসেছে, অন্যদিকে প্রবল পরাক্রমশালী এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ক্ষমতাকেন্দ্রিকতা বনাম প্রতিপক্ষ ও জনসাধারণের সামাজিক ও মানসিক অধস্তনতার চিত্র উঠে এসেছে, আন্তোনিও গ্রামসির (১৮৯১-১৯৩৭) ভাষায় যা হেজিমনি বলে চিহ্নিত। আবার এক সাক্ষাৎকারে মফিজুদ্দিন চরিত্রটি 'বিভিন্ন মেজাজের জাতীয় বুর্জোয়ার চেহারাই উন্মোচিত' কি-না, প্রশ্নকর্তার এমন প্রশ্নে ঔপন্যাসিক জানান– ভিন্ন দুটি বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এই চরিত্র কল্পনা–

> চরিত্রটা মূলত সামন্ত চরিত্র। আমার তাই ধারণা। আসলে দুইটা বাস্তব ঘটনা আমি আমার কাহিনিতে জোড়া লাগাইতে চাইছিলাম। প্রথমত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিরাদাবাদ গ্রামের এক হিন্দু পরিবারের ছয় জনকে সম্পত্তির জন্য খুন করে ড্রামের ভিতরে পুরে চুন দিয়া নদীর পানিতে ফেলায়া দেওয়া হয়েছিল। মরে যাওয়ার পরে তারা ড্রামের ভিতর চুন দেওয়া মাংসের টুকরায় পরিণত হয়, বস্তুমাত্র হয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এই লোকগুলোর সকলের জীবন ছিল, একেকটা কাহিনি ছিল প্রত্যেকের। দ্বিতীয়ত আশির দশকে সামরিক শাসকের কালে আমি দেখেছিলাম কীভাবে বিপ্লবীদের পরিবর্তন হয়। আসলে একজন প্রাক্তন বিপ্লবীকে আমি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে কাজ করার সময় পাইছিলাম, তিনি একটা ভালো ডিগবাজি দিয়া এসে মন্ত্রী হয়েছিলেন। আমি অবশ্য আমার লেখায় বিষয়টা আনতে পারি নাই, লেখা আমার হিসাবের গণ্ডির মধ্যে থাকে নাই, থাকতে চায় নাই, আমার কিছু করার ছিল না, এটা আমার অক্ষমতা, ফলে একটা মফিজুদ্দিনের চরিত্র দাঁড়ায়া যায়। মফিজুদ্দিনের পরিবর্তনের সঙ্গে বিপ্লবীর বদলায়া যাওয়ার বিষয়টা মেলে নাই। আমি অবশ্য জোর করি নাই। মফিজুদ্দিন একটা গ্রামের মাতবর লোক, সে একসময় অগ্রগামী থাকে, অন্য সময় এতে বাধা দেয়। নিজে ভূমিহীনের পরিচয় থেকে সামন্ত আভিজাত্যে আসে, কিন্তু দুলালিকে গ্রহণ করে না, বলে, জোলার মেয়ে। সমাজের চলমানতা আটকায়া রাখার চেষ্টা করে। বিকাশের আকাঁড়াকে বুঝতে পারে না।[১০]

এভাবেই *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল* উপন্যাসের ক্রমভঙ্গ প্লটের ভেতর গভীর বাস্তবতাময় রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস স্তরীভূত—এই ইতিহাস সুহাসিনীর, বাংলাদেশের। তাই যে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা দিয়ে এই উপন্যাসের শুরু তা মামুলি নয়–পরিচিত। পূর্ণিমার ঘোরলাগা বয়ানে, আবর্তিত হলেও প্লটে মূলত ক্ষমতান্বেষীর দুরভিসন্ধির সঙ্গে সাধারণ জনতার বেদনাময় বিস্ময়ের সম্মিলন ঘটেছে, রহস্যময় পূর্ণিমার আলোর সঙ্গে এতে এক কালোরাতের নৃশংসতার পটভূমি যুক্ত। আর এমন ঘটনা ও বয়ন এবং বিশেষত মফিজউদ্দিন চরিত্রের নির্মাণে বঙ্গবন্ধু-চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য আরোপণের মাধ্যমে গাল্পিক নির্মাণ এই উপন্যাসের পাঠকে হিস্টোরিগ্রাফিক মেটাফিকশন হিসেবে ফলপ্রসূ করে তোলে।

চার

উত্তর-আধুনিকবাদ এর তত্ত্বগুচ্ছের বিবিধ ছাঁচে একই ঘটনা, চরিত্র বা বিষয়কে পরীক্ষা করতে প্রণোদিত করে। তাই সুহাসিনীর মফিজুদ্দিনের সপরিবার নিহত হবার ঘটনা কেবল ঐতিহাসিক ফ্রেমে বিশ্লেষ্য নয়, এর রয়েছে ভিন্নতর ভাষ্যও। সুহাসিনীর বর্ষীয়ান অভিভাবকতুল্য মফিজুদ্দিনের হত্যাকাণ্ডে তাই স্মরণ করা যেতে পারে বাইবেল-বর্ণিত আদিপাপের আর্কেটাইপকে। এজন্যই চরাচর-প্লাবিত জ্যোৎস্নায় এই লোকালয়ের বাসিন্দাদের ঘোর লাগে, তাদের চিত্ত চঞ্চল হয়, শান্তি খুঁজে পায় না তারা। তাদেরই একজনের চাঁদের আলোকে মনে হয় 'যানি চান্দের আলো না', সে অনুভব করে যেন পানির মধ্যে ভেসে ওঠে, আর তার হাত-পা-শরীর হাল্কা হয়ে যায়, নেশার মতো লাগে। তখন সে বলে–

> আমি আমার দোস্তো বাহের তালুকদারের নাম ধইর‍্যা চিক্কুর দিয়্যা উঠি, ওই বাহের, বাহের রে; কেন যে এই রহম চিক্কুর দেই, কইব্যার পারি না, এমনি দেই; ছাওয়াল-পাওয়াল যেমন বৃষ্টি দেইখলে নাপ পাড়ে, আমারও তেমনি ওই চান্দের আলোয় চিক্কুর দিব্যার ইচ্ছা করে আর আমি চিক্কুর দিয়া ওঠি;[১১]

এই আচরণ আদিপাপের প্রায়শ্চিত্তবৎ, দৃশ্যমান একজনের হয়েও সামষ্টিক। উপন্যাসে আর্কেটাইপের প্রয়োগ আরও স্পষ্ট আকালুর বোবা স্ত্রী তথা মফিজুদ্দিন মিয়ার মায়ের আখ্যানে:

ধানক্ষেতে কুড়িয়ে পাওয়া বোবা মেয়ে শিশুটি আকালুর ঘরে প্রতিপালিত হয়। তারপর গ্রামবাসী তাকে আকালুর সন্তানের মা হিসেবে অপ্রস্তুতভাবে গ্রহণ করে। এই গ্রামের লোকদের কাছে এই বোবা নারীর আগমন সম্পর্কিত ঘটনা বিভ্রান্তির ভেতরেই থেকে যায়, যদিও একবার আকালু জানায়–

> মেয়েটি আসলে মাটির ভেতর থেকেই উঠেছে, মাটি ফুঁড়ে প্রথমে তার মাথাটি বের হয়ে আসে, এই সময় সে মেয়েটিকে দেখে এবং মাটি খুঁড়ে বের করে আনে; সে বলে, ক্যা মাটির ভিতর থেইক্যা গাছ যুদি উইঠপার পারে, তাইলে মানুষ উইঠলেও উঠপার পারে।[১২]

এই বর্ণনাংশ খুব স্বাভাবিকভাবেই পাঠককে নিয়ে যায় ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত সীতা-কাহিনির কাছে। ভারতবর্ষে আর্যায়নের প্রধান বৈশিষ্ট্য কৃষি সভ্যতার। জনক রাজার লাঙলে সীতার উত্থান *রামায়ণে* সেই সভ্যতারই ইঙ্গিতবাহী ঘটনা। কৃষক-সন্তান মফিজুদ্দিনের গোত্রপতি হওয়া তথা সাধারণ সামন্তীয় পরিবারের সন্তান থেকে রাজনীতিসূত্রে একটি রাষ্ট্রের পত্তন করা বাঙালি জাতির জনকের উত্থান-ইতিহাস উক্ত আর্কেটাইপকে বহন করে বাস্তব হয়ে ওঠে।

পাঁচ

আগের অনুচ্ছেদে বর্ণিত, আলোচ্য আর্কেটাইপ ঔপন্যাসিকের পূর্ব-ধারণা থেকে গৃহীত। সেই ধারণার উৎস *রামায়ণ*। উল্লেখ প্রয়োজন, *রামায়ণ* ভারতবর্ষীয় পুরা-ইতিহাস; যা আদিতে মৌখিকভাবে প্রচলিত থাকলেও পরে নানাজনের হাতে লিখিত ও পুনর্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ মফিজুদ্দিনের বোবা মায়ের চরিত্র-কল্পনায় এই উপন্যাসে ইন্টারটেক্সচুয়াল[১৩] উপাদানের উপস্থিতি লক্ষণীয়। কেবল *রামায়ণ* নয়, গ্রন্থ-শিরোনামে ও বয়ানে 'চন্দ্র' প্রসঙ্গ শহীদুল জহিরের পাঠককে বাংলা সাহিত্যের শক্তিমান সাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে যায়; তাঁর *চাঁদের অমাবস্যা* উপন্যাস পাঠের স্মৃতিকে জাগরূক করে তোলে। প্রসঙ্গত দেখে নেয়া যেতে পারে *চাঁদের অমাবস্যা* উপন্যাসের শুরুটা–

> শীতের উজ্জ্বল জ্যোৎস্নারাত, তখনো কুয়াশা নাবে নাই। বাঁশঝাড়ে তাই অন্ধকারটা তেমন জমজমাট নয়। সেখানে আলো-অন্ধকারের মধ্যে যুবক শিক্ষক একটি যুবতী নারীর অর্ধ-উলঙ্গ মৃতদেহ দেখতে পায়। অবশ্য কথাটা বুঝতে তার একটু দেরি লেগেছে, কারণ তা ঝট্ করে বোঝা সহজ নয়। পায়ের ওপর এক ঝলক চাঁদের আলো। শুয়েও শুয়ে নাই। তারপর কোথায় তীব্রভাবে বাঁশি বাজতে শুরু করে। যুবতী নারীর হাত-পা নড়ে না। চোখটা খোলা মনে হয়, কিন্তু সত্যিই হাত-পা নড়ে না। তারপর বাঁশির আওয়াজ সুতীব্র হয়ে ওঠে। অবশ্য বাঁশির আওয়াজ সে শোনে নাই।[১৪]

অপরদিকে *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল* উপন্যাসের শুরু–

> গ্রামের লোকদের সে রাতের চাঁদের কথা মনে পড়ে এবং তারা সেই চাঁদের বর্ণনা দেয়। আততায়ীদের হাতে ভাদ্র মাসের এক মেঘহীন পূর্ণিমা রাতে সুহাসিনীর মফিজুদ্দিন মিয়া সপরিবারে নিহত হওয়ার পরদিন, গ্রামবাসীদের কেউ কেউ মহির সরকারের বাড়ির প্রাঙ্গণে এসে জড়ো হয়...এবং তাদের শুধু পূর্ণিমার সেই চাঁদের কথা মনে পড়তে থাকে। তখন হুঁকোর গুড়গুড় শব্দ এবং খামিরা তামাকের গন্ধের ভেতর ডুবে থেকে তোরাপ আলি কথা বলে, সে বলে যে, আগের দিন সন্ধের সময় সে রাস্তার কিনারায় বেঁধে রাখা গরুর বাছুর ঘরে আনছিল; সে বলে, আমি পরথমে বুইজব্যার পারি নাই, শরীলের মইদ্দে কেমুন যানি ভাব হইবার নিছিল, কেমন যানি ঘোরঘোর নেশার নাহাল, চাইর দিকে কেমন যানি ধুলা ধুলা, কিন্তু ধুলার ভিতরে কেমন যানি ভাব,

> কেমন যানি রঙের নাহাল ছড়ায়া আছে ; আমি তো বুজি না কি, খালি বুজি কিছু একটা ; তার বাদে যহন ম্যাবাড়ির সামনে আইছি তহন বুইজব্যার পারি আসলে কি ; দেহি কি ম্যাবাড়ির মাথাভাঙা আম গাছটার ডাইন পাশ দিয়া পুন্নিমার চান ভাইসা উইঠছে। গ্রামবাসীদের সকলের এই চাঁদটির কথা মনে পড়ে এবং মহির সরকারের উঠোনে বসে তারা বলে যে, তাদের মনে হয়েছিল যেন এক ছিন্ন মুণ্ডুর মতো রক্তাক্ত চাঁদ গ্রামের মাথার উপর দিয়ে গড়িয়ে যায়। অমাবস্যার অন্ধকারের বদলে আততায়ীরা কেন পূর্ণিমার চন্দ্রালোকিত রাতকে বেছে নেয়, তা গ্রামবীসারা বুঝতে পারে না;[১৫]

দুটি উপন্যাসেই মোহগ্রস্ত পূর্ণিমার বর্ণনার ভেতর দিয়ে হত্যাকাণ্ডের ঘটনার কথা বলা হয়েছে। দুই উপন্যাসেই 'পূর্ণিমা'র ইমেজের প্যারাডাইম-শিফট[১৬] ঘটেছে। ওয়ালীউল্লাহ্ উপন্যাসের নামকরণে 'অমাবস্যা' ব্যবহার করে এই প্যারাডাইম-শিফটকে ইঙ্গিতবাহী করলেও জহির তা না করে ব্যাপারটিকে আরো তির্যকভাবে নির্মাণ করেছেন। ওয়ালীউল্লাহ্ যেখানে ব্যক্তিচৈতন্যের সহায়তা নিয়ে বর্ণনা সম্পাদন করেছেন, জহির সেখানে নিয়েছেন সামষ্টিক চৈতন্যের আশ্রয়। *চাঁদের অমাবস্যা*র ঔপন্যাসিক ইয়োরোপীয় দর্শনজাত অস্তিত্বজিজ্ঞাসাকে গ্রামীণ পটভূমিতে স্থাপন করেছিলেন এবং বয়নে প্রাধান্য দিয়েছিলেন মনোলগকে। *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল*র ঔপন্যাসিক এই ভূখণ্ডের মানুষের চেনা ইতিহাসকে অপরিচিতকৃত আকারে হাজির করেছেন মহির সরকারের বাড়ির উঠোনে বসা এক বৈঠকে, তোরাপ আলির কথনে –যা স্মরণ করিয়ে দেয় হাজার বছরের বাংলার পুথিপাঠ-সংস্কৃতিকে। তোরাপ আলি যেন সেই শোকাবহ পুথির বয়নকারী আর সেই বৈঠক যেন পুথিপাঠের আসর; সমবেত সকলে এই শোকের ধারক ও সেই বয়ানের মুগ্ধ শ্রোতা। কেবল ওয়ালীউল্লাহ্ নয়, শহীদুল জহিরের এই উপন্যাস-পাঠে মার্কেসের *নিঃসঙ্গতার একশ বছর* টেক্সটের সঙ্গেও খানিক সাদৃশ্য আবিষ্কৃত হয়। চঞ্চল আশরাফের এক লেখায় *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল* উপন্যাসের সঙ্গে মার্কেসের টেক্সটের সাদৃশ্যের কথা এসেছে। তিনি লিখেছেন–

> *মার্কেজের হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচ্যুড*-র শুরু ফায়ারিং স্কোয়াড থেকে এবং এর পর দীর্ঘ ফ্ল্যাশব্যাক; *সে রাতে পূর্ণিমা ছিলতে*ও তেমনটিই : মফিজুদ্দিনের সপরিবারের নিহত হওয়ার পর থেকে তার জন্মকাহিনী, কৈশোর ও যৌবন, বৃদ্ধাবস্থা ও খুন হওয়ার মধ্য দিয়ে সর্বাংশে পতন এক দীর্ঘ ফ্ল্যাশব্যাকে গ্রামবাসীর স্মৃতির সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। সময় সব সময় তাতে এগোয় না; দূর-অতীত বর্তমানের প্রতিটি মুহূর্তে হাজির হয়ে থাকে; আর ভবিষ্যৎ অলরেডি হ্যাপেন্ড।[১৭]

আলোচ্য উপন্যাসের অন্যত্র প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিত মল্লনাগ বাৎস্যায়ন (আনু. ৪র্থ-৬ষ্ঠ শতক) রচিত *কামসূত্র* গ্রন্থ ও এর বিষয়বস্তুর কথা গণিকা নারীর কথায় উঠে এসেছে–

> ...সে হালাকু এবং জোবেদকে বলে যে, তার বয়স যখন আরো কম ছিল তখন সে একবার কোলকাতায় ছিল, এখন সেখানে সে কিছু লেখাপড়া শেখে এবং বাৎসায়নের বই পড়ে; কামসূত্রের নাম শুইনছ? সে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে। তার কথা শুনে হালাকু হা করে থাকে, নষ্ট মেয়েটির উচ্ছ্বসিত স্খলিত হাসি পানির শব্দের পাশাপাশি যমুনার বুকের ওপর দিয়ে বয়ে যায়; হালাকুর ফাঁকা নির্বোধ চাউনির দিকে তাকিয়ে সে বলে যে, সে চৌষট্টি কলা জানে এবং এ বিষয়ে হালাকু এবং জোবেদের মূর্খতার কথা বলে তাদেরকে বিভ্রান্ত এবং লোভী করে তোলে; তোমরা এই মজার কিচ্ছু জান না, সে বলে, বাৎসায়ন এই কামের নেইগা আশিটা আসনের কথা লেইখ্যা গেছে; এবং তারপর বলে যে, সে তাদেরকে এই সবই শেখাবে যদি তারা অপেক্ষা করে...।[১৮]

ছয়

আইরনি ও ব্ল্যাক হিউমার উত্তর-আধুনিক কথাসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ।[১৯] বাৎস্যায়নের টেক্সটসূত্রে ঔপন্যাসিক গণিকা নারীর রহস্যময় ও ছলাকলাপূর্ণ কৌশলের মাধ্যমে মাত্রাতিরিক্ত রতিক্রিয়ার ফলে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণজনিত কারণে দুই ডাকাতের মৃত্যুদৃশ্য রচনা করেন। এই দুই মৃত্যুদৃশ্যে আইরনির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। উল্লেখ থাকে যে, উত্তর-আধুনিক আখ্যানের অন্যতম প্রকাশ-বৈশিষ্ট্য এই আইরনি। উপন্যাসে যখন গণিকা মেয়েটি জোবেদকে জানায়–

> তার বন্ধু হালাকু খুব দুর্বল পুরুষ ছিল, সে তার কাজ শেষ করার আগেই মারা গেছে, এখন তাই কামসূত্রের অবশিষ্ট আসনগুলো সম্পর্কে জানার দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে; কারণ, সে-ই হালাকুর চাইতে সমর্থ পুরুষ।[২০]

তখন, হালাকুর মৃত্যুসংবাদে পাঠক বিচলিত বা ভারাক্রান্ত হয় না। বরং জোবেদের আসন্ন মৃত্যু সম্পর্কে এক অমোঘ প্রতীক্ষার চক্রে প্রবেশ করে। মফিজুদ্দিনের মতে গণিকা নারীর এই মৃত্যুময় রহস্যক্রীড়া তাকে বাঁচানোর চেষ্টামাত্র। উপন্যাসের পাঠকও এই সত্য উপলব্ধি করে মফিজুদ্দিন ও গণিকা নারীটির প্রতি পক্ষপাতমূলকভাবে সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে; আর রতিক্লান্ত মৃত দুই ডাকাত হালাকু ও জোবেদের এই পরিণতিতে ঔপন্যাসিকের বর্ণনা ও পাঠকের প্রত্যাশার যোগাযোগে ব্ল্যাক হিউমার সৃষ্টি হয়।

সাত

উপন্যাসে জাদুবাস্তববাদের রূপকার হিসেবে শহীদুল জহির বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে পরিচিত। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পের গুরুত্বপূর্ণ দিক এটি নিঃসন্দেহে। আলোচ্য উপন্যাসে অন্তত দুটি বর্ণনায় জাদুবাস্তববাদের প্রকাশ লক্ষণীয়–একটি তোরাপ আলির ভাষ্যে নির্মিত, অপরটি দুলালির মৃত্যু-পরবর্তী পরিস্থিতিতে সৃষ্ট। সপরিবার ভাদ্র মাসের ঘোরলাগা পূর্ণিমা রাতে মফিজুদ্দিন মিয়া নিহত হবার পরদিন মহির সরকারের উঠোনে সমবেত 'তর্কের অনুপযুক্ত' সময়ে শ্রোতাগণ 'বিভ্রান্তিসহ নীরবে বক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে'। তখন ভূতপূর্ব নরসুন্দর তোরাপ আলি একদিন মফিজুদ্দিন মিয়ার চুল কাটার ঘটনার স্মৃতিমূলক বর্ণনা প্রদান করে–

> ...সেই মুহূর্তে তার সামনে সে অসাধারণ একটি করতল প্রসারিত দেখতে পায়; মহির সরকারের উঠোনে জড়ো হওয়া কৃষকদের নির্লিপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলে, আমার ওস্তাদ শিখাইছিল যে, মাইনষের জীবনের উপুর ভর কইর‍্যা থাকে চাইরটা জিনিস, এ্যার একটা হইলো সূরযো, তার বাদে চান, মঙ্গল আর শনি; মাইনষের হাতে থাকে এই চাইর জনের রাজত্বের হিসাব, যুদি শনির রাজত্ব বাইড়া যায় তাইলে বাণিজ্যের নাও মাইর খায়, ফসলে পোকা হাঁটে, আন্ধারে পেঁচা ডাইক্যা ওঠে, আসে দুর্দিন; তবে সূরযের রাজত্ব যুদি বড় থাকে তাহইলে সাহস থাকে কইলজা জোড়া, আর তাইলে শনি কাবু হয়্যা থাকে; আর মঙ্গল যুদি রাজা হয় তাইলে সব ভালো; কিন্তু চান্দের রাজত্ব যুদি বড় হয় তাইলে কি হয় ওস্তাদ? আমি জিজ্ঞাস করি, আমার ওস্তাদ কয়, এ্যার কোনো ভালো-মন্দ নাই, কিম্বা এইটা ভালো-মন্দ দুই-ই; চান্দের আলো যহন ফেরেশতারা পিরথিবীতে ঢাইল্যা দেয়, তহন বিরিক্ষ আর পশুপাখির পরান নিঝঝুম হয়্যা আসে, তহন চান্দের রাজত্বে যে যায় সে কইতে পারে না, সে জাইগা না ঘুমায়া আছে, সে য্যান খালি এক নেশার ভিতর দিয়্যা হাঁইট্যা যায়; এই কথা কইছিল আমার সেই ওস্তাদ; আর সেইদিন ম্যাবাড়ির উঠানে গাবগাছের ছায়ায় চিৎ কইর‍্যা রাখা ম্যাসাবের হাতের জমিনে আমি সূরযের রাজত্ব বড় শক্ত দেখি, কিন্তু তার হাতের তালুত তার চাইতে বড় আছিল চান্দের পাহাড়। তোরাপ আলি বলে যে, মফিজুদ্দিন মিয়ার করতলের রেখা দেখে বহুদিন পূর্বে সেই দুপুরে সে ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, কারণ সে বলে যে, মানুষের হাতের রেখা আঙুলের দিক থেকে কব্জির দিকে নেমে আসে, কিন্তু

> মফিজুদ্দিন মিয়ার হাতের রেখাগুলো কব্জির কাছাকাছি স্থানে জটলাবদ্ধ ছিল এবং এই জট থেকে তিনটি পাকানো দড়ির মতো রেখা আঙুলের দিকে প্রবাহিত হয়ে, কনিষ্ঠা ও অনামিকা, অনামিকা ও মধ্যমা এবং মধ্যমা ও তর্জনীর মাঝখানের গর্তে পতিত হয়েছিল। তোরাপ আলি বলে যে, মফিজুদ্দিন মিয়ার করতলের রেখাগুলোর, হাতের আঙুল বেয়ে নিচের দিকে নেমে যাওয়ার এই দৃশ্যে তার এক অস্বস্তিকর অনুভূতি হয়েছিল, তার কেমন ভয় লেগেছিল যেন; সে বলে, আমি চুল কাটা থামায়া তাকায়া থাকি, জিজ্ঞাস করি, ম্যাসাব আপনের হাতের রেখাগুলান এই রকম ক্যা? ম্যাসাব বিরক্ত হয় নাকি আমার কথা শুইন্যা, তা বুজিবার পারি না, কেমন গম্ভীর হয়্যা কয়, কি রকম? আমি সাহস রাইখ্যা কই, কেমন যানি গড়ায়া পইড়ত্যাছে, কি যানি বায়া পইড়ত্যাছে জমিনের দিকে মনে হয়।[২১]

গ্রামের প্রাক্তন এই নাপিত জ্যোতিষবিদ্যা জানে বলে তারা (শ্রোতারা) স্মরণ করতে পারে না। মূলত প্রশ্নহীন, তর্কহীন, বিশেষ পরিস্থিতি, সম্মোহন, সামষ্টিক বিশ্বাস, গুরু-বিদ্যা বা গুপ্তবিদ্যার আশ্রয়ে বয়ান ও এর গ্রহণযোগ্যতা এ-সবই জাদুবাস্তববাদী আখ্যানের বৈশিষ্ট্য, যা এই বর্ণনাংশ ধারণ করেছে। উপন্যাসের অন্যত্র দুলালির মৃত্যুর তৃতীয় দিন যখন লাশের পচা গন্ধ গ্রামবাসী পায় না বরং বালিকার 'মুখটি চিনেমাটির তৈজসের মতো চকচক করে' তখন গ্রামের লোকেরা—

> এই বিষয়টি বুঝতে পারে যে, এই শব ক্ষয় হতে দেরি হবে এবং মোবারক আলি অথবা মফিজুদ্দিন মিয়ার একজন যদি আপস না করে, তাহলে লাশ হয়তো অনন্তকাল ধরে মাটির ওপরেই থেকে যাবে, কবর দেয়া হবে না...তারা যখন বুঝতে পারে যে, এই লাশে পচন শুরু হতে দেরি হবে, তারা মোবারক আলিকে আর চাপ না দিয়ে, মোল্লা নাসিরুদ্দিনকে যাতে ডেকে আনার ব্যবস্থা করা হয়, সে উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র শুরু করে।[২২]

মৃতের ইচ্ছে বা উইশ-সংক্রান্ত লোকবিশ্বাস ও লোকশ্রুতির প্রতিফলন ঘটেছে এই বর্ণনাংশে। সামষ্টিক চৈতন্য, বিশ্বাস ও ক্রিয়ার যে সম্মিলন এখানে রয়েছে তা জাদুবাস্তববাদের প্রচলিত তথা স্বীকৃত বৈশিষ্ট্যের অনুগামী। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় জাদুবাস্তববাদের সফল রূপকার ল্যাতিন আমেরিকান সাহিত্যিক গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের কথা। তিনি ল্যাতিন পরিমণ্ডলের বিশ্বাস-আচারকেই তাঁর এই প্রকরণের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন বলে অনেক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন। তাই তাঁর 'সরলা এ্যরেন্দিরা আর তার নিদয়া ঠাকুমার অবিশ্বাস্য করুণ কাহিনী'র নায়ক উলিসিস যখন এরেন্দিরার প্রেমে পড়ে, তখন তার স্পর্শে যেকোনো বস্তু রঙিন হয়ে উঠছিল। আর এটা দেখেই তার মা ছেলের প্রেমে পড়ার বিষয়টি বুঝতে পেরেছিল। উল্লেখ্য, ল্যাতিন আমেরিকার লোকবিশ্বাসের প্রতিফলনেই প্রেমিক-শনাক্তকরণের এই বয়ন তৈরি হয়েছিল মার্কেজের হাতে। বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষীয় লোকবিশ্বাস এরকম— মৃত ব্যক্তির অপূর্ণ বা শেষ ইচ্ছের অপূরণে তার আত্মা অতৃপ্ত থাকে, তার অশুভ প্রত্যাবর্তন ঘটে, তার লাশ সৎকার করা যায় না বা এতে গ্রামবাসীর অমঙ্গল হয়; কিংবা তার শেষ ইচ্ছে মৃত্যুর পর পূরণ করলে পুণ্য হয় প্রভৃতি। শহীদুল জহির দুলালির অপমৃত্যু, তার অপূর্ণ ইচ্ছে, লাশের অপচনশীলতা এবং গ্রামবাসীর বিশ্বাস ও তৎপরতায় উপর্যুক্ত বর্ণনাংশে এই ভূখণ্ডের লালিত তথা আচরিত উপাদান-সহযোগে জাদুবাস্তবতা নির্মাণ করেছেন।

আট

ডিফেমিলারাইজেশন বা অপরিচিতকরণ উত্তর-আধুনিক সাহিত্যের অনিবার্য দিক। কারণ, কেন একটি টেক্সটকে পূর্ববর্তী টেক্সট থেকে 'পৃথক' বলা হবে, এর উত্তর প্রদান করে এই বৈশিষ্ট্য।

পুরানো শিল্পের নির্যাস নিয়ে একে ভিন্নমাত্রা প্রদান করেও উত্তর-আধুনিক শিল্পের শেকড়ায়ন ঘটানো হয়, তবে তা হয়ে ওঠে পূর্ববর্তী শিল্প থেকে ভিন্ন। উত্তর-আধুনিক সাহিত্য বিশ্লেষণে অতীত থেকে রূপ-রীতি আহরণ করে নতুনভাবে সৃষ্টি তথা অবিনির্মাণ করার পরিভাষা হলো রেট্রো (retro)। এর মূল রিস্টোরেশন। এটি মূলত সাহিত্যের পুনর্জীবন প্রদানকারী প্রক্রিয়া। এই উপন্যাসে ঐতিহাসিক ঘটনার অপরিচিতিকৃত অবিনির্মাণে উপন্যস্ত আখ্যান-উপখ্যানে অনেকগুলো নাটকীয় উপাদান ঔপন্যাসিককে যুক্ত করতে হয়েছে। তদ্‌মধ্যে উপন্যাসের প্রারম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত দেশজ নাট্যরীতির অনুসরণ লক্ষণীয়।[২৩] এই অনুসরণ পুথিপাঠের রীতি-সংস্কৃতিজাত বা তারও পূর্বের যাত্রা কিংবা নাটকের সূত্রধারের ভূমিকাজাত। এই উপন্যাসে সেই সূত্রধার কিংবা পুথি-পাঠক হলো তোরাপ আলি। সে মহির সরকারের বাড়ির বাইরের উঠোনে জড়ো হওয়া গ্রামবাসীকে অকস্মাৎ ঘটে যাওয়া মর্মন্তুদ ঘটনার লৌকিক-অলৌকিক কার্যকারণ বয়ান করে। আর গ্রামবাসী তার বর্ণনা ও ব্যাখ্যার সঙ্গে তাদের আবেগ, কল্পনা ও অনুভূতির যোগাযোগ সৃষ্টি করে। এভাবেই পূর্বকালে পুথির শ্রোতা বা যাত্রার দর্শকগণ তাদের সামনে উপস্থাপিত বিষয়াদির স্বাদ গ্রহণ করতো। উপন্যাসে এই উপস্থাপন-মাধ্যম হলো বয়ানকারীর ভাষা। এই ভাষা সর্বজ্ঞ লেখকের বয়ান থেকে চরিত্রের বয়ানের পার্থক্য তৈরির মাধ্যমে যেমন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে, অপরদিকে তা 'বহুবাস্তব-সমন্বিত দুনিয়াকে সংলাপায়িত'ও[২৪] করেছ। উল্লেখ্য,

> রচয়িতার দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, বহুবাস্তব সমন্বিত বাস্তবতায় বিদ্যমান ভাষাগুলোর জুতসই ইমেজ তৈরি করা এবং এমনভাবে উপস্থাপন করা যেন তাদের বহুমাত্রিক পারস্পরিকতা সম্ভব হয়। বাখতিনের সাহিত্য বাস্তবের হুবহু অনুসরণ নয়, কিন্তু শৈল্পিক বাস্তব আর অনুকৃত বাস্তবের পারস্পরিকতা তাতে রক্ষিত হবে।[২৫]

আলোচ্য উপন্যাসের শুরু সর্বজ্ঞ ঔপন্যাসিকের বয়ানে; ক্রমে তা উপন্যাসের চরিত্রসমূহের বাস্তবতাকে নির্মাণপূর্বক উপন্যাসের এক চরিত্রের উক্তির ভেতর প্রবেশ করে। তারপর আবার তা বয়ান পরিবর্তন করে। এভাবে ঔপন্যাসিক বহুবাস্তব সমন্বিত দুনিয়াকে শৈল্পিকভাবে সংলাপায়িত করেন—

> গ্রামের লোকদের সে রাতের কথা মনে পড়ে এবং তারা সেই চাঁদের বর্ণনা দেয়। আততায়ীদের হাতে ভাদ্র মাসের এক মেঘহীন পূর্ণিমা রাতে সুহাসিনীর মফিজুদ্দিন মিয়া সপরিবারের নিহত হওয়ার পরদিন, গ্রামবাসীদের কেউ কেউ মহির সরকারের বাড়ির প্রাঙ্গণে এসে জড়ো হয়।...মহির সরকারের বাড়ির উঠোনে তারা নির্বাক হয়ে হুঁকো টানে এবং তাদের শুধু পূর্ণিমার সেই চাঁদের কথা মনে পড়তে থাকে। তখন হুঁকোর গুড় গুড় শব্দ এবং খামিরা তামাকের গন্ধের ভেতর ডুবে থেকে তোরাপ আলি কথা বলে, সে বলে যে, আগের দিন সন্ধ্যের সময় সে রাস্তার কিনারায় বেঁধে রাখা গরুর বাছুর ঘরে আনছিল; সে বলে, আমি পরথমে বুইজব্যার পারি নাই, শরীলের মইদ্দে কেমুন যানি ভাব হইবার নিছিল, কেমন যানি ঘোরঘোর নেশার নাহাল, চাইর দিকে কেমন খানি ধুলা ধুলা, কিন্তু ধুলার ভিতরে কেমন খানি ভাব, কেমন যানি রঙের নাহাল ছড়ায়া আছে; আমি তো বুজি না কি, খালি বুজি কিছু একট; তার বাদে যহন ম্যাবাড়ির সামনে আইছি তহন বুইজব্যার পারি আসলে কি; দেহি কি ম্যাবাড়ির মাথাভাঙ্গা আম গাছটার ডাইনে পাশ দিয়্যা পূন্নিমার চান ভাইসা উইঠছে। গ্রামবাসীদের সকলের এই চাঁদটির কথা মনে পড়ে এবং মহির সরকারের উঠোনে বসে তারা বলে যে, তাদের মনে হয়েছিল যেন এক ছিন্ন মুণ্ডুর মতো রক্তাক্ত চাঁদ গ্রামের মাথার উপর দিয়ে গড়িয়ে যায়।[২৬]

নয়

উত্তর-আধুনিকবাদ শহীদুল জহিরের বর্তমান আলোচ্য উপন্যাসসহ সব রচনায় এদেশীয় সমাজ-সংস্কৃতির গভীরে শেকড়ায়িত হয়ে সাহিত্যরূপ গ্রহণ করেছে। এই জাতির গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বয়নকে উপস্থাপনের জন্য তিনি নতুন ভাষা ও কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, পরিচিত পটভূমিকে সাযুজ্যপূর্ণ অথচ অপরিচিত গল্পের মোড়কে হাজির করেছেন। তাই তত্ত্বীয় আরোপে তা ভারবাহী নয়, তত্ত্বীয় নবরূপায়ণে তা প্রাণবাহী। একটি জাতির বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা ও ঘটনাপুঞ্জকে উপন্যাসায়নের সফল প্রকল্প *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল*। অনেকান্ত পাঠের সূত্র ও সম্ভাব্যতায় উপর্যুক্ত আলোচনার উপসংহারে এই টেক্সটকে বাংলাদেশের সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ উত্তর-আধুনিকবাদী টেক্সট হিসেবে অভিহিত করা চলে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ একটি তত্ত্ব হিসেবে উত্তর-আধুনিকবাদ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) পরবর্তী বিশ্বে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-নৈতিক-সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক বিপর্যয় ও সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত। অর্থাৎ অদ্যাবধি ক্রিয়মাণ এই তত্ত্বের বয়স প্রায় পৌনে এক শতাব্দী। উল্লেখ্য, উত্তর-আধুনিকবাদের চর্চার শীর্ষতম সময় ছিল পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহে বিশ শতকের সত্তরের দশক এবং বাংলাদেশে নব্বইয়ের দশক। তত্ত্ববেত্তাগণ এই তত্ত্বকে তীব্র অভিযোজনক্ষম তত্ত্ব হিসেবে বিবেচনা করেন।

২ শহীদুল জহিরের সহপাঠী মোহাম্মদ আব্দুর রশীদের একটি লেখার শিরোনাম 'শহীদুল জহির : মৃত্যু যাকে জন্ম দিয়েছে' (মোহাম্মদ আব্দুর রশীদ [সম্পাদিত] *শহীদুল জহির সমগ্র*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৯০১-৯০৩)। এই লেখায় রশীদ জানিয়েছেন লেখকের স্বভাবসুলভ আত্মমগ্নতা ও প্রচারবিমুখতার ব্যাপারে। তাঁর দেওয়া তথ্যমতে প্রায় অর্ধশতাধিক দেশি-বিদেশি সমলোচক শহীদুল জহিরের সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা করেছেন (২০১৩ সাল পর্যন্ত)। বেশ কয়েকটি ছোটকাগজ, যেমন– শালুক, লোক, উলুখাগড়া, বাংলা জার্নাল (কানাডা থেকে প্রকাশিত) তাঁর মৃত্যুর পর লেখককে নিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে। বিভিন্ন দৈনিকের সাহিত্যপাতায় তাঁর সাহিত্য নিয়ে সমালোচনা ও মূল্যায়ন প্রকাশিত হয়েছে এবং অ্যাকাডেমিক গবেষণাও হয়েছে তাঁকে নিয়ে। ক্রমে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি হচ্ছেন পাঠ্যভুক্তও। এভাবেই নিভৃতচারী এই লেখক তাঁর মৃত্যুর পর হয়ে উঠেছেন জীবিত।

৩ কবি ও সাহিত্য-সমালোচক চঞ্চল আশরাফ বর্তমান উপন্যাসকে পাঠ করতে চেয়েছেন নিওক্রিটিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর 'উপন্যাস পাঠ : সে রাতে পূর্ণিমা ছিল' প্রবন্ধে। তিনি এর কাহিনি, এর অন্তর্গত গল্প, একক ব্যক্তির উত্থান, কাহিনির ভেতর অতিপ্রাকৃত, কাকতালীয় ও রহস্যময় ঘটনার সন্ধান শেষে একে জাদুবাস্তববাদী উপন্যাস বলা যায় কী না—তার উত্তর সন্ধান করেছেন। তবে এই পাঠ গভীর যুক্তিপূর্ণ ও বিশ্লেষণধর্মী নয়—অনেকটা বর্ণনাপ্রধান ও মন্তব্য-অনুগামী। শহীদুল জহির গবেষক শরীফ সিরাজ তাঁর এমফিল গবেষণার গ্রন্থরূপ *শহীদুল জহির : কথাসাহিত্যের বিষয়বৈচিত্র্য ও প্রকরণ (বাংলানামা, ঢাকা, ২০২৩)*-এ এই উপন্যাসকে পাঠ করেছেন মূলত বাংলাদেশের 'স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনৈতিক সংস্কৃতির চিত্র' হিসেবে। তিনি উপন্যাসের প্রথানুগ বিশ্লেষণরীতি মেনে এর কাঠামো তথা গঠন, ভাষা-পরিচর্যার ধরন বিশ্লেষণ করেছেন। আলোচ্য উপন্যাসকে নিয়ে আরো কিছু প্রবন্ধ ও প্রবন্ধাংশ রয়েছে। তবে বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্বগত দিক থেকে সে-সব উল্লেখ ততটা প্রয়োজনীয় নয়।

৪ শহীদুল জহির, *নির্বাচিত উপন্যাস*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০০৭, ব্লার্ব

৫ হিস্টোরিগ্রাফিক মেটাফিকশন (Historiographic metafiction) উত্তর-আধুনিকবাদী আখ্যানের একটি প্রকরণ, যা মূলত লিন্ডা হাচিয়েন কর্তৃক ভাবিত এবং তাঁর *A Poetics of Postmodernism* (London & New York,

Routledge, 1988) গ্রন্থে প্রকাশিত। ঐতিহাসিক ঘটনা ও ঐতিহাসিক চরিত্র এতে মুখ্য, তবে ইতিহাসের বয়ন নয়, ইতিহাসকে গল্পময় করাই এ-ধরনের উপন্যাসের উদ্দেশ্য। কারণ গল্পকে 'গল্প' আকারে প্রকাশ করার দায় থাকে উত্তর-আধুনিক এই ধারার ঔপন্যাসিকের, ইতিহাস একে অবয়ব প্রদানে সহায়ক হয়। হিস্টোরিগ্রাফিক মেটাফিকশনে '*টেমপেরাল ডিসটর্ট*'-এর বহুল প্রয়োগ ঘটে থাকে। এই কৌশলের মাধ্যমে উপন্যাসে একরৈখিক সময়প্রবাহকে পরিবর্তন করা হয়। অর্থাৎ উপন্যাসে সময় প্রবাহে বিচ্যুতি বা বিকৃতি তৈরি করা, যা সাময়িক এবং পাঠকের মধ্যে বিভ্রম তৈরি হতে সাহায্য করে। এই ধরনের উপন্যাসে একজন ঔপন্যাসিক ঘটনার মধ্যে সামনেও চলে যেতে পারেন, পেছনেও নিয়ে যেতে পারেন। ইসমায়িল রিড-এর *ফ্লাইট টু কানাডা*-এ আব্রাহাম লিংকন টেলিফোন ব্যবহার করেছেন। এই কৌশলটি প্রায়ই সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সময়ের ভাঙন এবং আগে-পিছে যাওয়ার কৌশল সিনেমায় আরো বেশি ব্যবহৃত হয়। (মামুন অর রশীদ, *উত্তর-আধুনিকতা*, সংবেদ, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৯২)

হিস্টোরিগ্রাফিক মেটাফিকশনে কখনো ব্যক্তি (যেমন: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের *দি জেনারেল ইন হিজ ল্যাবরিন্থ*—যা মূলত সিমন বলিভারকে নিয়ে রচিত, কখনোওবা ঘটনা (যেমন : রাবিহ আলামেদ্দিনের *কুলাইডস : দ্যা আর্ট অব ওয়ার* উপন্যাসে লেবাননের সিভিল ওয়ারের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে রচিত) ঔপন্যাসিকের হাতে ভিন্নভাবে তথা নতুনভাবে উপস্থাপিত হয়। ইতিহাসের সঙ্গে ঔপন্যাসিকের পর্যবেক্ষণ, জীবনদর্শন, কল্পনা ও গল্প-পরিবেশন-কৌশল এমনভাবে এ-জাতীয় উপন্যাসে মিশে যায় কখনো কখনো ইতিহাস এর প্রভাবে বিভ্রমাত্মকও হয়ে ওঠে, কখনো তা হয়ে ওঠে নিখুঁত, আবার কখনো ইতিহাসের অধিক প্রভাবশালী।

৬ শহীদুল জহির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

৭ শহীদুল জহির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

৮ শহীদুল জহির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

৯ শহীদুল জহির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

১০ মোহাম্মদ আবদুর রশীদ, [সম্পাদিত], *শহীদুল জহির সমগ্র*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৯৪২-৯৪৩

১১ শহীদুল জহির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

১২ শহীদুল জহির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩-৬৪

১৩ উত্তর-আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্য-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বহুব্যবহৃত ও গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিভাষা ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি বা আন্তর্বয়ন। বাংলা ভাষায় উত্তর-আধুনিকবাদ বিষয়ক একজন গ্রন্থপ্রণেতার এই পরিভাষা-সংক্রান্ত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়—

টেক্স্টের ভেতরকার আন্তঃসম্পর্কের পরিস্থিতিকে ইন্টারটেক্সচ্যুালিটি বলা হয়। প্রত্যেক লেখকই অন্য অন্য লেখক বা লেখকের টেক্স্ট দ্বারা প্রভাবিত, এবং প্রত্যেক টেক্স্টই বিভিন্ন টেক্স্টের দিকে উন্মুক্ত। টেক্স্টের ভেতর বিচিত্র উল্লেখ থাকে এবং থাকা স্বাভাবিক; সেই উল্লেখ সর্বদা সুস্পষ্ট নয়, কখনো কখনো সংগোপন ও আচ্ছাদিত; লেখকেরা বিভিন্নভাবে অতিক্রান্ত বয়ানের প্রতিধ্বনি করেন—চেতন কিংবা অচেতনভাবে। পাঠকের কর্তব্য হলো : এই 'আন্তঃপাঠকেন্দ্রিক' সম্পর্কের (ইন্টারটেক্সচ্যুয়াল রিলেশনশিপ) আবিষ্কার ও বিবেচনা। উত্তর-আবয়বিক সমালোচকেরা এমনও বলেছেন যে, আন্তর্বয়ানের সূত্র ছাড়া টেকস্টের অর্থোপলব্ধি ও ব্যাখ্যা অসাধ্য। কেউ কেউ সাহিত্যকাজের সঙ্গে অপরাপর ডিসকোর্সের সম্পর্ককেও 'ইন্টারটেক্সচ্যুয়ালিটি' বলেন : যেমন যোশেফ কনরাডের 'হার্ট অফ ডার্কনেস' উপন্যাসের সঙ্গে সমকালীন ডিসকোর্সের সম্পর্ক। এডওয়ার্ড সাইদ এই ইন্টারটেক্সচ্যুয়াল পদ্ধতিতে কনরাডের উপন্যাস পাঠ করেছেন। (সালাহউদ্দীন আইয়ুব, *সংস্কৃতির জিজ্ঞাসা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৪৪)

১৪ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, *উপন্যাস সমগ্র*, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৫, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬, পৃ. ৭১

১৫ শহীদুল জহির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩-৫৪

১৬ প্যারাডাইম শিফট (Paradigm shift) উত্তর-আধুনিক বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে উদ্ভূত পরিভাষা হলেও তা সমাজ-রাষ্ট্র-আর্থ-রাজনীতি-শিল্প সাহিত্য তথা মানব জীবনানুষঙ্গের সব ক্ষেত্রের বড় ধরনের রূপান্তর বোঝাতে এখন ব্যবহৃত হয়। Thomas Kuhn তাঁর *The Structure of Scientific Revolutions* (1962) গ্রন্থে Paradigm shift সংক্রান্ত ধারণা প্রকাশ করেন।

A Paradigm shift is a fundamental change in the basic concepts and experimental practices of a scientific discipline...Even though Kuhn restricted the use of the term to the natural sciences, the concept of a paradigm shift has also been used in numerous non-scientific contexts to describe a profound change in a fundamental model or events, (Wikipedia)

১৭ চঞ্চল আশরাফ, উপন্যাস-পাঠ : *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল*, অনিকেত শামীম (সম্পাদিত), *লোক*, ২০০৮, পৃ. ২১

১৮ শহীদুল জহির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

১৯ লিন্ডা হাচিয়েনের মতে, উত্তর-আধুনিক আখ্যান মূলত আইরনিতে ভরা বাক্যের সমাবেশ। এই আইরনিতে থাকবে ব্ল্যাক হিউমার (black humar), কিংবা ক্রীড়া (playfulness), যা দেরিদার ক্রীড়াময়তার চিন্তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ এবং রোলাঁ বার্থের দ্য প্লেজার অব দি টেক্সট থেকে উৎসাহ পাওয়া। এই ধরনের ক্রীড়া ও ব্ল্যাক হিউমারের প্রাধান্য রয়েছে জন বার্থ, জোসেফ হিলার, উইলিয়াম গেডিস, কুর্ট ভনেগাট প্রমুখের উপন্যাসে। (মামুন অর রশীদ, *উত্তর-আধুনিকতা,* সংবেদ, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৮৭)

২০ শহীদুল জহির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

২১ শহীদুল জহির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫

২২ শহীদুল জহির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

২৩ বর্তমান টেক্সটকে উপলক্ষ্য করে অতীত টেক্সটের প্রসঙ্গ অবতারণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয় বাখতিনের উপন্যাস-চিন্তা। উত্তর-আধুনিক উপন্যাস বিশ্লেষণে বাখতিন প্রাসঙ্গিক এই জন্য যে আখ্যানতত্ত্ব বিশ্লেষণে আলোচকরা তাঁকেই অনুসরণ করতেন তাঁর অগ্রগামী চিন্তার জন্য। প্রসঙ্গত উদ্ধৃত হতে পারেন দেবেশ রায়– মিখাইল বাখতিন, দস্তয়েভস্কির উপন্যাসের পাঠোদ্ধারের প্রয়োজনে ইয়োরোপের প্রাচীন কার্নিভাল সাহিত্যের কাছে, গ্রিক কমেডির কাছে, মিনপ্পিয়ান নাটকের কাছে ও খ্রিষ্টীয় ইউরোপের স্বীকারোক্তির সাহিত্যের কাছে, (দেবেশ রায়, *উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৩২) গিয়েছিলেন।

২৪ উপন্যাসের ভাষা কীভাবে কাজ করে, এ প্রসঙ্গে বাখতিন এই শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেন।

২৫ মোহাম্মদ আজম, *মিখাইল বাখতিন : যাপিত জীবন, ভাষা ও উপন্যাস*, প্রকৃতি ঢাকা, ২০২০, পৃ. ৬৪

২৬ শহীদুল জহির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩-৫৪

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বিয়াল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩১/ডিসেম্বর ২০২৪

শাহীন আখতারের ছোটগল্প: নারীর স্বর ও স্বরায়ণ

খন্দকার ফারহানা রহমান*

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে স্বতন্ত্র ধারার গল্পকার শাহীন আখতারের ছোটগল্পগুলো মূলত নারী-প্রধান। বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারায় অনেক নারী-প্রধান গল্পের উপস্থিতি থাকলেও নারীর নিজস্ব স্বর সুস্পষ্ট নয়। সে দিক থেকে শাহীন আখতার স্বতন্ত্র। তিনি একই সঙ্গে সমাজকর্মী। নারীর কর্মক্ষমতা, নারী-অধিকার, লিঙ্গবৈষম্য, নারীর শরীরী অধিকার, নারী-সমকাম, তৃতীয়লিঙ্গ– এমন স্পর্শকাতর বিষয়গুলোকে সচেতন শিল্পদক্ষতায় শাহীন আখতার তাঁর ছোটগল্পে রূপদান করেন। নারীবাদের কোনো একক তত্ত্বের ওপর যদিও তিনি নির্ভরশীল থাকেন না, তথাপি আধুনিক নারীবাদী তত্ত্বের একাধিক ধারার অনুষঙ্গে তাঁর ছোটগল্পসমূহকে পাঠ করা যায়। তাঁর রচিত ছোটগল্প বাংলাদেশের সংস্কৃতি-পাঠের ক্ষেত্রেও জরুরি উপাদান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। শাহীন আখতারের ছোটগল্পের ভুবন যে নারীবিশ্বের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটায়, তাতে নারীর কথিত-অকথিত, জানা-অজানা, স্বীকৃত-অস্বীকৃত অসংখ্য বয়ানকে হাজির করে।

চাবি শব্দ: ছোটগল্প, নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব, লিঙ্গবৈষম্য, নারী-অধিকার, নারী-সংহতি।

ভূমিকা

সমকালীন বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে নিজের প্রভাবশালী অবস্থান ক্রমদৃঢ় করে চলেছেন শাহীন আখতার (জন্ম ১৯৬২)। ঐতিহ্যিক মূল্যবোধ, নির্মোহ ঐতিহাসিক পর্যালোচনা এবং গল্প বলার নতুনতর পদ্ধতিতে তাঁর লেখকসত্তা পরিচিহ্নিত। *তালাশ* (২০০৪), *ময়ূর সিংহাসন* (২০১৪), *সখী রঙ্গমালা* (২০১০), *অসুখী দিনে*-র (২০১৮) মতো শৈল্পিকতায় উত্তীর্ণ উপন্যাসে ঐতিহাসিক আবহের প্রাধান্য থাকলেও ছোটগল্পকার হিসেবে শাহীন আখতার সমকালীন ও সমসাময়িক।[১] উল্লেখ্য, শাহীন আখতারের সমকালের পরিধি তুলনামূলক বৃহৎ ও বিশদ। এটি অর্ধযুগ, এক যুগ বা দুই যুগের জীবনকাঠামোয় সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং বাংলাদেশ-পর্বের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পুরো সময়কে ধারণ করে। ফলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের পটভূমি হিসেবে ঔপনিবেশিকতা থেকে স্বাধীনতা, পাকিস্তান রাষ্ট্রের উত্থান-পতন, স্বাধীনতার পূর্বাপর সময় থেকে ঘটমান বর্তমানের রোহিঙ্গা-পরিস্থিতি পর্যন্ত তাঁর ছোটগল্পের পরিধি বিস্তৃত থাকে। তাঁর ছোটগল্পে সমকাল কেবল দৈশিক পরিধিতে আবদ্ধ নয়, বরং আন্তর্জাতিকতাকে ধারণ করে নির্বিবাদে দৈশিক ও বৈশ্বিক। তাঁর ছোটগল্পসমূহের স্থানিক পরিধি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা, জেলা শহর, মফস্বল শহর, ছোটশহর,

* প্রভাষক, স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, ঢাকা

গ্রাম, প্রান্তিক তথা প্রত্যন্ত জনজীবনের সঙ্গে সংলগ্ন। ছোটগল্পে কাহিনি-বয়ানের যে শিল্পভাষ্য নির্মাণ করেন শাহীন আখতার, অন্তর্বাস্তবতা ও বহির্বাস্তবতাসমেত নারীকথন তার বড় অংশ জুড়ে থাকে। বিশ শতকের নব্বইয়ের দশক এবং একুশ শতকের শূন্য ও প্রথম দশকে লেখা শাহীন আখতারের ছোটগল্পে বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনিতে উপস্থিত থাকে বিচিত্র শ্রেণি-পেশা-সামাজিক অবস্থানে জীবনযাপন করা নারীরা। তাঁর ছোটগল্পে উপস্থিত নারীরা গল্পের প্রধান, অপ্রধান বা পার্শ্বচরিত্র হিসেবে এসেছে; তুলনামূলক কম উজ্জ্বলভাবে আসে পুরুষ চরিত্র। বাংলাদেশে ধর্ম ও সংস্কৃতির অনেক উপাদান-উপকরণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপস্থিত হয় শাহীন আখতারের ছোটগল্পে। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যেমন, সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসনের অংশ হিসেবে থাকার অভিজ্ঞতা, দেশভাগের আশাভঙ্গ ও প্রত্যাশা, পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও একাত্তরের স্বাধীনতা অর্জন যুগপৎভাবে এদেশের সমকালীন মানুষের স্মৃতিসত্তায় গভীরভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। শাহীন আখতারের গল্পগুলো এই বৃহৎ সমকালীন সময়বাস্তবতায় জারিত হয়ে ব্যক্তির অভিজ্ঞতামালার এক রঙিন কার্নিভালের রূপ লাভ করে। নারীকথন শাহীন আখতারের গল্পে নির্জলা তাত্ত্বিক নারীবাদী সাহিত্য নয়; ব্যক্তি-মানুষের আনন্দ-বেদনা-সংকট সম্ভাবনার বিপুল ক্যানভাস–যেখানে ব্যক্তি-মানুষটি জেন্ডারের পরিচয়ে একজন নারী। ছোটগল্পে নারীসত্তার সমগ্রতাকে অবলীলায় শৈল্পিক সংহতিতে উন্মোচন করেছেন লেখক। বর্তমান আলোচনায় শাহীন আখতারের ছোটগল্পে নারীর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনবয়ানের দেখা-অদেখা স্বরূপ আলোচিত হবে।

বাংলা সাহিত্যে নারীদের অবস্থান, নারী-লেখক, বিশেষত মুসলমান নারী-লেখকের সাহিত্যচর্চা লেখক শাহীন আখতারের আগ্রহের বিষয়। উপন্যাসে যেমন ঐতিহাসিক সর্বজ্ঞ দৃষ্টির পরিচয় রেখেছেন গল্পকার, ছোটগল্পের কাহিনির বয়ান-কৌশলে এবং চরিত্রের সংকটপূর্ণ জীবনযাত্রার রূপরেখা নির্মাণে তা অটুট থাকে। তথাপি নারীর প্রতি তাঁর সুচিন্তিত ও গভীরতর সহমর্মী সমর্থন স্পষ্ট থাকে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বাঙালি নারীর মানসিক অবদমন রূপায়িত হয়েছে মূলত পুরুষের অভিজ্ঞতা থেকে। তুলনামূলকভাবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারীর প্রভাবশালী অবস্থানের প্রাধান্য আছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নারীরা যেমন: মনসা, বেহুলা, রাধিকার তুলনায় কপালকুণ্ডলা, রোহিণী, চারুলতা, কুমু, বিনোদিনীর জীবনকাঠামোতে প্রকাশিত হয়েছে এমন সব সংকট, যার মধ্যে পৌরুষেয় মানসতার প্রভাব খুঁজে পাওয়া যায় অনেক বেশি। আদি থেকে বাঙালির জীবনাচরণের মধ্যে নারীর অবদমিত অবস্থাকে শনাক্ত করা গিয়েছে। আর্য ও অনার্য উভয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী বাঙালি নারীর অবদমিত অবস্থার কথা ইতিহাসের সুপ্রাচীন কাল থেকে আছে। আদি বাঙালি সংস্কৃতি পরিবার-প্রথার ছকে বেঁধে নারীকে সামাজিক আচারনিষ্ঠার প্রতীকে পরিণত করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নারী' প্রবন্ধে বাঙালি নারীর এই অবস্থার কথা উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথের মতে, সমাজবন্ধনে নারী অগ্রজের ভূমিকা পালন করে। তথাপি সমকালীন ভারতবর্ষে নারীর হীন অবস্থার জন্য কিছু সীমাবদ্ধতাকে সুচিহ্নিত করেছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত উল্লেখযোগ্য:

> তার বুদ্ধি, তার সংস্কার, তার আচরণ নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার দ্বারা বহু যুগ থেকে প্রভাবান্বিত। তার শিক্ষা, তার বিশ্বাস বাহিরের বৃহৎ অভিজ্ঞতার মধ্যে সত্যতা লাভ করবার সম্পূর্ণ সুযোগ পায় নি। এইজন্যে নির্বিচারে সকল অপদেবতাকেই সে অমূলক ভয় ও অযোগ্য ভক্তির অর্ঘ্য দিয়ে আসছে।[২]

বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ-উল্লিখিত এই সীমাবদ্ধতা মূলত সামাজিক অধিকার প্রাপ্তির সীমাবদ্ধতা এবং এই বিশ্বাস অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষের অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ।

সতীদাহ-সহমরণ কিংবা অবরোধ প্রথার মতো যুগজীর্ণ বিষয়ের অবসান হলেও তৃতীয় বিশ্বের বাংলাদেশে নারীবান্ধব প্রতিবেশ এখনো গড়ে ওঠেনি। বাংলাদেশের সংবিধান কর্তৃক নারীর মৌলিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকার নিশ্চিত করা হলেও সমকালীন পরিবার ও সমাজে এর প্রয়োগ দেখা যায় না। বাংলাদেশে নারীর অবদমিত অবস্থান লেখক শাহীন আখতারকে ব্যথিত করেছে। তাঁর ছোটগল্পে ভিড় করেছে পরিবার, সমাজ-প্রতিবেশ ও পেশা-সূত্রে চেনা-শোনা বিচিত্র পরিচয়ের নারীরা। নারীর প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে আধুনিক সময় পরিসরে নারীর বৈষম্যপূর্ণ জীবন-অভিজ্ঞতা ও অবদমিত মানবসত্তার সকরুণ সুরটিকে বিচিত্র স্বরগ্রামে চিহ্নিত করেছেন শাহীন আখতার। পারিপার্শ্বিক জীবনে যে লাঞ্ছনা ও মর্মবেদনা নারীর জীবনে বহুতর প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, তা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে নারীকে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে স্বপ্ন দেখান লেখক। নারী হিসেবে অন্য নারীর প্রতি এই সহমর্মী দায়বোধ শাহীন আখতারের সহজাত শিল্পবোধের মর্মমূল থেকে উৎসারিত। এ প্রসঙ্গে মূল্যায়ন করতে গিয়ে সমালোচক বলেন: 'তাঁর গল্পের সময়, সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, নাগরিক পরিবেশ, নাগরিক মনোলোক, গ্রামীণ ও নাগরিক চরিত্রের নানা বর্ণবৈচিত্র্য ও জীবনের বাস্তবতাকে এমনভাবেই স্পর্শ করেছে – যা তাঁর নিজস্ব সহৃদয়তা ও সৃজনশীলতাকেই প্রকাশ করেছে।'[৩] স্বীয় সমাজ-দেশ-স্বজাতির প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে সাহিত্য সৃজন করেন সমকালীন সাহিত্যিকগণ। ছোটগল্পে শাহীন আখতার নারীর দিকে তাঁর আগ্রহের কেন্দ্রকে নিবদ্ধ রেখেছেন। বিগত শতাব্দী থেকে শুরু করে বর্তমান শতাব্দীর দুই দশক ধরে জারি থাকা রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম ও জাতিসত্তা গঠনের কালে সাহিত্য কলাকৈবল্যবাদিতায় সীমাবদ্ধ থাকতে পারেনি। ফলে আধুনিক সময়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বিচিত্র ঘটনাপঞ্জি এই সময়ের সাহিত্যে বিষয় হিসেবে এসেছে। সমাজ-পরিবর্তনের প্রয়োজন বা সামাজিক বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে একটি সাক্ষাৎকারে শাহীন আখতার বলেন: 'আপাতদৃষ্টিতে থাকতে পারে আবার নাও পারে। সামাজিক দায়বদ্ধতা মোটাদাগের বিষয় নয়। একটা ভালো লেখা থেকে সমাজ নানাভাবে উপকৃত হয়।'[৪] এই মন্তব্যে লেখকের সমাজ-সচেতন সত্তার পরিচয় মেলে। সমকালীন বাঙালি নারীকে সাহিত্যের বিষয় করে তুলে সেই সমাজ-সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন শাহীন আখতার।

বাংলাদেশের সাহিত্যে নারী-পরিস্থিতি

বাংলাদেশের সমকালীন সাহিত্য পর্যালোচনাসূত্রে বলা যায়, উনিশশো সাতচল্লিশের পর থেকে একাত্তর পর্যন্ত বাংলাদেশের সাহিত্যে নারীর যে সামাজিক জীবনের বিবরণ পাওয়া যায়, নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে নিরপেক্ষ বলা যায় না। এদেশের সাহিত্যে সাতচল্লিশ থেকে একাত্তরের উত্তাল রাজনৈতিক বাস্তবতা প্রাসঙ্গিকভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। প্রসঙ্গত রাজনৈতিক পালাবদল এবং জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতি গড়ে ওঠার যুগে ব্যক্তির আচরণ, ব্যক্তির সম্পর্ক, ব্যক্তির মানসিকতা সাহিত্যে কম গুরুত্ব পেয়েছে। একই সঙ্গে পাকিস্তান-পর্বে ব্যক্তির অধিকার ও সচেতনতাবোধের একটি বিশাল দ্বার উন্মোচনের প্রেক্ষাপটও তৈরি হয়। ফলস্বরূপ – বাংলাদেশের সাহিত্যে এদেশের

মানুষের জীবন-সর্ম্পক-মনোলোক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে; সাহিত্যে গুরুত্ব পেতে থাকে নারী। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের পর নারীকে সাহিত্যে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হতে দেখা যায়। বাংলাদেশের সাহিত্য এর মধ্য দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপে পা রাখে। সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায় উঠে এসেছে এ সংক্রান্ত কিছু মৌলিক তথ্য। এই সূত্রে গবেষক ইলোরা সেহেবুদ্দিনের গবেষণাটি তাৎপর্যপূর্ণ:

> In the postpartition era, for political and nationalist reasons, historians of both Pakistan and Bangladesh have largely disregarded the history of East Pakistan. The twenty-four years of united Pakistan (1947-71), however, merit attention for the groundwork laid for future feminist, labor, political, and cultural activism in both countries.[৫]

এই মন্তব্যের সূত্র ধরেও বলা যায়, বাংলাদেশের জন্মের পরবর্তী সময়ে নারীবাদী সাহিত্যের একটি ধারা নিজের সকল সম্ভাবনা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নেয়।

আবহমান বাংলা সাহিত্যে নারীর যে চিত্র দেখা যায়, প্রকৃত নারীকে তাতে পুরোপুরি খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিশেষত আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নারীর ধারণা ইংরেজি সাহিত্য ও ভিক্টোরীয় নারীভাবনা দ্বারা প্রভাবিত। সে তুলনায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে নারীর যে ছবি পাওয়া যায়, তা আধুনিক যুগের তুলনায় ভিন্ন। ধর্মীয় আবর্তের মধ্যে থাকলেও মধ্যযুগের সাহিত্যে নারীকে কিছুটা সজীব মানুষ হিসেবে সাহিত্যে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য:

> তুলনায় মধ্যযুগের কবিদের লেখায় জটিলতা কম, নারীর ব্যাপারে চালাকি বা লুকোছাপার বালাই নেই বললেই চলে। নারীর রূপবর্ণনায়, যৌন-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করায় তারা যেমন দিলদরিয়া, সতীত্ব রক্ষায় তেমন খড়্গহস্ত। সেকালের কাব্যের প্রাণভোমরাই যেন নারী। হালে যে সে কেন্দ্রচ্যুত, তার কারণ কি সাহিত্যিকদের নারীকে অগ্রাহ্য করার পুরুষালি মনোভাব, না ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রভাব – এককথায় বলা মুশকিল। পুরুষের বেশিরভাগ লেখায় নারী আজ শুধু অনুষঙ্গ হয়ে আসে।[৬]

সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নারীর প্রকৃত সত্তা ও অস্তিত্বের সংগ্রামকে সাহিত্যে তুলে আনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধারার নারীবাদী সাহিত্য। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নৈরাশ্যের পেছনে কার্যকর থাকে রাষ্ট্রীয় কিংবা সামাজিক সংঘের ভেতরে থাকা নৈরাজ্য অপরদিকে নারীর প্রতি চলে আসা অনাচারের ভেতরে কার্যরত থাকে বহুযুগের জীর্ণ ও সংকীর্ণতাপূর্ণ পিতৃতান্ত্রিক ঈর্ষা ও শোষণের প্রত্নসত্তা। উল্লেখ্য, এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধারা প্রচলিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের চেয়ে মাত্রাগত পর্যায়ে আলাদা। আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও মানবকেন্দ্রিকতাবাদ নারীর যে আদর্শায়িত রূপমূর্তি তুলে ধরে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। নারীর এই চিত্রকে খণ্ডিত বা আংশিক বলাটা সমীচীন। এই সূত্রে আনিসুজ্জামানের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য:

> বাংলা সাহিত্যে নারীর যে প্রতিকৃতি অঙ্কিত হয়েছে, তা বহুবর্ণ ও বহুমাত্রিক, তা দ্বন্দ্ব ও সংঘাতময়, তা ভালোবাসার রঙে ও ঘৃণার তুলিতে আঁকা।
>
> নারীর যে-ভাবমূর্তি আমাদের সাহিত্যে দেখা যায়, তা বহুলাংশে পুরুষের সৃষ্টি। পুরুষ শুধু নিজের চোখ দিয়ে নারীকে দেখেনি, কী দৃষ্টিতে নারী পুরুষকে অবলোকন করেছে, পুরুষ সম্পর্কে, নিজের সম্পর্কে জগৎ সংসার সম্পর্কে নারী কী ভেবেছে, অধিকাংশক্ষেত্রে তা ব্যাখ্যা করেছে পুরুষই। নারীর নিজস্ব জগতের খতিয়ান এবং নারীর নিবিড়তম অনুভূতির পরিচয় পুরুষ লিখে এসেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। তা যে নারীর জীবন ও ভাবজগৎকে বড়ো রকমের প্রভাবিত করেছে, তাতে সন্দেহ নেই। নারী যখন নিজের কথা বলতে শুরু করেছে, তখন পুরুষের লেখা থেকে তার জানা হয়ে গেছে, ভালোবাসলে, ঘৃণা করলে, কষ্ট পেলে, দুঃখ দিলে নারীর অনুভূতি কেমন হয়।[৭]

এভাবে বাংলা সাহিত্যে নারীর আবেগানুভূতির যে চিত্র পাওয়া যায়, তাতে নারীর বাস্তব চিত্র অনুপস্থিত। বরং নারী সম্পর্কে একটি বিপরীত বয়ানকেই পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ যখন নানা ভাঙন-পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে একেবারেই স্থিতিশীল নয় – এরূপ একটি সমাজে বসবাসকারী নারীর জেন্ডার-সীমাবদ্ধ জীবনবাস্তবতা নানাভাবে বিপর্যস্ত ও শূন্যতা-আক্রান্ত। সমকালীন নারীর বাস্তবচিত্র সাহিত্যে তুলে আনতে সচেষ্ট শাহীন আখতার। শাহীন আখতারের ছোটগল্পের নারীরা প্রচলিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বয়ান পদ্ধতিতে দেখানো নারীরূপ থেকে স্বতন্ত্র।

নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব

নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব নারীবাদের অংশ। নারীবাদী সাহিত্যধারাকে বাংলা সাহিত্যে তুলে আনছেন বেশ কয়েকজন প্রথিতযশা নারী-লেখক।[৮] বাংলাদেশের নারী-লেখকমাত্রই (Women writer) নারীবাদী লেখক (Feminist writer) নন; তথাপি এই লেখকদের লেখায় নারীর জীবন বিস্তৃত পরিস্থিতিসহ উপস্থিত থাকে, যা পুরুষ-লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যসহ চিহ্নিত করা যায়। এঁদের লেখায় নারীর কণ্ঠস্বরকে স্পষ্টগ্রাহ্যভাবে অনুধাবন করতে পারে পাঠক। ফেমিনিস্ট সাহিত্যিকদের সম্পর্কে বলা হয়:

> Generally, then, the female writer is seen as suffering the handicap of having to use a medium (prose writing) which is essentially male instrument fashioned for male purposes. ... If normative language can be seen as some way male-oriented, the question arises of whether there might be a form of language which is free from this bias, or even in me way oriented towards the female.[৯]

আরও উল্লেখ্য, ইংরেজি সাহিত্য উনিশ ও বিশ শতকের দীর্ঘ সময় জুড়ে নারীর স্বাভাবিক জীবনের বিপরীত বয়ানকে বর্ণনা করে গেছে। নারীবাদী লেখকদের একটি বড় অংশ নারীর কথা সাহিত্যে তুলে আনতে নারী-লেখকদের আহ্বান জানিয়েছেন। এই নতুন ধারার সাহিত্য নারীর অস্তিত্বকে স্বীকার করে পুরুষতান্ত্রিকতার বিপরীতে নারীর বৈচিত্র্যপূর্ণ বাস্তবতাকে সাহিত্যে তুলে আনতে সক্ষম। খোদ ইংরেজি ভাষার সাহিত্যেও নারীর কণ্ঠস্বর পূর্ণাঙ্গ ও যথেষ্টরূপে পাওয়া যায় না। যে কারণে বর্তমান ইংরেজি সাহিত্যে নারীর কণ্ঠস্বর চিহ্নিত করার চিন্তাটি সজোরে আলোচিত হচ্ছে:

> In order to write about women writers, and remain respectable as In critics, a new definition of literature was going to have to be established. 'English' needed a new map. On top of that, it requires a different conception of the practice of criticism to take the sex of the author into consideration.[১০]

সমকালীন বাংলাদেশের নারীবাদী লেখকদের মধ্যে বৈচিত্র্যে ও স্বাতন্ত্র্যে শাহীন আখতার প্রাতিস্বিক। জীবনঘনিষ্ঠ লেখক শাহীন আখতার তাঁর *গল্পসমগ্র-১* উৎসর্গ করেছেন তাঁর নিজের চেনাজানা জগতের সৃজিত চরিত্রসহ অনেক নারীকে, যারা তাঁর অভিজ্ঞতালোকে স্মৃতিচ্ছায়া হয়ে মিশে থাকে। এই নারীরা মূলত সাধারণ মানুষ। এদের জীবন চিরচেনা হলেও সাহিত্যে অনুচ্চারিত বলে অচেনা। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারকাঠামোতে ভূমিনির্ভর স্মৃতিসত্তার উত্তরপ্রজন্ম বাংলাদেশে নারী জনগোষ্ঠীর বর্তমান সামাজিক অবস্থান ও অবস্থা মূলত কী এবং কীই-বা তার মনোজগতের অবস্থা ও মানবিক

উপলব্ধি, এসকল বিষয়ের খোঁজ-খবর পাওয়া যায় শাহীন আখতারের গল্পে। বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোতে বহু সংস্কৃতির মিশ্রণে বিস্তর আচার-নিষ্ঠা ও কায়দা-কানুন প্রচলিত। সেসব আচার নিষ্ঠায় নারীকেই একনিষ্ঠ থাকতে হয় বেশি। ঐতিহ্যিকভাবে কুসংস্কার-মর্মমূলগত মানুষেরা এখানে পরিবার ও সমাজের রক্তচক্ষু প্রদর্শন-পূর্বক নারীকে অবদমিত ও বাধ্যগত করে রাখে। নারীর প্রতিভার অবমূল্যায়ন করে চূড়ান্তভাবে। এই বাস্তবতা মেনেই বাঙালি নারীকে জীবন-যাপন করতে হয়েছে। আধুনিক কালে যেখানে নারীমুক্তি, নারী-স্বাধীনতার মতো শব্দগুলো সুপরিচিত হলেও দূরাগত, সেখানে বাংলাদেশের নারীরা যে-সকল সংকট-সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে তা গল্পে তুলে ধরেন গল্পকার। এই প্রক্রিয়ায় নারী অস্তিত্বের বিপুল পরিসর নিয়ে কাজ করেন শাহীন আখতার।

পেশাজীবী নারী

বাঙালি নারীমাত্রই পরিশ্রমী। সাহিত্য ও চিত্রকলায় নারীর যে ছবি আছে, তাতেও অবসরযাপন দেখা যায় না। অবসরযাপনের চিত্রে নারীকে সূচিকর্ম ও হস্তশিল্প প্রভৃতিতে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। লোকগাথা, পালাগান, ব্রতকথায় গৃহী নারীর দক্ষ কর্মব্যস্ততার স্বরূপ দেখা যায়। শাহীন আখতারের ছোটগল্পের নারীরা প্রায় সকলেই পেশাজীবী এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। 'শাহীন আখতারের গল্পে থাকা অনেক নারী চরিত্রই পেশার সঙ্গে যুক্ত। তাদের পেশা সম্মান কিংবা অসম্মানের যাই হোক না কেন তারা কর্ম করে খায়। জীবিকা অর্জনের সঙ্গে নিজেরা যুক্ত।'[১১] অস্তিত্বরক্ষার দাবিতে খেটে-খাওয়া দরিদ্র নারীর রূপায়ণ আছে শাহীন আখতারের গল্পে। নারীর কর্মীসত্তাকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ছোটগল্পে আলোকিত করেছেন শাহীন আখতার। স্বল্প-আয়ের নারীদের অনেক উদাহরণ আছে তাঁর গল্পে। প্রাচীন মূল্যবোধ অনুসারে 'সতী-নারী'কে কেবল শারীরিক শুদ্ধাচারেই যথেষ্ট হলে চলে না; তাঁকে কর্মদক্ষও হতে হয়। পরিবার, সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে স্বীকৃতি ও প্রাধান্য অর্জন করার উপায় হিসেবে বাঙালি নারীকে হতে হয় অধিকতর দক্ষ। প্রাচীন সংস্কৃতিতে বাঙালি নারীর বিস্তৃত কর্মকুশলতা প্রমাণসিদ্ধ; যার দৃষ্টান্ত মেলে ছড়া, বচন, রূপকথা-উপকথা, ধাঁধা প্রভৃতি লৌকিক ও মৌখিক সাহিত্যে। নারী কেবল দৈহিক মানদণ্ডে শুদ্ধ হলেই সে সতী নয়, তাকে কর্মদক্ষও হতে হয়। সামাজিক স্বীকৃতি ও পরিবারের ভালোবাসা অর্জনের লক্ষ্যে নারীকে সতীলক্ষ্মীও হতে হয়। প্রাচীন বাঙালি সংস্কৃতিতে নারীর কর্মকুশলতার পরিচয় আছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়:

> আদি সংস্কৃতিতে কোনো কাজই তুচ্ছ বা উচ্চ – এভাবে বিভক্ত ছিল না। নারী-পুরুষের কাজ ছিল প্রয়োজনমাফিক বিভক্ত যাকে division of labour বলা চলে। কিন্তু উৎপাদকর্ম থেকে নারী ক্রমে সরে যেতে থাকে, তাকে সরিয়ে দেয়া হতে থাকে। সে হয়ে পড়ে প্রান্তবাসী। ... নারীর কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হলেই সংস্কৃতি বিচিত্ররূপে বিকশিত হতে পারে – উৎপাদন কাজে এবং শিল্পসাহিত্য জগতে – দুই ক্ষেত্রেই।[১২]

কৃষিসভ্যতায় নারীর সম্মানজনক অংশগ্রহণের ঐতিহ্য পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় অনেকক্ষেত্রে বেহাল ও বেহাত হয়ে পড়ে। পরিবারে পুঁজি ও অর্থ জমা হয় প্রধানত পুরুষের হাতে। এবং এর মধ্য দিয়ে নারীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অতীতের চাইতে সীমাবদ্ধ হতে দেখা যায়। আদিম প্রকৃতিনির্ভর সংস্কৃতিতে নারী সমাজ-সংসারের কর্তৃত্বের ভূমিকায় থাকলেও পুঁজিবাদী সমাজে সে-অবস্থান থেকে বিচ্যুত। নাগরিকতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামন্ত থেকে পুঁজির পথযাত্রায় নারী প্রকৃতির মতো ব্যবহৃত ও নির্যাতিত হতে হতে ক্রমশ মূল্যহীন হয়ে পড়ে। নারীর ওপর পুরুষ-আধিপত্যকে

অনেকক্ষেত্রে দেখা হয় প্রকৃতির ওপর আগ্রাসন হিসেবেও। 'একালে মাতৃতন্ত্রের ক্ষমতা যখন পুরুষতন্ত্রের হাতে চলে গেছে, তখন, ভোগবাদী পুরুষতন্ত্র পুঁজিবাদী সংস্কৃতি নারী ও প্রকৃতিকে একইসঙ্গে নিজের অধস্তন ভাবতে শুরু করেছে। এবং শুধু অধস্তনই নয়, কখনও কখনও নিসর্গের প্রতি তার ইতিবাচক ভূমিকার ওপরও নির্বিচারে চালানো হয়েছে বর্বরোচিত আক্রমণ।'[১৩] বাংলাদেশের বাস্তবতার ক্ষেত্রেও এই শনাক্তি প্রযোজ্য। বাংলাদেশে অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হলেও মিশ্রপুঁজির প্রভাবে গ্রামীণ নারীর কাজ অর্থনৈতিক মূল্য পায় না। অনেক ধরনের অর্থনৈতিক তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত থাকা নারী অর্থমূল্য ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা – উভয়দিক থেকে বঞ্চিত হয়।

নারীর কর্মকে সেবার রূপ থেকে অবমুক্ত করে কর্মী-সত্তার পরিচয় চিহ্নিত করতে চান শাহীন আখতার। 'আস্‌তান' গল্পের বিন্দুবালা সৌন্দর্যপেশায় নিয়োজিত একজন কর্মী। বিন্দুবালা চরিত্রে গল্পকারের বিশ্লেষণী দক্ষতায় একজন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিধবা শ্রমজীবী কর্মনিষ্ঠ মায়ের বর্ণনা আছে। গল্পে বিন্দুবালার স্বগতোক্তিতে বাধ্য হয়ে সামাজিকভাবে অগ্রহণীয় পেশায় কাজ করার দুঃখবোধ প্রকাশিত হয়: 'দুঃখে দুঃখে জীবনডা গেল। একদিনের তরেও সুখ পাইলাম না। ... বিধবা মানুষ, মাছ-গোস খাই না, শরীর ঘাঁটাঘাঁটি করি, আল্লাহ মাফ করব – কষ্টের কামাইর পয়সায় একটা এতিম বাচ্চা বড় অইতাছে।'[১৪] বিন্দুবালার এই দুঃখবোধ কৈফিয়তের মতো শোনায়। গরিব-সর্বহারা বিন্দুবালা নিজের বহুস্তরিক নিরস্তিত্বের যাতনার প্রশান্তিরূপে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখে। বিন্দুবালা একজন পেশাজীবী শ্রমিক নারীর প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র। পেশাজীবী নারীকে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্নের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেন লেখক। একই সঙ্গে নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির সামাজিক স্বীকৃতির জন্য ইতিবাচক মনোভঙ্গি তৈরি করেন। 'পুষ্পবাগ আবাসিক এলাকা' গল্পের কাহিনি আবর্তিত সৌন্দর্যপেশায় নিয়োজিত ম্যাসেজকর্মী নারী বাসন্তীকে কেন্দ্র করে। 'মেকআপ বাক্স' গল্পের পোশাক-শ্রমিক মল্লিকা, 'গল্পের গোলকধাঁধা' গল্পের শরাবন, 'প্রেততর্পণ' গল্পের নামহীন মেয়েটি, 'দিনের রূপসী' গল্পের নারীরা, 'ভার্জিন মেরির আত্মহত্যা' গল্পের মনোয়ারা বেগম ও তাহমিনা, 'মধুপূর্ণিমার রাত' গল্পের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক মানসিক রোগগ্রস্ত ইসমত ও তার বন্ধুরা, 'হাতপাখা' গল্পের সাংবাদিক গল্পকথক – এরা প্রত্যেকেই কর্মজীবী নারীর প্রতিনিধিত্ব করে। নারীর প্রচলিত রূপনির্ভর ও আদর্শায়িত বিবরণকে শাহীন আখতার সচেতনভাবে এড়িয়ে নারীর নিজস্ব স্বর নির্মাণে নিবিষ্ট। নিম্নবিত্ত, মধ্য কিংবা উচ্চবিত্ত প্রতিটি অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবারেই নারীকে স্বকীয়তা ও মুক্তি অর্জনে সংগ্রামশীল থাকতে হয় যার বিবরণ পাওয়া যায় এসব ছোটগল্পে।

এদের মধ্যে অনেকেই রাজধানী ঢাকার শিক্ষিত ও নাগরিক অভিজাত পরিসরে বসবাস করে। 'শিস' গল্পের ফ্রিল্যান্সার সাংবাদিক মীরা, 'তাজমহল' গল্পের কলেজ শিক্ষিকা রোশনি, 'ঠান্ডা চা' গল্পের হোস্টেল সুপার রোজি, 'ইদ্দতকাল' গল্পে কর্মসফল কর্পোরেট চাকুরে মিনা – এরা প্রত্যেকে কর্মজীবী স্বাধীন শাহরিক নারী। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সূত্রে জীবনযাপনের স্বাধীনতাকে অন্বেষণ করেছে তারা। তবে দুর্ভাগ্যজনক যে, অর্থনৈতিক ক্ষমতা পুরুষকে ক্ষমতাস্তরের শীর্ষে স্থাপন করলেও নারীর ক্ষেত্রে তার ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। বহুপ্রথা-জর্জরিত বাঙালি সমাজকাঠামো নারীকে নানা জায়গা

থেকে দমিত করে রাখতে উদ্যোগী। শাহীন আখতারের ছোটগল্পে সামাজিক তুল্যমূল্য ও বিচারকাঠামো অনুপস্থিত থাকে; ব্যক্তি হিসেবে নারীর মানসিক ও মানবিক সংকট মুখ্যতা পায়। সমাজকে অস্বীকার করার প্রেষণা থেকে এখানে প্রচলিত সামাজিক সংকটের অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর পেশাজীবী নারীকেও তাই অন্তর্গত বিভঙ্গভাবনায় প্রতিনিয়ত দীর্ণ হতে দেখা যায়। নারীর সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের বিকল্প নেই। নারী ও পুরুষের সম্মিলিত সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়েই নারীর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটতে পারে–এই সুচেতনাবোধ থেকে শাহীন আখতার তাঁর গল্পের নারীদের পেশাজীবী মানুষ হিসেবে সৃজন করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। পাশাপাশি মর্যাদাপূর্ণভাবে বাঁচতে চাওয়ায় জীবনের বাঁকে বাঁকে উপস্থিত লাঞ্ছনার মর্মবেদনা, নৈরাশ্য ও নৈঃসঙ্গ্যের বহুমাত্রিক বিবরণ প্রদান করেন শাহীন আখতার। ছোটগল্পের বিষয় হিসেবে নারীর ব্যক্তিত্ব ও সংকটকে বাছাই করার পেছনে লেখকের নারীবাদী সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি অপ্রকাশিত থাকে না। গল্পগুলোতে স্বাধীন মানুষ হিসেবে আত্মপরিচয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জনে নারীকে সহযোগিতা করার প্রেষণা স্পষ্ট।

নারীর জন্য নারী

শাহীন আখতারের ছোটগল্পে নারীকথনের শিল্পভাষ্যে নারীর প্রতি সহমর্মিতাবোধের বর্ণনা আছে। নারীর প্রতি নারীর বিদ্বেষমূলক ও নিপীড়নমূলক আচরণের উদাহরণ সমাজ ও সাহিত্যে প্রচুর। বাংলা রূপকথা, ছড়া, ব্রতকথায় নারীর বিরুদ্ধে নারীর অবস্থান গ্রহণের চিত্র পাওয়া যায়। এতে করে বাংলা সাহিত্যে নারীর একটি প্রতীকী চিত্র চিহ্নিত হয়ে আছে, যেখানে মূল্যায়নের মানদণ্ডগুলো আগে থেকেই নির্ধারিত। পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামোর ভেতরে বসবাসরত নারী ও পুরুষ উভয়ই পিতৃতন্ত্রের ক্ষমতায়নের সৈনিক হিসেবে কাজ করে। নারী হিসেবে নিগৃহীতরাও নিজেদের অধিকার ও ক্ষমতায়নের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বা ছদ্মবেশে কাজ করে যায়। নারীর সীমিত ও পরিমিত অধিকার রক্ষার পুরুষ-আধিপত্যমূলক প্রচলিত বয়ানে ক্রিয়াশীল প্রতিক্রিয়াবাদী সামাজিক ধারণার বিপরীতে বিকল্প নারীবাদী নন্দন হিসেবে নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব নারীর শরীর ও জীবনঅভিজ্ঞতার নারীবাদী বয়ান প্রদান করে, যেখানে আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে নারীর বিরুদ্ধে নারীর অবস্থানের বিপরীত ভাষ্য নির্মিত হয় এবং উচ্চকিত হয় নারীর প্রতি নারীর প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থান। শাহীন আখতারের ছোটগল্পে দেখা যায় সংকটের পাঁকে আটকে পড়া নারীর প্রতি সহমর্মী হাত বাড়িয়ে দেয় অন্য কোনো এক নারী। নারী-সংহতি মেয়েদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে একত্র করে এবং সমাজে প্রচলিত পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। নারীর শ্রম, আবেগ অথবা শরীর ব্যবহৃত হওয়ার বিরুদ্ধে এটি কথা বলে; নারীর প্রতি সহিংসতা, বৈষম্য এবং জেন্ডার-বৈষম্যের নানা প্রান্ত নিয়ে সোচ্চার হয়।

শাহীন আখতারের ছোটগল্পে একজন নারীর প্রতি সংহতি প্রকাশক দ্বিতীয় নারীটি কখনো বোন, মাতা, কন্যা, আত্মীয় অথবা বন্ধু, যার সঙ্গে মেলে তার অস্তিত্বের মূল স্বর। 'মেকআপ বাক্স' নারীর প্রতি নারীর মমত্ববোধের কাব্যময় বিবরণ। একটি সামান্য মেকআপ বাক্সের মোহে পড়ে দরিদ্র কিশোরী মালা গৃহ ত্যাগ করে এবং পরিপার্শ্বের নিবিড় ষড়যন্ত্রে দেহবৃত্তিতে যুক্ত হয়ে পড়ে। পাঁচ

বছরের মধ্যে খুন হয় সে। দেহবৃত্তি ব্যাপকভাবে নিন্দিত হলেও পেশা হিসেবে অবৈধ নয়। এর ভোক্তাসমাজ স্বীকৃতি পায়, অথচ সকল ঘৃণা ও অসম্মানের অধিকারী হয় নারীদেহশ্রমিক। সমাজের চোখে অপাঙ্‌ক্তেয় মালার খুন হওয়া নিয়ে লেখক স্বল্পবাক থাকেন। মালার বড়বোন পেশায় পোশাকশ্রমিক মল্লিকার প্রেক্ষণবিন্দু থেকে গল্পটি বর্ণিত। লেখক মল্লিকার শোকবিহ্বল মর্মবেদনা বর্ষার প্রকৃতির মধ্য দিয়ে চিত্রায়িত করেছেন এভাবে– 'বেশ্যার কবর হয় না–মল্লিকা তা জানতো না'। অস্তিত্বচেতনার নির্জ্ঞান স্তরে ভগিনীত্ববোধের তাড়না ও মর্মপীড়া অনুভব করেছে সে। পাঁচ বছর যে বোনের সঙ্গে দেখা হয়নি, যোগাযোগ হয়নি, মৃত্যুর পর কল্পিত সংলাপে, স্মৃতিকথায় আর মনোলগে সেই বোনের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। মৃতা পতিতার কবর নিয়ে সমাজের লোকের ভীষণ বিরূপতার মধ্যেই সেই মৃতা বোনের সৎকারের দায়িত্ব নেয় মল্লিকা। নিজের দরিদ্র সামাজিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে বোনের মানবিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করতে থাকা মল্লিকা এক সহমর্মী ও সমানুভূতিশীল মানুষ:

> মল্লিকা নিজেও আর বুঝতে পারে না, এই লম্বা পথ বেহেশত না দোযখে যাওয়ার। হাতে ধরা যে লণ্ঠন, একসময় এর তেল ফুরিয়ে আসে। সে তবুও নিশাচরের মতো রাতের অন্ধকারে বোনের লাশ বয়ে নিয়ে যায় এক কবরস্থান থেকে আরেক কবরস্থানে।[১৫]

দরিদ্র ও সমাজচ্যুত মৃত বোনের প্রতি মল্লিকার মমত্ব ও অধিকারবোধ নারীর প্রতি নারীর সংহতি প্রকাশের উত্তম দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। নিম্ন-আয়ের মানুষের অলিখিত ইতিহাসকে ছোটগল্পে রূপদান করেন শাহীন আখতার। এক নারীর শারীরিক অসুস্থতাজনিত নৈঃসঙ্গ্যবোধ ও মানসিক রোগের সিজোফ্রেনিক অবস্থার মধ্যে বোনের সঙ্গে কাল্পনিক দেখা-সাক্ষাৎ নিয়ে গল্প 'বোনের সঙ্গে অমরলোকে'। অত্যন্ত অসুস্থ নারীটির মৃত্যুচেতনা যখন প্রতিনিয়ত তার জীবনীশক্তিকে আরও কমিয়ে আনছে, তখন কাছের মানুষ বা একান্ত আপনজন রূপে ছোটবোনের আগমন ঘটে। জীবন ও মৃত্যু যখন সূত্রবদ্ধ গণিতের মতো, তখন অবাস্তবের বর্ণনা গল্পের শিল্পকাঠামো নির্মাণ করে। এখানে নারীর জীবন সংকটের অন্ধকারে বলয়িত। একের মৃত্যুও যখন অপরদের কাছে মূল্যহীন, তখন নিস্পৃহতা, বৈরাগ্য ও নৈরাশ্যই হয়ে ওঠে ব্যক্তি-নারীর মৃত্যুদর্শনের স্বরূপ। প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষারত নারীর কফিনাকৃতির আয়তকার ঘরে ছোটবোনের অলৌকিক আবির্ভাব ঘটে। যে মৃত্যুর অপেক্ষায় নারীটির জীবন বিষিয়ে উঠেছিল, ছোটবোন স্বভাবসুলভ দুর্বিনীতপনায় সেই মৃত্যুকেই ভুলিয়ে রাখতে পারে:

> আমার মৃত্যু-ভাবনার পাশ কাটিয়ে, আলগোছে পা ফেলে আমার বোন চুলার কাছটায় চলে যায়। চাল-ডালের কৌটো, মশলার ডিব্বা নেড়েচেড়ে খানিক বাদে খিচুড়ি বসায়। আমি নাক-মুখ বালিশে গুঁজে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে থাকি। এ কী আপদ! আমাকে আমার মতো থাকতে দেবে না দেখছি।[১৬]

পরিবার ও দাম্পত্য থেকে পরিত্যক্ত, সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তি জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কল্পিত বোনকে আশ্রয় করে একটু স্বস্তিতে মরতে চেয়েছে মল্লিকা। কল্পিত বোনের সঙ্গে নিজের নিবিড় দুঃখের আলাপ করতে পারে মৃত্যুপথযাত্রী বোন। নিজের রোগগ্রস্ততার গভীরে থাকা নিরস্তিত্বের যাতনা ভাগ করে নিতে পারে। বোনের শ্লেষাত্মক প্রশ্নের ভাষায় জীবনের সফলতা-ব্যর্থতার হিসাবে বসে তার মনে হয়: 'আমরা মৃত্যুময় স্থবির পারিপার্শ্বিক বদলাতে, ডাক্তাররা যা করতে পারেনি,

আমার বোন তা পেরেছে। আমাকে সঙ্গে নিয়ে অমরলোকের উদ্দেশে ও বেহুলার ভেলা ভাসিয়েছে।'[১৭] মনসামঙ্গলের বেহুলাও এক স্বতন্ত্র-সাহসী নারী, যে হতাশা ও মৃত্যুর বিপ্রতীপে আশার ভেলা ভাসিয়েছিল। গল্পে নৈঃসঙ্গ্য-আক্রান্ত বিপন্ন নারী অবচেতনে খুঁজে নিয়েছে অন্য এক নারীর সাহচর্যপূর্ণ আশাবাদ, যার বাস্তব ভিত্তি নেই। গল্পের শেষ পর্যায়ে প্রকাশিত হয় অমরলোকে যার পিছনে সে যাত্রা করছে, স্নেহের ছোটবোনের রূপধারী সত্তাটি কথক নিজেই। এই আবিষ্কার তার অলঙ্ঘনীয় মৃত্যুযাত্রার শেষচিহ্ন। সমাপ্তিতে এই প্রশ্ন থেকে যায়, একা একা স্বাধীনভাবে যে নারী থাকে, প্রকৃতপক্ষে সে কতটা স্বাধীন। স্বাধীনতার সামাজিক অস্বীকৃতি যন্ত্রণা দেয় নারীটিকে। স্বাধীনতার আনন্দের চেয়ে গল্পে বড় হয়ে দেখা দেয় নিঃসঙ্গ মানুষের মর্মযাতনা। ছোটবোনের কণ্ঠস্বর কখনো স্নেহময়, কখনো সমাজের কর্কশ কণ্ঠ হয়ে নারীটির সতীত্ব ও নৈতিকতার বিষয় নিয়ে কথা বলে; কখনো তার অস্তিত্বের সংকট নিয়ে আলোচনা করে নারীটির জটিল যাপিত জীবনঅভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মনোলৌকিক অপ্রকৃতিস্থতার বাহক হয়। ভিন্ন ধর্মের একজনকে বিয়ে করায় সে পরিবারে ও সমাজে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। বিড়ম্বনাপূর্ণ দাম্পত্য সম্পর্কটি ভেঙে গেলে প্রবল একাকিত্ব ও আত্মিক বিপন্নতার মধ্যে দিয়ে অসুস্থতার ক্রমমৃত্যুময় পথে যাত্রা করেছে সে। জীবনের আশা কেউ ত্যাগ করতে চায় না, কল্পিত বোনের প্রথম সংলাপ থাকে – 'আসলাম। আমি বাঁচতে চাই আপা!' মৃত্যু ও বেঁচে থাকার পরস্পর বিপরীত স্রোতে নারী আকাঙ্ক্ষা করেছে এক সহমর্মী স্বজন। অমূলক প্রত্যক্ষণ ও বিভ্রমের (Illusion) মধ্য দিয়ে বিপন্ন ও বিষণ্ন মানুষের শেষ পরিণতিকে এক পরাবাস্তব আবহপূর্ণ শিল্পসৃষ্টির ছাঁচে নির্মাণ করেছেন গল্পকার। 'ভার্জিন মেরির আত্মহত্যা' গল্পে নারীর প্রতি নারীর সহমর্মী অবস্থানে থেকে অন্যদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করে মেয়েদের প্রতি সম্পৃক্তি প্রকাশ করে ক্রমশ নিরস্তিত্বের পথে যাত্রা করে তাহমিনা। পেশায় তাহমিনা একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। তার কাছে একাউন্ট করতে আসা ডলির অবদমিত জীবনের দুঃখকষ্টের প্রতি তার সংবেদনশীলতা প্রকাশ পায়। স্বহননের মধ্যে দিয়ে নারীর প্রতি বিরূপ বিশ্বকে ডলির মতোই প্রত্যাখান করে তাহমিনা। নারীর অস্তিত্বের গল্পগুলো এভাবেই শাহীন আখতারের লেখায় নারীবাদী সাহিত্যের চেয়েও বেশি কিছু সংকটাপন্ন বিবরণ প্রদান করে। ডলির মৃত্যু হলে এক প্রচণ্ড নিরস্তিত্ববোধ তাহমিনার অস্তিত্বকে সংকটিত করে তোলে। এই বিপন্নতাবোধের উৎস কেবল ডলির আত্মহনন নয়; বরং নিঃসঙ্গতা এবং সামাজিক অধিকারহীনতার জীবনযাপনের প্রতি শ্লেষাত্মক অস্বীকৃতি।

নিজ শরীরঃ নারীর অধিকার

শরীরের ওপর নারীর আত্মঅধিকার প্রতিষ্ঠার দাবির প্রশ্নটি এখন আর নতুন নয়। নিজ শরীর কিশোরী-তরুণীর কাছে যেন একটি নিষিদ্ধ বস্তু, যা নিয়ে কথা বলা বাঙালি সমাজে এক প্রকার ট্যাবু। সতীত্বই তার আত্মমর্যাদার প্রধান মানদণ্ড – এরূপ ধারণা মেয়েদের জন্য তৈরি করা আছে। নারীর শরীরী দাবির প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির বিষয়ে নারীর নীরব থাকাই যেন নিয়ম। প্রণয় ও নারীদেহ নানাভাবে এলেও বাংলা সাহিত্যে এই বিষয়গুলো তুলনামূলকভাবে অনালোকিত। পুরুষ-লেখকের অভিজ্ঞতার স্থান থেকেই বিষয়গুলোকে বিবেচনা করা হয়েছে। নারী-শরীরের ওপর পুরুষাধিপত্য,

সন্তান-জন্মদান প্রক্রিয়ায় নারীর ব্যক্তিগত আগ্রহ-অনাগ্রহের চেয়ে পারিবারিক ঔচিত্যবোধ ও সামাজিকভাবে প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি সাহিত্যে। নারীবাদী সাহিত্য সমাজের জন্য জরুরি কী না – এই প্রশ্নটির উত্তর সচেতন পাঠক পেয়ে যায় শাহীন আখতারের গল্পে। এ প্রসঙ্গে একটি অভিমত :

> নারীবাদ অবশ্যই মানবাধিকারের একটা অংশ। কিন্তু মানবাধিকারের মতো অস্পষ্ট একটা শব্দ ব্যবহার করলে লিঙ্গের যে নির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র অসঙ্গতি রয়েছে সেটাকে অস্বীকার করা হয়।[১৮]

শাহীন আখতারের ছোটগল্পে নারী তার নিজ শরীরের অধিকারী মানুষ হিসেবে চিহ্নিত। গল্পের অধিকাংশ নারী শরীরী বিষয়ে ট্যাবুমুক্ত, কেউ-বা বিবাহপূর্ব অথবা বিবাহবহির্ভূত শরীরী সংযোগে অভ্যস্ত, প্রথাগত বৈবাহিক সম্পর্কে আস্থাহীন অথবা ক্ষেত্রবিশেষে সমকামিতামূলক সম্পর্কে আস্থাশীল। সামাজিক দূরত্ববোধ-আক্রান্ত নৈঃসঙ্গ্যজাত বিবিক্তি আধুনিক মানুষের জীবনের একটি বৈশিষ্ট্য। নাগরিক নারীদের শরীরী চিন্তায় একাকিত্ববোধটিই প্রধান।

'ইদ্দতকাল' গল্পে মিনা ও সাদেক বিবাহবিচ্ছেদপ্রার্থী দম্পতি। 'ইদ্দত' কেবল নারীর জন্য পালনীয় একটি ধর্মীয় বিধি, যেখানে বিচ্ছেদের পর নারীকে তার সতীত্ব প্রমাণ করার জন্য এবং গর্ভস্থ সন্তানের পিতৃত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত থাকার জন্য তিন থেকে চার মাস অপেক্ষা করতে হয়। গল্পে মিনা বড় চাকরি করে ক্রমান্বয়ে উন্নতির পথে ধাবমান হলেও অর্থনৈতিক মুক্তি তার জন্য নিশ্চিন্ত জীবন নিশ্চিত করতে পারে না। মিনার স্বামী সাদেক স্বস্ত্রীর প্রতি ঈর্ষাকাতর ও সন্দেহ-পরায়ণ পুরুষ। স্ত্রীর চরিত্রে কালিমা লেপনে সর্বদা সচেষ্ট ব্যক্তি অনায়াসে সামাজিক নিয়ম-কানুনগুলোকে ব্যবহার করতে পারে। গল্প থেকে উদাহরণ: 'সাদেক যে আরেকটা বিয়ে করতে চায়, তার জন্য তো মুখ খারাপ করার দরকার নাই। বউয়ের বাচ্চা হয় না, এ-ই তো যথেষ্ট। কাজি-উকিল সব পক্ষে থাকবে।'[১৯] সাদেকের মতো কিছু পুরুষ চরিত্র লেখকের বিভিন্ন গল্পে আছে। এই পুরুষ চরিত্ররা অনেক ক্ষেত্রেই অসংবেদনশীল, যান্ত্রিক, অনুভূতিশূন্য; মূলত টাইপ চরিত্র হিসেবে চিত্রিত। কপট ও স্বেচ্ছাচারী সাদেকের বিষাক্ত সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চায় মিনা নিজেও। কারণ শারীরিক অসামর্থ্যের দোহাই দিয়ে নিঃসন্তান থেকে যাওয়ার দায়ভার ভিত্তিহীনভাবে মিনার ওপরই চাপানো হয়। ভগ্ন হৃদয় মিনা ইদ্দত পালনকালে বন্ধু সবিতার অনুরোধে নিজের অসুখী দাম্পত্যের ক্ষত শুকাতে শিলং বেড়াতে যায়। শিলং তার কাছে *শেষের কবিতা* উপন্যাস বা *মেঘে ঢাকা তারা* সিনেমার স্মৃতিতে নস্টালজিক। স্বামীর মূল্যায়নে 'মিনার চরিত্র নাই'। স্বার্থপর স্বামী-কর্তৃক অসম্মানিত ও উপেক্ষিত মিনা নিজের শরীরের জমিনে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে সতেচনভাবে সুবিনয়ের সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। সতীত্বের কোনো পুরুষবাচক শব্দ নেই। বিপর্যস্ত হলেও মিনা সন্তানলাভের আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই নিজ ভবিষ্যৎ অন্বেষণ করে। সতীত্বের সামাজিকতাকে অস্বীকার করে নিজ শরীরের সম্ভাবনাকে মূল্যায়ন করে। গল্পকারের প্রত্যয়দীপ্ত উচ্চারণ:

> লাবণ্য হওয়া মিনার পোষাবে না। সেই উচ্চ আদর্শের যুগ শেষ, যখন মেয়েরা নভেলের মডেল-কন্যার মতো নিজেদের সাজাতো – সুচারু, বিবেকবান, ঘরোয়া আবার জিদ্দি। ভাঙবে তবু মচকাবে না। *মেঘে ঢাকা তারার* নীতার মতো সর্বস্বত্যাগী মেয়েও সে নয়। নিজের জন্য আরাম-আয়েশ, সুখ-বিলাস কিছু-না-কিছু থাকা চাই। অন্যের করুণা নয়, মিনা চায় মর্যাদা।[২০]

নিজ শরীরের ওপর আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপন করে নিজেকে সম্মানিত করেছে মিনা। শিলংয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশে মিনার সংস্কারমুক্ত সিদ্ধান্তকে বেমানান মনে হয় না; বরং *শেষের কবিতা* আর *মেঘে ঢাকা তারার* রেফারেন্সে মিনা চরিত্র বাংলা সাহিত্যের নারীবিশ্বে এক নবতর মাত্রার সংযোজন ঘটায়। গল্পের সমাপ্তি পর্যায়ে দেখা যায় অনাগত সন্তানকে নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করছে মিনা। স্বামীর অপবাদ ও সমাজের দেওয়া ইদ্দতকে প্রত্যাখান করে, গর্ভধারণের অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম মিনা পুরুষতান্ত্রিক ঘূর্ণাবর্ত অতিক্রমকারী এক প্রাগ্রসর নারী হিসেবে চিহ্নিত হয়।

'তাজমহল' রোশনির গল্প। দাম্পত্য-শ্রদ্ধায় অতন্দ্র রোশনি বিধবা হলে যথারীতি তার জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। বিধবা নারী বাঁধা-ধরা সামাজিকতার বাইরে গেলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ তা কোনোভাবেই মেনে নেয় না; নৈতিকতার প্রশ্নে নিয়ত বিদ্ধ করে। একাকী নারীর বেঁচে থাকার সংগ্রামশীলতাকে ব্যাখ্যা করেছেন গল্পকার। মনঃপীড়া ভুলে বিস্তৃত শোক থেকে বেরিয়ে আসার জন্য রোশনি তাজমহল ভ্রমণ করে; গান ও নাচের অনুশীলন, যোগব্যায়াম এবং কর্মজীবন নিয়ে বাঁচতে চায় নিজের মতো করে। 'এভাবে রাতদিন মরা মানুষ নিয়ে পড়ে থাকা – আমি যেন শিমুলগাছে গা ঘষে ঘষে নিজেকে রক্তাক্তই করেছি।' – এই বোধ থেকে বেরিয়ে আসতে চায় সে। শিক্ষিত, স্বনির্ভর কলেজ শিক্ষক রোশনির অর্থনৈতিক মুক্তি তার জীবনের নিশ্চয়তা প্রদানে যথেষ্ট হয় না। অর্থলোভী শ্বশুরপক্ষের ষড়যন্ত্রে বিষযুক্ত পানিপানে মৃত্যু হয় তার। গল্পে ক্লাইম্যাক্স হিসেবে দেখা যায় মৃত্যুকালে রোশনির গৃহে ঘটনাচক্রে উপস্থিত পুরুষ-সহকর্মীও মারা যায় রোশনির সঙ্গে। ফলে সমাজের চোখে রোশনির পতিপ্রেমের সাক্ষ্য প্রমাণিত হওয়ার সুযোগ পায় না। বরং বিধবা নারী চরিত্রহীনা ছিল, সেই সামাজিক ধারণাই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। বাস্তবে নারীর কোনো তাজমহল নেই। বিধবা নিঃসন্তান নারীর অন্তর্বাস্তব জগৎ উন্মোচন করে লেখক দেখিয়েছেন মানব-অস্তিত্বের কাছে সামাজিকতা কতটা তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়। এ গল্পে রয়েছে নারীর প্রতি পারিবারিক সহিংসতার প্রসঙ্গ। গৃহস্থালি বা পারিবারিক সহিংসতা একটি ভয়ংকর সামাজিক ব্যাধি, যার ভেতরে কার্যকর থাকে বিপর্যস্ত সামাজিক মনস্তত্ত্ব। একটি সমাজে পারিবারিক সহিংসতার অসুস্থ চর্চার দীর্ঘ আর্থরাজনৈতিক পটভূমি থাকতে পারে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের একজন সমাজ-গবেষকের অভিমত:

> No matter how pernicious or pervasive domestic violence has been around the world, we have not been able to deal with it – neither as a crime, nor as a psychological disorder. Even less have we addressed it as a consequence of economic and political imbalance. We recognise that this manifestation of power is tolerated by social and political norms. But we have yet to make a connect between the methods used to control women's freedom and choice and the family economy.[২১]

পারিবারিক সহিংসতার কারণ যা-ই হোক, একে মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু বাংলাদেশের প্রচলিত আইন ও সমাজরীতিতে এর প্রতিকার এখনও সহজ নয়। একই ধারার আরেকটি গল্প 'ভার্জিন মেরির আত্মহত্যা'। গল্পের ঘটনাংশে প্রবাসী তরুণী ডলিকে আত্মহত্যা করতে দেখা যায়। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে জানা যায়: 'বারোতলা থেকে পড়ে ডলির মৃত্যু হয়েছে এবং সে ভার্জিন ছিল।' ডলির অবমাননাকে নারীত্বের অমর্যাদা হিসেবে স্পষ্ট করেন লেখক। স্বামীর অপরসম্পর্ক, অপবাক্য, অবহেলা ও অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় অনিশ্চিত জীবনের প্রতি আগ্রহ হারায় সে।

গল্পকারের সহমর্মী বর্ণনায়: 'নারীত্বের অবমাননা দিনে দিনে ছাদের তারে মেলা রঙিন শাড়ির মতো ফুলে উঠতে শুরু করে। যদিও সে চোখের সামনের শাড়িগুলোর বাতাসে ফুলে ওঠা তাকিয়ে থেকেও দেখতে পায় না। সে শুধু বঙ্গোপসাগরের নিঃসীম ধু ধু জল দেখে।'[২২] স্বামীর কাছে অনাকর্ষণীয় হওয়ার নিত্যতায় ডলি গভীর সংকটময় মনঃপীড়ার পরিবেশে ক্রমপ্রবেশ করে সে। 'সে পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি উচ্চতা দেহের ভাঁজে ভাঁজে লুকোতে চাইছিল, যাতে নিজের দেহের ভেতর আশ্রয় দিতে পারে স্বামী পরিত্যক্ত দেহটাকে।'[২৩] ক্রমশ আত্মহননের অন্ধকার সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে। মূলত, পরিত্যক্ত হওয়ার অনুভূতি থেকেই আত্মহননের পথকে বেছে নেয় ডলি। বঙ্গীয় সমাজে নারীর যৌনতাকে ভাগ্য বলে মেনে নেওয়া হয়। একই সঙ্গে এই বিষয়ে মৌন থাকার অলিখিত নিয়ম নারীর মগজে ছাপানো থাকে। গল্পে ডলি প্রশ্ন করে, সমাধান পাবে না জেনে নীরব থাকে এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নিজের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে চায়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ও পুরুষাধিপত্য নারীর শরীরের ওপর সর্বদা নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে চায়। ডলির মৃতদেহ মায়ের কাছে ফিরে এলে পরিবার ও সমাজের অন্যান্য মানুষ ডলির মৃত্যুকে স্বাভাবিক মনে করে এবং নিঃসন্তান নারীর আত্মহননকে ন্যায্যতা দানের চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। একইসঙ্গে তারা স্বামী রুস্তমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় নিষ্ক্রিয় থাকে এবং সক্রিয় থাকে নারীর চারিত্রিক শুদ্ধতা বিষয়ক মুখর আলোচনায়। ডলির মা মনোয়ারার সন্তান শোককে একমাত্র অনুভব করে অনাত্মীয় অপরিচিত তাহমিনা। তাহমিনা নিঃসন্তান এবং তার বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে। সমাজের চোখে সেও সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। তাই বিদ্যালয়ের অবোধ বালকের মুখে প্রশ্ন তুলে দেন লেখক, 'এই আপনের বাচ্চা হয় না ক্যান, আপনে কি আত্মহত্যা করবেন?' এই স্কুলের অবোধ বালকেরা বোধহীন বা সংবেদনহীন পুরুষ সমাজের প্রতিনিধি। সামাজিক শৃঙ্খলে নারীর প্রজনন সক্ষমতাকে আবদ্ধ করে নারীকেই আবার প্রশ্ন করা হয়। উক্তিটি পুনরাবৃত্তিমূলকভাবে বালকদলের মুখে স্থাপন করে নারীর শেষ না হওয়া জবাবদিহির পৌনঃপুনিক অবমাননাকে শিল্পরূপ দেন শাহীন আখতার। বালকের মুখের প্রশ্ন জনদাবিতে পরিণত হয়ে তাহমিনাকে ডলির মতো আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে। ব্যাংক কর্মকর্তা তাহমিনা এভাবে অস্তিত্বহীনতার নিম্নগ্রামে পৌঁছে গিয়ে স্বহননে উদ্যোগী হয়ে আত্মসংকট মীমাংসার পথ খুঁজে নিয়েছে। শরীরের ওপর অধিকারহীনতা থেকে নারীর এ আত্মবিনাশী যাত্রাকে মরমি দৃষ্টিতে দেখেছেন গল্পকার। সামাজিক নিয়মাচারের প্রতিবাদ এই গল্পের মূল উপজীব্য। পুরোনো নীতিবিচারে অভ্যস্ত, কর্তৃত্বপরায়ণ, স্বার্থপরায়ণ এবং আক্রমণাত্মক সমাজব্যবস্থাই নারীর প্রতি ঘটে যাওয়া সহিংসতার জন্য দায়ী থাকে। পরিবারকাঠামোর ভেতরে প্রতিনিয়ত নারী নিষ্পেষিত হয়, যা প্রতিকারহীন:

> Although women's sexuality has in many ways been liberated from patriarchy's control, in many ways it has not. One does not have to look far to run across the practice of clitoridectomy; rejection of lesbians; rape; women-beating; incest; nonconsensual participation in the socalled sex-industry; problems in women's gaining access to contraception, abortion, and even proper sex education; purdah, nonconsensual veilings, arranged marriages for monetary and/or status reasons; restrictions on midwives; downgrading of women-directed art and music; illiteracy; paucity of women in science, technology, engineering, math, and other [lucrative] male professions; and so forth. Men are not necessarily conspiring with one another to keep women down, but the power of the institution of compulsory heterosexuality, and certainly of unreflective heterosexuality, persists.[২৪]

নারীর জৈবিক সত্তা

নারীর স্তন, জরায়ু, ডিম্বাশয় নারীর জৈবিক সত্তা ও অস্তিত্বের পরিচায়ক। আধুনিক বিশ্বে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থায় জীবন বাঁচাতে অঙ্গহানির মতো বিষয়গুলোও যুক্ত হয়েছে সমকাললগ্ন নারীর অভিজ্ঞতায়। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে যে নারীর অঙ্গহানি ঘটে, তার মনোদৈহিক পরিস্থিতি শাহীন আখতারের ছোটগল্পে বিষয় হিসেবে এসেছে। এ ধারায় একটি সবিশেষ গল্প 'মিসেস চৌধুরীর পুনর্জন্ম'। এ গল্পে নারীর শরীর ও মনের জটিল অভিযাত্রার বিচিত্র ইতিহাস নির্মিত হয়েছে। কন্যাশিশুর নারী হয়ে ওঠা থেকে শুরু করে অঙ্গহানির মধ্য দিয়ে নারীত্বের শরীরী অবসানের এক বিস্তৃত জগৎকে গল্পকার অনবদ্য শিল্পযোগে উপস্থিত করেন; নারীর প্রজনন-প্রত্যঙ্গসমূহকে জবাফুলের প্রতীকে উপস্থাপন করেন, যে জবাফুলটিকে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মিসেস চৌধুরী প্রতিনিয়ত আত্মসত্তায় উপলব্ধি করেন নিজের যৌবন ও নারীত্বের শক্তিমত্তার জায়গা হিসেবে। মিসেস চৌধুরী নামহীনা একজন নারী – নামকরণের মধ্যে আছে অনেকটা পুরুষ-সাপেক্ষতা। এ চরিত্রে দেখা যায় – কিশোরী বয়সের দেহবিকাশের পাশাপাশি আকর্ষণ ও প্রেমবোধের জন্ম, অসমবয়সী ব্যক্তির সঙ্গে জীবনযাপন-চিত্র। দাম্পত্য জীবনের অপ্রাপ্তি, শরীরী কামনার অপূর্ণতা, অসুস্থতাজনিত অঙ্গহানি, দাম্পত্য সম্পর্কে নারীর অমর্যাদা – এ সকল কিছুর মধ্য দিয়ে নারীর শরীরী অচরিতার্থতার একটি আনুপূর্বিক বিবরণ ভাষারূপ লাভ করেছে। অন্যদিকে জনাব চৌধুরী প্রাচীন পিতৃতান্ত্রিক নৈতিকতার যথার্থ দৃষ্টান্ত। এই গল্পে স্বামী চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে পুরুষতন্ত্রের উপস্থিতি ঘটে নারীবাদী বয়ানের অধীনে। স্ত্রীর শরীরকে 'শস্যক্ষেত্র' ধরে নিয়ে 'চাষবাস' নিয়েই ব্যস্ত থাকে শাসক স্বামী। বঙ্গীয় সমাজে এরূপ দাম্পত্যের উদাহরণ অপ্রতুল নয়। আত্মমর্যাদাহীন পরাধীনতার মধ্যে অস্তিত্বের অভ্যন্তরে বিরূপ বহির্জগতের এক বিকল্প স্বীয় শরীরী জগৎ তৈরি করে রাখে মিসেস চৌধুরী; নিজ নারীত্বের প্রতীক জবাফুলটিকে নিয়মিত সতেজ রাখে। কৈশোরক প্রেমের স্মৃতিকাতরতা এই জবাফুলের প্রতীকে উপস্থাপিত। নারীর শরীর ও নারীর অস্তিত্বের এই সম্মিলিত অভিযাত্রার শিল্পবয়ান নির্মাণ করেন গল্পকার:

> জবা ফুল রঙিন পাপড়ি মেলল। শরীরের অতল অন্ধকারে মিসেস চৌধুরী অনুভব করেন তার মৃদু শিহরণ। মাসে মাসে শরীর-নির্গত রক্তস্রোত, লাল-ফুলটির তরল নির্যাস যেন। তারপর আবার নতুন করে ফোটে সে ফুল। কী এক সুখকর ব্যথায় বুক টনটন করে। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে কি দুপুরের একাকিত্বে অথবা জ্যোৎস্না-ভাসা রাতে তলপেটে হাত রাখলে সুহৃদ চক্রবর্তী এসে হাজির হন। মাথায় টোপর। মুখমণ্ডল চন্দন-চর্চিত। তাঁর ফিনফিনে ধুতির খুঁটে মিসেস চৌধুরীর লাল বেনারসির আঁচল শক্ত করে বাঁধা। থেকে থেকে নেপথ্যে উলুধ্বনি ওঠে। তাঁরা তখন সাত পাকে ঘুরে ঘুরে একসঙ্গে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। মিসেস চৌধুরী সামনে, সুহৃদ চক্রবর্তী পেছনে। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে কখন তাঁর বিয়ে হয়ে গেল একজন রাশভারি অধ্যাপকের সঙ্গে, তিনি টেরও পেলেন না। সুহৃদ চক্রবর্তীর স্মৃতি জবা ফুলের মাঝে বেঁচে রইল তার পরের চব্বিশটা বছর – হায় দু-দুটি যুগ।[২৫]

এখানে নারীর নিজস্ব স্বপ্ন ও অভিজ্ঞতার ভাষ্য নির্মিত হয়েছে তারই নিজস্ব অস্তিত্ববোধ ও পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার সম্পৃক্তিতে। এই ভাষ্য সরল নারীবাদী ভাষ্য। নারীবাদী টেক্সট কেবল নারীদের গল্প বা কাহিনি নিয়ে কাজ করে না; বরং নারী-জীবনকে স্পষ্টভাবে সাহিত্যে তুলে ধরে নারীর জীবনকাঠামোর সমস্যা ও সৌন্দর্যের স্বীকৃতি দেওয়া এর মৌল প্রতিপাদ্য। উপরন্তু নারীর অবস্থার বিশেষ বিশেষ দিককে আলোকিত ও তাৎপর্যমণ্ডিত করে উপস্থাপন করে। কখনো কখনো

নারীর অবস্থার পরিবর্তনের দিকে লক্ষ রেখে বক্তব্য প্রদান করে। সর্বোপরি, নারীজাতির সামগ্রিক স্বার্থে একটি সাহসী রাজনৈতিক বয়ান নির্মাণ করে। প্রজননতন্ত্রের রোগে আক্রান্ত হলে মিসেস চৌধুরীর স্বামী প্ররোচনা ও তিরস্কার করে স্ত্রীর প্রজনন-প্রত্যঙ্গগুলো অপসারণ করায়। নিজের বয়োবৃদ্ধতার কাছে স্ত্রীর তরুণ দেহের সক্ষমতাকে ভীতির দৃষ্টিতে দেখে সে। 'এ বয়সে একজন নিরস্ত্র সঙ্গীই নিরাপদ, সাপুড়ের ঝাঁপির বিষদাঁতহীন পোষা সাপ যেমন। স্ত্রীর প্রজনন-অঙ্গের তাঁর আর দরকার কী। যখন ছিল, তা থেকে তো প্রয়োজনমতো শস্য তিনি গোলায় তুলেছেনই। এখন এটি একটি বাড়তি ঝঞ্ঝাট।'[২৬] নারীর প্রজননসক্ষমতা পিতৃতন্ত্রের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। অনাকাঙ্ক্ষিত আঘাতে মিসেস চৌধুরীর শরীরকেন্দ্রিক নিজস্ব দুনিয়া ভেঙে পড়লে মিসেস চৌধুরীর মনের দরজা-জানালায় অন্ধকার ভিড় জমায়। অঙ্গহানির প্রাত্যহিক মনোদৈহিক যাতনায় নারীপ্রত্যঙ্গহীন দেহটিকে তার কাছে কারাগার মনে হয়:

> ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট – তা তাঁর হয়েছেও। এখন ওরা উড়ছে। উনি পক্ষীমাতা। ফের ডিম পাড়ার, তা দেয়ার পর্বও শেষ। তাঁর পালক ঝরে গেছে। দিনভর শূন্য খাঁচা আক্রোশের নখ দিয়ে আঁচড়ান। ... পুল্পে-পত্রে যে শরীর একদিন পল্লবিত হয়েছিল, তার কোনো চিহ্নই আর থাকবে না। তারপর তিনি বেঁচে রইবেন – কতদিন, কতকাল, শরীর থেকেও নেই, এরকমভাবে![২৭]

শারীরিক ও মানসিক কষ্ট তার জীবনযাপনকে প্রভাবিত করে অস্তিত্বের ভিত নাড়িয়ে দেয়। অসহায় কল্পনায় নিজ শরীর মন্থন করে মনে মনে জবাফুল তৈরি করেন। মিসেস চৌধুরীর নবযৌবনের কল্পিত পুনর্জন্ম হয়। বহু নারী তাদের হৃত দেহ ও লুণ্ঠিত আবেগ নিয়ে এরূপ পুনর্জন্মের স্বপ্ন দেখেন। নারীর শরীর ও মনের পরিস্থিতিকে শৈল্পিক সুন্দরতায় ছোটগাল্পিক পরিসরে উপস্থাপন করেছেন শাহীন আখতার।

'জরায়ুগাথা' গল্পে জরায়ুহীন নারীর নিরস্তিত্ববোধ প্রকাশিত। প্রজননতন্ত্রহীন নারী বলে: 'এখন থেকে জরায়ু নেই। জরায়ুর স্বাধীনতাও তাহলে আর নেই!' – এই আত্মজিজ্ঞাসার মধ্যে দুটি প্রশ্ন থেকে যায় – এক, জরায়ু নারীর জন্য শৃঙ্খল কিনা; অন্যদিকে, জরায়ুমুক্ত নারীর অভিজ্ঞতা কি ভালো নাকি খারাপ? গল্প থেকে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

> জ্যা-মুক্ত তীরের মতো আমি কেবল শূন্যে উড়ছি। শূন্য থেকে শূন্যতায়। এই অপার শূন্যতা, এই আলো-আঁধারি পারিপার্শ্বিক ছাড়িয়ে এবার ভোঁকাট্টা ঘুড়ির মতো পাক খাচ্ছি, এলোপাতাড়ি উড়ছি-নামছি। কখন কোথায় পড়ব, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।[২৮]

জরায়ুহীনতা আর অস্তিত্বহীনতার উপায়হীনতা একীকৃত হয়ে আছে এই উদ্ধৃতাংশে। জরায়ুহীন নারীর জীবনের চিত্রকল্প হিসেবে এসেছে 'অসংখ্য গর্ত আর ছ্যাঁদার মস্তবড় এক ছেঁড়া জাল আমার জীবন' – উপমাটি। নারীকে সমাজ যখন কেবল লৈঙ্গিক পরিচয় দিয়েই পরিচিত করাতে চায়, তখন সেই একান্ত পরিচয়টি হারিয়ে নারীর যে উন্মূল দশা তৈরি হয়, তা মর্মান্তিক। প্রজনন-প্রত্যঙ্গহীন নারী উনমানুষ হওয়ার ধারণা নিয়ে বেঁচে থাকে। পরিবার ও সমাজ থেকে প্রাপ্ত এই ধারণা পুরুষতান্ত্রিক। নিজেকে নারী জেনে ও মেনে নিয়ে যে নারী জীবনকে বুঝে নেয়, নারী প্রত্যঙ্গহীনতা তার ভেতর যে শূন্যতাবোধ তৈরি করে, তার ভাষ্য 'জরায়ুগাথা' গল্প:

> 'শোনো আয়া! কত নপুংসক এ পৃথিবীতে সম্রাটের মতো বেঁচে আছে জানো? জানো না। আমি জানি। তারা সাপুড়ের সাপ নাচানোর মতো মেয়ে নাচায়। মেয়েরাও রাত নাই, দিন নাই তাদের দরজায় হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে। আহা, পুরুষ যে। আর পৃথিবী নামের গ্রহটি তো তাদেরই।'[২৯]

এই অংশে উদ্ধৃত আক্ষেপ সম্ভবত বিমানবিকীকরণের বেদনা থেকেই উৎসারিত।

নারী-সমকাম

নারীর অবদমিত পৃথিবীকে উন্মোচন করেছেন শাহীন আখতার তাঁর ছোটগল্পে। পুরুষশাসিত সমাজে অবদমন নারীর অপর নাম। অবদমনের সঙ্গে নারী-সমকাম প্রসঙ্গটি জড়িত। নারীর জীবনের নানামাত্রিক অবদমনের ইতিবৃত্ত উন্মোচন করেন শাহীন আখতার। নারীর মনোবিশ্বকে বাংলা ছোটগল্পের পাঠকের কাছে তুলে ধরেন তিনি। গল্পকার নারীবাদী বয়ানরীতিকে সাহসিকতার সঙ্গে সাহিত্যে তুলে ধরে নারীর এ অবদমিত অবস্থার প্রতিকার প্রত্যাশা করেন। এক্ষেত্রে শাহীন আখতার বাংলাদেশের একজন স্বতন্ত্র নারীবাদী লেখক। নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্বে নারী-সমকাম আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের একজন নারীবাদী সাহিত্যিকের মতামত:

> সমকামী লেখিকারা (লেখক শব্দটি ব্যবহার করতে পারলেই ভালো হতো, কিন্তু এখানে, সহজে বোঝার খাতিরে 'লেখিকা' শব্দটি ব্যবহার করা হলো) 'সমকামিতা'কে নিছক শারীরিক তৃপ্তির মাধ্যম, 'বিকল্প জীবন ব্যবস্থা' কিম্বা সংখ্যালঘু কোন গোষ্ঠীর চাহিদা হিসেবে দ্যাখেন না বরং প্রচলিত পিতৃতান্ত্রিক সুক্ত, যা নারীর জন্য পুরুষকেই একমাত্র কাম্য ও আরাধ্য বলে মনে করে, সেই সুক্তকেই প্রত্যাখান করে নিঃসীম অবহেলায়।[৩০]

সমকামিতা মানুষের স্বাভাবিক যৌনচিন্তার অন্যতম উপাদান হলেও এ প্রসঙ্গটিকে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকক্ষেত্রে সচেতনভাবে এড়িয়ে যেতে দেখা যায়। এ দেশের পুরুষশাসিত সমাজকাঠামোতে সমকাম-প্রসঙ্গ সাধারণ নিয়মাচারের বাইরে থাকে বলে নারী-সমকাম এক নিষিদ্ধ বস্তুতে শৃঙ্খলিত। নারী-লেখকরাও এ প্রসঙ্গে কথা বলতে অস্বস্তিবোধ করেন:

> অ্যাকাডেমিক নারীবাদীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা নারীসমকামিতাকে স্বীকার করেননি, এর রাজনৈতিক তাৎপর্য তাই তাদের কাছে গৌণ হয়ে গেছে। কিন্তু নারীসমকামিতার বাস্তবতাকে স্বীকার না করে উপায় নেই, বিশেষ করে গত কয়েক দশকে পশ্চিমের অসংখ্য নারী এই সমকামিতাকে তাদের জীবনযাপনের অনিবার্য অংশ করে নিয়েছেন। এটি পেয়ে গেছে আইনি বৈধতা ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। নারীসমকামিতার রাজনৈতিক তাৎপর্য তাই অনস্বীকার্য।[৩১]

বিপরীত কামের বিপরীতে সমকামকে অধিক যৌক্তিক সম্পর্ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব। শাহীন আখতারের ছোটগল্পে আছে নারীর সমকামিতার প্রসঙ্গ। নারীর দেহের ওপর আত্মনিয়ন্ত্রণের সূত্রেও সমকামী-সম্পর্কের গল্পগুলোকে পাঠ করা যায়। এ ধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ গল্প 'সাপ, স্বামী, আশালতা ও আমরা'। গল্পের নামে 'আমরা' নামকরণের মধ্যে নারীর সামূহিক কণ্ঠস্বর আছে। গল্পকথক-নারীটির সংকট যে কেবল তার একার সংকট নয়, সম্মিলিত সংকট, যা আরও অনেক নারীর জীবন সংকট – 'আমরা' নামের মধ্যে সেটি স্পষ্ট। 'এখানে আমাদের পরিত্রাণের কোনো আশা নাই, আমরা যদি কোথাও চলে যেতে পারতাম!' – পলায়নের নয়, এই আক্ষেপ আশাহীনতার। 'আমরা' যেমন গল্পে নারীর সংকটের বহুবচন তেমনই আশালতা নামের মেয়েটি নারীর আশাবাদের মানুষী রূপ। সামাজিক আচারনিষ্ঠ জীবনে আটকে পড়া নারীর দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তি হিসেবে সমকামিতার প্রসঙ্গ বিশেষ উপাদান হিসেবে এসেছে শাহীন আখতারের

ছোটগল্পে। নারীর যৌনতার সংকটকে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর থেকে উপস্থাপন করেছেন গল্পকার:

> 'আমরা রাতে সাপ-স্বপ্ন দেখি।' বলে আমরা ভারমুক্ত হই। এবং মনশ্চিকিৎসকের পর, একজন ক্ষুধার্ত নারী, যে নিজে সাপ-স্বপ্ন দেখে, তার কাছেই পারিত্রাণের উপায় আশা করি।[৩২]

সমব্যথী নারীর কাছে আপন দুঃখ ও কষ্টসহ নিজের মনকে মেলে ধরতে পারার স্বাধীনতা নারীকে নারীর প্রতি নির্ভরশীলতার দিকে, নারীপ্রেমের দিকে ধাবিত করে। সমকাম-তত্ত্ব নারীর প্রতি ঘটে যাওয়া বহুমাত্রিক অন্যায়ের প্রতিবাদ ও উত্তরণহীন পুরুষতন্ত্রকে প্রত্যাখানের একটি উপায়। এ গল্পে 'আমরা' বা 'বরেরা' জাতীয় বহুবচনবাচক সর্বনাম ও বিশেষ্য ব্যবহার করে গল্পকার একজন নয়, বরং অনেক নারী-পুরুষের সংকটের প্রতীকী প্রেক্ষাপটকে সংযুক্ত করেছেন গল্পকথকের ব্যক্তিগত সংকটের সঙ্গে। 'বর–সাপ, না মানুষ; মানুষ, না সাপ।' – সম্পর্কে আস্থাহীন নারীর যৌন অবদমন স্বপ্নে সাপ দেখার তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হয়। বিবাহিত নারীর যৌনতা একটি 'ক্লোজড ফাইল', যা আলমারিতে তালাবদ্ধ হয়ে আছে – এ রকম উপমা নির্মিত হয়েছে গল্পে। শরীরী অবদমনের শিকার শিক্ষিত নাগরিক উচ্চবিত্ত গল্পকথক যেমন স্বপ্নে সাপ দেখে, একই সমান্তরালে দরিদ্র আশালতা যার স্বামীর 'জিহ্বা ছাড়া সর্বাঙ্গ অবশ' সেই আশালতাও 'রাইতে হাপ' দেখে। জঠর-যন্ত্রণা ও শরীরী যন্ত্রণা উভয়ই আশালতাকে দগ্ধ করে। তথাপি দরিদ্র আশালতার দারিদ্র্য যৌনতার চেয়েও অনেক বড় প্রসঙ্গ। ফলে তার অস্তিত্বচিন্তা গল্পকথক নারীর চেয়ে ভিন্ন ও গুরুতর। পুনরাবৃত্তিমূলক সাংসারিক হীনমন্যতা ও প্রাত্যহিক বিবমিষাকর দাম্পত্য নিগড় ছেড়ে নারীর পরিত্রাণের যে কোনো পথ নেই, তা বর ও নারীর কথোপকথনে প্রকাশ পায়:

> বররা বলে, 'এতক্ষণ টয়লেটে কী কর?' আমরা অবাক হই, 'টয়লেটে?' তারা যুক্তি দেখায়, 'তা ছাড়া তোমাদের যাওনের আর জায়গা আছে?'
> আমরা বুঝতে পারি, তারা আমাদের বয়সের দিকে ইঙ্গিত করছে। তাদের ধারণা, এখন আমাদের এমন এক বয়স, যে বয়সে মেয়েদের আর প্রেমিক জোটে না, রাতে কি দিনে কখনোই অভিসারের লগ্ন আসে না, নতুন করে বর পাওয়া যায় না। এই বররা তো আমাদের সৌভাগ্যের নিদর্শন। জনমভর সাপ-স্বপ্ন দেখলেও আমরা তাদের কাছ থেকে তালাক চাইব না।[৩৩]

সমকামিতার অনুষঙ্গ হিসেবে প্রেম, সম-অধিকার, সন্তান জন্মদানের অপারগতা – এ সকল প্রসঙ্গ লেখকের গল্পে পাওয়া গেলেও সফল-সমকামের কথাচিত্র পাওয়া যায় না। কথকের অবস্থান থেকে আশালতার জীবনগত অবস্থান ভিন্ন। নিজের জঠরযন্ত্রণা দূর করার নির্মম প্রয়োজন ছাড়া অন্য সকল বিষয় তার কাছে অগুরুত্বপূর্ণ। গল্পকার সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে আশালতার আর্থসামাজিক প্রতিবেশ-শাসিত মনস্তত্ত্বকে উন্মোচন করেন। গল্পে বর ষড়যন্ত্রমূলকভাবে প্রণয়ী আশালতাকে বাড়িছাড়া করে। নিয়ন্ত্রণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ নারী আবারও স্বপ্নে সাপ দেখা শুরু করে। একই ধারার গল্প 'পুষ্পবাগ আবাসিক এলাকা'য় এমন একটি প্রতিবেশ নির্মিত হয়েছে, যা নারীত্বের প্রচলিত ধারণার ট্যাবু থেকে মুক্ত। সমকালীন সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে চিত্রিত এ সকল প্রেক্ষাপট প্রতীকী হলেও অস্বাভাবিক নয়।

তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ

পুরুষ-আধিপত্যের আরেকটি প্রপঞ্চ ট্রান্সফোবিয়া[৩৪]। সমাজ প্রতিনিয়ত তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের প্রতি বৈষম্য, নিগ্রহ ও সহিংসতা চালায়। বাঙালি সমাজে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষকে মেনে না নেয়ার প্রবণতা শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল শ্রেণির মধ্যে বিদ্যমান। নারীবাদ তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের অধিকার নিয়ে কাজ করে এবং একে নারীর অধিকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয় হিসেবে মূল্যায়ন করে। তৃতীয় ও চতুর্থ তরঙ্গের নারীবাদী ধারা নারীদের মধ্যে বৈভিন্ন্য ও বৈচিত্র্যকে মেনে নেওয়ার সূত্রে নর ও নারীর মতো তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের জন্য সমতা নিয়ে কাজ করে।

'আবারও প্রেম আসছে' তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের করুণ বাস্তবতার গল্প। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষকে সমাজ কদর্য দৃষ্টিতে দেখে। শরীরী পরিচয়ের কারণে মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত এই মানুষদের প্রতি নারী ও পুরুষ উভয়ই অবজ্ঞা প্রদর্শন করে থাকলেও তাদের অপৌরুষেয় গণ্য করার দৃষ্টিভঙ্গিটি মূলত পুরুষতান্ত্রিক। কখনো কখনো দেখা যায় পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে তৃতীয় লিঙ্গের প্রতি রিরংসা ও জিঘাংসা। নারী ও পুরুষের কথায় তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের প্রতি অগ্রহণযোগ্য ও অমানবিকতাপূর্ণ আচরণ প্রকাশিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ:

> ক. 'ভাবি, বেশ্যা আর হিজড়া কখনো সত্য কথা বলে না,' ত্বরিত জবাব আসে সমীরের কাছ থেকে।[৩৫]
>
> খ. কী দোস্ত, বিনোদনের জন্য একটা হিজড়া ধরে আনলি? বাউল-ফাউল পাইলি না কিছু![৩৬]

এই ধরনের মন্তব্য থেকে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের প্রতি সমাজে প্রচলিত অবমাননাকর সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও ট্যাবু সম্পর্কে গল্পকার পাঠককে সচেতন করেন। শুধু তা-ই নয়, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের মানবিক অনুভূতি, প্রণয় ও বিরহের পরিচয় তুলে ধরেন গল্পকার:

> হু। আমি একজনেরে অগাধ ভালোবাসছিলাম। তার গা বানানো, শরীরের যত্ন নিয়া...মার পরে তারে ভালোবাসছিলাম। হয়তো তার গাটা বানালাম। আদর করলাম। পাশে শুলাম – এসব করতি ভালো লাগত। মেয়ে হতি ভালো লাগত। তার জন্য পাগল হয়্যে বাড়ি ছাড়ছি। সারা রাত কানছি – হায় আল্লা! সবাই সুখে আছে, আমারে কেন...কত হিজড়া আছে, তারা তো স্বামী নিয়া থাকতিছে। আমারে কোনোদিন সুখ দিলে না। যারে ধরি সে-ই পালায় যায়। হয়তো এক বছর, ছয় মাস। তারপর আর নাই। তার মুখে সারাক্ষণ মেয়েদের গল্প, নজরটা মেয়েদের দিকে বেশি – তোমারে নিয়া আর কতকাল থাকব! বিয়েশাদি, বাচ্চাকাচ্চা হবে না কিছু। আমার জীবন মাটি হয়ে যাবে...[৩৭]

এখানে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের আপন জবানবন্দিতে তাদের ব্যক্তিগত সত্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন শাহীন আখতার। 'আবারও প্রেম আসছে' গল্পে হিজড়া, নারী, পুরুষ – তিনের জীবনে প্রেম, সম্পর্ক ও যৌনতার অবস্থা তুলে ধরে হিজড়া সম্প্রদায় সমাজে এখনও কতটা অপমানিত ও অবহেলিত তার একটি স্পষ্টগ্রাহ্য চেহারা পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেন গল্পকার। একজন নারী ও একজন হিজড়াকে সমান্তরালে উপস্থাপন করে গল্পকার উভয়ের সংকটের বিভিন্নতাকে তাৎপর্যপূর্ণ করে দেখান। গল্পশেষে হিজড়ার নির্মম পরিণতি চিত্রায়িত করে তাদের জীবনের অনিশ্চয়তাকে স্পষ্ট করে তোলেন। গল্পে নাগরিক মানুষের কুৎসিত কদর্যতার চাক্ষুষ প্রমাণ দেখে নেয়ার অপরাধে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষটিকে হত্যা করা হয়। তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষেরা শারীরিক, মানসিক, মৌখিক নিগ্রহের লক্ষ্যবস্তু হয়ে নারীর চেয়েও বেশি অবমূল্যায়নের শিকার।

নারীর ব্যক্তিত্ব ও জীবন-সংকট

সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটে পতিত নারীর জীবন-আখ্যান বহুতর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের স্থান থেকে রূপায়িত শাহীন আখতারের ছোটগল্পে। প্রচলিত সামাজিক নিয়মকানুন ও বিচার-প্রথার সঙ্গে নারীর ব্যক্তিত্ববোধের সংঘাত দেখিয়েছেন গল্পকার। এ সংঘাতে নারী পরাজিত মানুষ নয়। চরম বৈরিতার মধ্যেও মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকে তাঁর গল্পের অনেক নারী চরিত্র। 'লিবারেল নারীবাদ এটাই দাবি করে যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীকে পরনির্ভর করে রেখে নারীর ব্যক্তিসত্তা বা আমিত্ব গঠনে বাধার সৃষ্টি করেছে। নারী যদি সুযোগ পায় তাহলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে। সেজন্য লিবারেল নারীবাদ নারীমুক্তির কথা বলে। এ নারীবাদ মেধার ক্ষেত্রে, ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমতার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করে।'[৩৮] আনন্দ-বেদনা, সংকট-সম্ভাবনা সংযোগে নারীর পরিপূর্ণ জীবন-আখ্যান শাহীন আখতারের ছোটগল্পের উপজীব্য। বিচিত্র কর্মপেশায় যুক্ত নারীদের নিয়ে লেখা গল্পসমূহকে মনে হয় এক বৃহৎ উপন্যাস। গল্পগুলোতে কাহিনির বিভিন্নতা থাকলেও সংকটে বিহ্বল না হয়ে মোকাবিলায় অগ্রসর এই নারীরা সকলে মিলেমিশে একটি আখ্যান।

'শ্রীমতীর জীবনদর্শন' গল্পের শ্রীমতীকে মনে হয় বাঙালি নারীর একটি আইডিয়া। নারীর নারীত্ব, সন্তান জন্মদান, সন্তানের জন্য স্নেহময়তা, প্রথাগত সতীত্বের ধারণা ও সমাজের দেয়া গ্লানি আর সকল কিছু ছাপিয়ে মাতৃত্ব শ্রীমতীর জীবনচক্রকে পরিপূর্ণ করে। সতীপনার নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা শ্রীমতীকে অনুল্লেখিত কোনো ঘটনাচক্রে আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সন্তান হারাতে বাধ্য হতে হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে জন্মদাত্রীর চেয়ে জন্মদাতা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে মা ও সন্তানের জৈবিক সম্পর্ককে অবলীলায় অস্বীকার করতে সক্ষম। শ্রীমতীর তৃষিত মাতৃত্ব মনোবিকলনের ঘোরে দেখতে পায় তার ঘর ভরা সন্তান; পিতৃপরিচয়ের দোহাই এদের মধ্যে অনেককে ছিনিয়ে নিলেও তার কোলে থেকে যাবে কোনো না কোনো সন্তান:

> কোলে নবজাত সন্তান নিয়ে বঙ্গের এক উষর-লগ্নে শ্রীমতী ফিরে আসে। এ সন্তান শ্রীমতীর – এর চেয়ে সহজ কথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কী হতে পারে! অথচ শ্রীমতীর শঙ্কা ঘোচে না, সংশয় দূর হয় না। অপহৃত সন্তানের কথা মনে পড়ে। এতদিন পর এই প্রথম শ্রীমতী নানান সুরে কাঁদে। মানবজাতির মায়েদের হয়ে সে কেঁদে চলে। বলা বাহুল্য, এ বিলম্বিত ক্রন্দন শুধু মানুষেরই।[৩৯]

প্রচলিত অর্থে বাঙালি সমাজে মাতৃত্বকে মহিমান্বিত রূপে দেখা হয়। তবে মাতৃক্ষমতার শারীরিক বৈশিষ্ট্যসমূহকে পুরুষের শরীরী বৈশিষ্ট্যের চেয়ে হেয়, নীচ ও অযোগ্য বলে মনে করার কূটাভাস সমাজে প্রচলিত আছে। বাঙালি মা আচারনিষ্ঠা ও কুসংস্কারের জন্য প্রচণ্ড কষ্ট স্বীকারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নারীর মাতৃত্ব ও প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক আইনের অসম যুদ্ধে মাতৃত্বের আবেগের জয় চিত্রিত হয়েছে 'শ্রীমতীর জীবনদর্শন' গল্পে। প্রকৃতি-পরিবেশসংলগ্ন নারী সন্তানজন্ম ও লালন-পালনকেন্দ্রিক জীবনধারণের প্রয়োজনে প্রকৃতির মতোই পুরুষতন্ত্রের দ্বারা ব্যবহৃত ও নিগৃহীত হয়:

> প্রকৃতির ক্ষতিসাধনে যেমন আবহমানকাল ধরে পুরুষ আগ্রাসী ভূমিকা পালন করে আসছে, তেমনি সে-কারণে আবার নারীই তাতে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় পুরুষের তুলনায়। প্রকৃতি যখন ভালো থাকে, তখন সবাই ভালো থাকে। প্রকৃতির দুর্গতি হলে, সবাই দুর্যোগে পড়ে, তবে নারীই সর্বাগ্রে ও সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়ে।[৪০]

'শ্রীমতীর জীবনদর্শন' গল্পটি বর্ণনার বিচিত্র ঢঙে অত্যন্ত আঁটসাট; শ্রীমতীর বন্দনা, জীবনবৃত্তান্ত, মোহভঙ্গ তথা অন্তর্ধান ও প্রত্যাবর্তন – এই চারটি খণ্ডে বিভক্ত। 'শ্রীমতী' শব্দটি নারী শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে প্রতিটি নারীর মর্মমূলীয় জীবনসংকটের প্রতীকী প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

'আস্‌তান' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিন্দুবালা। বিন্দুবালা চরিত্রকে জীবনঅভিজ্ঞতায় ও দার্শনিকতায় উত্তীর্ণ করেছেন শাহীন আখতার। বিন্দুবালা গরিব-সর্বহারা এক সৌন্দর্যসেবিকা। বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে ম্যাসেজসেবা দিয়ে 'হাতের তালুর মতো ঢাকা শহর যার চোখের সামনে ভেসে ওঠে'। নাগরিক ঢাকার বহুমানুষের কলমুখরতার মধ্যে বিন্দুবালা বিন্দুর মতো ক্ষুদ্র সংগ্রামী মানুষ। নিম্নবিত্ত কর্মজীবী বিন্দুবালা শিশুসন্তানের ভরণপোষণের জন্য কাজ করে। তাকে প্রতিনিয়ত অবজ্ঞা ও অবহেলার কুৎসিত দৃষ্টি মেনে নিয়ে কাজ করতে হয়। বাস্তবতার নিরিখে বিন্দুবালা কারো সবিশেষ অনুগত নয়; অনাথ, বিধবা ও নিঃসঙ্গ বিন্দুবালার কাছে কর্মই মুখ্য। বিন্দুবালা নিজ ভাগ্য পরিবর্তনের দায়িত্ব স্বনিষ্ঠতায় নিজের কাঁধে তুলে নেয়া নারী। ম্যাসেজ পর্যায়ের ভোক্তা ও সেবিকাকেন্দ্রিক ঢাকার নাগরিক-বিশ্বের বিচিত্র বিবরণ আছে গল্পে। ম্যাসেজ গ্রহণকারী নারীরাও নিজ নিজ অবস্থানে বিচ্ছিন্ন, একাকী, বঞ্চিত ও দুঃখী। বিন্দুবালার বিজ্ঞ পেশাদারী আচরণের অভ্যন্তরে প্রবাহিত থাকে জাতিগতভাবে সংখ্যালঘু নারীর জাতিসত্তার লুপ্ত স্মৃতিচারণা। 'আস্‌তান' গল্পের বিন্দুবালা তার আদিজন্মভূমির পরিচয় হারায়:

> অনেক অনেক দিন আগের কথা। এই দেশে রাস্তা বানানোর লাগি গোরকপুর, বালিয়া, মুঙ্গের, ভোজপুর থেইক্যা লোক ধরে আনা হইছিল। একে তো পানির কষ্ট, নিজের দেশে কাম-কাইজও নাই – মানুষগুলি কী খাইয়্যা বাঁচবে? আমার দাদা, দাদার বাবা এই সুযোগে চইল্যা আসে। রাস্তার কাজ হ্যাষে বাড়ি ফিরার পথ হারায় ফালায়। এমন বুকার বুকা আছিল।[৪১]

এভাবে বিন্দুবালা এক সংগ্রামী উন্মূলিত নারীর প্রতিনিধিত্ব করে। বিন্দুবালার এই শেকড় হারানোর যন্ত্রণা কেবল তাঁর জীবনঅভিজ্ঞতাই নয়; বরং তাঁর সামষ্টিক জীবনচিন্তার মূলে থাকে এই যাতনা: 'বিন্দুর স্বামী রামলালের আবাস কোথায়? বিয়ের মন্ত্র পড়ানোর সময় শুধু শুনেছিল – বালিয়া আস্‌তান। বালিয়া কোন দেশ? কতদূর? তার স্বামীও জানত না।'[৪২] এ কারণে উন্মূল নারী বিন্দুবালার একমাত্র স্বপ্ন একখণ্ড জমি। এ স্বপ্নপূরণে নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়োজিত থাকে সে। বিন্দুবালা প্রকৃতপক্ষেই সাবঅল্টার্ন নারীর প্রতিভূ।

লেখকের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতায় লেখা হয়েছে বেশ কয়েকটি গল্প। 'পাচার' গল্পের জেসমিনের সংকট আত্মপরিচয়ের। পনেরো বছর বয়সে ঢাকা থেকে ভারতে পাচার হওয়া জেসমিন জীবনের দুঃখবোধ ভুলতে বিশ বছর পরে দেশে ফিরে আবিষ্কার করে তার স্মৃতিরা লুণ্ঠিত হয়ে গেছে সময়ের প্রতাপে। জেসমিনের অনিশ্চিত অস্তিত্বভাবনায় বেদনাবোধেরও কোনো স্থান হয় না। নারী ও শিশু পাচার তৃতীয় বিশ্বের এক ভয়াবহ সত্য। পাচারকৃত মানুষ রাষ্ট্রের খাতায় কেবল একটি সংখ্যামাত্র। 'পাচার' গল্পে লেখক একেবারেই অনুপস্থিত থাকেন। জেসমিন চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত গল্পটিতে সাবঅল্টার্ন নারীর মনস্তত্ত্ব উন্মোচিত হয়েছে। 'মানবকেন্দ্রিকতাবাদ মানুষের মাঝে যে অহংবোধ বা স্বজাত্যবাদী ধারণা তৈরি করে তা প্রকৃতি ও নারীকে অবদমন ও কর্তৃত্বের মূল্যবোধ

সৃষ্টিতে সাহায্য করে।'[৪৩] জেসমিনের গল্পের উৎস লেখকের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত বলে অনুমেয়।

'অপরপক্ষ' এক সংগ্রামী নারীর জীবনালেখ্য। গল্পকারের কর্মজগতের অভিজ্ঞতা গল্পটির জন্মভূমি। বাস্তবতার নির্মমতা গল্পের মূল রসদ হলেও গল্পের প্রাণ মেহেরজানের প্রতিবাদী সত্তা। গল্পের মূল চরিত্র মেহেরজান বা সুফিয়া গ্রামীণ সম্পত্তিগত বিরোধের জের ধরে মর্মান্তিক শারীরিক নিগ্রহ ও যৌননির্যাতনের শিকার হয়। 'কিন্তু যার ইজ্জতের বিনিময়ে, অত্যাচারের বিনিময়ে নয়া আইনকানুন জারি হবে, সে নিজে কী পেয়েছে? ভুঁইয়ের অধিকার তো ফিরে পায়নি।'[৪৪] ভয়াবহ রোগে ভুগে জরায়ু হারিয়ে পাঁচ বছরের মধ্যে মারা যায় সে। আইন ও বিচার ব্যবস্থায় নিজের পৈতৃক ভুঁই বাঁচাতে যে সাহসী ও সংগ্রামী ভূমিকায় সে অবতীর্ণ হয়, তা বাঙালি নারীর অনন্য সাহসিকতার দৃষ্টান্ত। প্রান্তবর্তী সমাজের নারীর জন্য আইনি সহায়তা লাভ করা কতটা কঠিন ও দ্বান্দ্বিক, তার স্বরূপ আছে এই গল্পে। জেলখানায় নারী কয়েদির দুঃসহ জীবনের বর্ণনা আছে। প্রত্যন্ত গ্রামের নারী সুফিয়ার মাটির প্রতি যে গভীর মমত্ববোধ, তা তার অস্তিত্বচিন্তার মর্মমূলে প্রোথিত এক অধিকারবোধেরই রূপায়ণ। তৃতীয় বিশ্বের নারীর সংগ্রাম মূলত নিজের ও সন্তান-সন্ততির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার যুদ্ধ। সপ্রসঙ্গ লেখকের উক্তি: 'মেয়েদের জীবনটাই তো আন্দোলনের, বিদ্রোহের এক সম্ভাবনাময় আধার।'[৪৫] নারীর এই সংগ্রাম বাংলাদেশের আর্থসামাজিক বাস্তবতার একটি জীবন্ত উপাদান; সমালোচক যাকে একটি পুরুষতান্ত্রিক অবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন:

> আমাদের চারপাশে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবার মধ্যে এই বোধ আছে যে, মেয়েদের দেয়া যাবে না। কেন দেয়া যাবে না তার কিন্তু কোনো ব্যাখ্যা নেই। যে পুরুষের সম্পত্তি নাই, সেও উত্তেজিত, তার মনে হচ্ছে পুরুষ হিসেবে তার একটা অধিকার একটা জায়গা কেড়ে নেয়া হচ্ছে। এটা হচ্ছে মনোজগত, সংস্কৃতি, মতাদর্শ, পুরুষতন্ত্রের দাপট। এটা একটা অবস্থা।[৪৬]

'শিস' গল্পের জগৎ আশির দশকের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিস্তৃত। ছাত্রজীবনে একই ছাত্রীহলে থাকা মীরা ও আমরিন পুরোপুরি বিপরীত ধারার মানুষ হলেও উপেক্ষিত নারীত্বের আশাহীনতা ও অপ্রাপ্তির প্রেক্ষাপটে তারা একীভূত হয়। জীবনবোধের পার্থক্য এই দুই বিপরীত স্বভাবের নারীর জীবনে অনেক বেশি প্রভাব ফেলতে পারে না। তারা দুজনেই অসুখী এবং সেখানেই তারা সমান্তরাল। মীরা ও আমরিনের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে একে অন্যের বর্ণনায় শেষ পর্যন্ত নারীর প্রতি নারীর গভীর শ্রদ্ধাবোধ পরিলক্ষিত হয়। রাজনীতি-সচেতন লেখকের গল্পে সত্তর দশকের শেষের রাজনৈতিক পরিবেশে আমরিনের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহ তৎকালীন বাংলাদেশের রাজনীতিকে নারীর চোখে দেখার সুযোগ পায় পাঠক। ছাত্রী হলের রাজনীতির ছবি আছে হলের নেত্রী চরিত্রে। সাধারণ মেধাবী ছাত্রী মীরার দুশ্চিন্তায় আশির দশকের রাজনীতি তার অস্তিত্ব জানান দেয়:

> তখন জলপাইরঙা পোশাকের তল থেকে সবে ছাত্ররাজনীতির বাচ্চা ফুটেছে। জারুল-কৃষ্ণচূড়ার ছায়াতল প্রকম্পিত করে হলের সামনে মোটরবাইকের আনাগোনা। আরোহীরা আমাদেরই সহপাঠী। ক্লাস-টিউটোরিয়ালের বালাই নেই। সরকারি ছাত্রদলের খাতায় নাম লিখিয়ে রাতারাতি নেতা বনে গেছে।[৪৭]

আশির দশকের উত্তাল রাজনীতির পটপরিবর্তন, ছাত্ররাজনীতির বিচিত্র ধারা, রাজনৈতিক নেতা ও মন্ত্রীর সঙ্গে ছাত্রীর সম্পর্ক, হল-প্রশাসনের ব্যর্থতা প্রভৃতি তথ্যে গল্পটি সমৃদ্ধ।

'ঠাণ্ডা চা' গল্পের রোজি, 'হাতপাখা' গল্পের খালাআম্মা, 'নাস্তিক' গল্পের নানীমা – এই চরিত্ররা নারী হিসেবে মুখোমুখি হয়েছে বহুবিধ জীবন-সংকটের। সংকটের মুখে এরা কখনো মুষড়ে পড়ে, আবার কখনো ঘুরে দাঁড়ায় নারীর সহজাত পরিশ্রমী ও সহনশীলতার শক্তিকে আশ্রয় করে। 'ভালোবাসার পরিধি' গল্পে ইতিহাসের সমান্তরালে দৃঢ়চেতা জীবনসংগ্রামী এক নারীর আখ্যান বর্ণনা করেছেন শাহীন আখতার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডিটেইলড বর্ণনা এই গল্পটিকে সমৃদ্ধ করেছে। এগারো বছর বয়সে বিয়ে হলে মেয়েটির ভুবন গড়ে ওঠে বাঙালি নারীর সংসার-সম্পৃক্ততার অভ্যস্ততায়। যুদ্ধরত স্বামীর অনুপস্থিতিতে এই নারীর কাছে সাংসারিক কর্মলিপ্ততা অস্তিত্বের সমান অর্থবাহী। বৈবাহিক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী স্বামীর সংসার বৈরাগ্য ও একাকী জীবনযুদ্ধের নির্মমতার প্রতিচেতনায় ক্রমশ নির্বিকার, রূঢ় আর আবেগশূন্য হয়ে নিত্যতার মধ্যে সংসারযাপনকেই জীবনের সারসত্য জ্ঞান করেছে সে। এই নারীকে সকল বিপদে সহনশীল ও সকল দায়িত্বে নিষ্ঠ নারী হিসেবে চিত্রায়িত করেছেন গল্পকার। বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও অভিঘাত নারীটির জীবনের পরিণতির নির্ণায়ক। ফৌজির জীবন, ঔপনিবেশিকতা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, সৈনিকের সমকামিতা প্রভৃতি প্রসঙ্গে স্বামীর অভিজ্ঞতা চিঠির মাধ্যমে জানতে পারে নারীটি:

> তাঁবুতে শুয়ে খালাম্মার স্বামীর নিজেকে মনে হয় কীটাণু কীট বা ফৌজি পোশাকে ভাড়া-খাটা চাকর, নিজের তনু-মনের ওপর যার হক নাই। ইংরেজের ডেকে আনা দুর্ভিক্ষে তাঁর দেশের লোক মাছির মতো মারা যাচ্ছে। বিনা প্রতিরোধে জাপানি ফৌজ ইম্ফল ডিঙিয়ে পাহাড়ে-অরণ্যে-লোকালয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। কোহিমার পতন যখন-তখন। যুদ্ধাক্রান্ত মানুষগুলো তো নেটিভ, ওদের জীবনের মূল্য কী! বোবা রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে খালাম্মার স্বামী ভাবেন, বেকার হোস্টেলের সেই সঙ্গীরা আজ কোথায়, যারা একদিন থিয়েটার রোড দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে স্বপ্ন দেখেছিল – ইংরেজের অস্ত্র দিয়ে ইংরেজ খেদানোর![৪৮]

শেষ জীবনে স্বামীর প্রণয়ী শঙ্করণের সঙ্গে সাক্ষাতেও ভালোবাসার বিপুল পরিধিতে তাকে অবিচল, বিকারহীন, সহমর্মী ও ক্ষমাশীল হিসেবে দেখান গল্পকার।

শাহীন আখতারের বেশ কিছু ছোটগল্প নারীর সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণের তথা সরাসরি যুদ্ধের কাহিনি নিয়ে রচিত। নারীমুক্তিযোদ্ধার বীরত্বের আখ্যান বাংলা সাহিত্যে দুর্নিরীক্ষ্য। মেয়েদের মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা চিত্রিত হতে দেখা যায় পুরুষতান্ত্রিক প্রেক্ষণবিন্দু থেকে। এ ক্ষেত্রেও শাহীন আখতার স্বতন্ত্র। 'আমিরজানবিবির সংবর্ধনা', 'পাঁচটা কাক ও বীরাঙ্গনা', 'তিনি গুঁড়ো মরিচের ব্যবহার জানতেন' গল্পে তিনি মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনা নারীর ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। নারী-মুক্তিযোদ্ধারা অনেক ক্ষেত্রেই সম্মান পাননি; বরং সামাজিকভাবে তাঁদের নানা ঘৃণিত প্রশ্নে জর্জরিত করা হয়েছে; শারীরিক শুদ্ধতার প্রসঙ্গে অসম্মান করা হয়েছে। 'আমিরজান বিবির সংবর্ধনা' গল্পে নারী-মুক্তিযোদ্ধাকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সামাজিক প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে দেখা যায়। গল্পে মুক্তিযোদ্ধা বদর আলীর কণ্ঠেও সেই ক্ষোভ ঝরে পড়ে: 'দেশ স্বাধীন হইছে তাদের জন্য, যারা এদেশের বিপক্ষে ছিল।'[৪৯] সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তথাকথিত সাংবাদিক প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে আমিরজান বিবিকে। নারী মুক্তিযোদ্ধার বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস সাংবাদিকের লক্ষ্য নয়; বরং নারী

নিগ্রহের রগরগে বিবরণ চায় পত্রিকা। সংবর্ধনা পেয়ে গ্রামে ফিরলে গ্রামের মানুষেরা আমিরজানের প্রতি বিন্দুমাত্র ফিরেও তাকায় না; বরং ব্যস্ত থাকে সাতখুন ও দশ ধর্ষণের অপরাজনীতির চর্চাকারী আসামি নেতাকে নিয়ে। এই প্রতীকী ঘটনাংশ থেকে প্রতীয়মান হয় নারী-মুক্তিযোদ্ধরা সমাজে কতটা অবমূল্যায়িত হয়েছেন।

উপসংহার

শাহীন আখতার তাঁর ছোটগল্পে নারীকে কীভাবে দেখতে চান – নারী হিসেবে, নাকি মানুষ হিসেবে? – সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে বিভিন্ন নারীবাদী তত্ত্বের তুলনা-প্রতিতুলনার মধ্য দিয়ে। এইসব তত্ত্বের বিভিন্ন প্রান্ত শাহীন আখতারের ছোটগল্পে অর্গ্যানিকভাবে উপস্থিত থাকে। নারীবাদের একটি প্রাথমিক পর্ব উদারনৈতিক নারীবাদ। এক অর্থে এই মতবাদ উদারনৈতিক মানবতাবাদেরই অংশ। তাই উদারনৈতিক নারীবাদ নারীকে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট থাকে। অপরদিকে র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ প্রচলিত অনেক তত্ত্ব ও মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করে। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ দ্বারা প্রত্যাখ্যাতদের মধ্যে উদারনৈতিক মানবতাবাদও আছে। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ নারীকে নারী হিসেবেই প্রতিষ্ঠা করতে চায়; কেবল মানুষ হিসেবে নয়। বাংলাদেশের স্থানিক পটভূমি ও আর্থরাজনৈতিক বাস্তবতায় শাহীন আখতারের ছোটগল্পে যেসব পেশাজীবী নারী, নারীর জন্য নারী, শরীর-সচেতন নারী, অধিকার-কাঙ্ক্ষী নারীদের দেখা যায়, তাদের নির্মাণের মধ্য দিয়ে লেখকের নারীকে নিজস্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে নারী-অধিকার এত সংকুচিত ও স্বরহীন যে, এখানে কেবল উদারনৈতিক মানবতাবাদী দৃষ্টি দিয়ে মেয়েদের সমস্যাকে সার্থকভাবে চিহ্নিত করা যায় না। তাই বাস্তবতার পটভূমিতে এগুতে হয় বাড়তি সাহসিকতা নিয়ে। শাহীন আখতাররের গল্পকার সত্তার মধ্যে এই সাহসিকতা আছে। তাঁর রচিত গল্পগুচ্ছকে র‍্যাডিক্যাল বলেও এককভাবে বর্গভুক্ত করা যায় না। মূলত নারীবাদের বিভিন্ন উপাদান শাহীন আখতারের ছোটগল্পে উপস্থিত থাকলেও কোনো একক তত্ত্বের অনুগামী তিনি নন। বরং তাঁর স্বসমাজ, পরিপার্শ্বের বাস্তবতার মধ্য দিয়ে তিনি যে বয়ান নির্মাণ করেন তাঁর ছোটগল্পে, সেখানে তত্ত্বের সমান্তরালে সামাজিক ও মানবিক দায়বদ্ধতাও উপলব্ধি করা যায়। নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি, পুরুষশাসিত সমাজে নারীর পুরুষ-নিরপেক্ষ অবস্থান তৈরির চেষ্টা, বিভিন্ন সামাজিক ট্যাবু ভাঙা – এই প্রসঙ্গগুলোকে ছোটগল্পের পরিসরে ব্যক্ত করেছেন লেখক। তিনি দেখিয়েছেন গ্রামীণ ও শাহরিক নারীর পরিস্থিতিগত বৈভিন্ন্য এবং নারীত্বের অভিন্নতা; একই সঙ্গে নারীসত্তার সম্মিলন প্রত্যাশা করেছেন। তাঁর গল্পে যেমন আছে গ্রামীণ প্রতিবেশে স্বাবলম্বী নারীদের কথা, একইসঙ্গে আছে নাগরিক পরিসরে অর্থনৈতিকভাবে অবলম্বনহীন নারীদের বিপর্যস্ত জীবন-কথন। নারীর সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্ককেও শাহীন আখতারের গল্পে অনুভব করা যায়। তিনি যেমন তাঁর একাধিক চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেখান নারী-সমকামের প্রতি নারীর অবস্থান; কিন্তু বাংলাদেশের আর্থসামাজিক বাস্তবতার কারণেই হয়তো তার পরিপূর্ণতা বা পরিণতির রূপদান করেন না। শাহীন আখতারের গল্পে আছে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বের নারীদের উচ্চারণ। এসবকিছু নিয়ে যে সামষ্টিকতা তৈরি হয়, তা বৃহত্তর অর্থে নারীবাদী সাহিত্য। কিন্তু নারীবাদের বিচিত্র ধারা নারীজীবন,

নারীর শরীর ও মনন, নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততা প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যাকে চিহ্নিত করলেও একরৈখিক কোনো সমাধানের পথনির্দেশ করে না। নারীবাদ এমন চিন্তাগুচ্ছ, যা মূলত চলমান; এবং ক্রমপ্রসারমাণ। শাহীন আখতারের ছোটগল্পও একমুখী বা একরৈখিক নয়। তাঁর গল্পপরিধির প্রধান অংশ জুড়ে থাকে নারী – বিচিত্র প্রতিবেশে তিনি নারীর বহুমাত্রিক প্রতিমা নির্মাণ করেন এবং নারীর নিজস্ব স্বর নির্মাণ করতে সচেষ্ট থাকেন। এই বিবেচনায় শাহীন আখতারের নারীভাবনা তত্ত্বকে অতিক্রম করে গেছে; নারীবাদী ডিসকোর্সের কাঠামোপরিধির বাইরে জীবন্ত মানুষ হয়ে বাঙালি নারী বিচিত্র রং-রূপে হাজির হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে নারীজীবনের সংকট ও সম্ভাবনার বিচিত্র প্রান্ত উন্মোচিত হয়। বাংলাদেশের নারীর নিজস্ব সমস্যা ও স্বতন্ত্র ঐতিহ্যবোধ শাহীন আখতারের গল্পকাঠামোর ভেতর দিয়ে যেভাবে ধরা পড়ে, তা বিশ্বের অপরাপর দেশের নারীবাদী সাহিত্যের বড় পরিসরের অংশ হয়েও বাংলাদেশের নারীকে স্বতন্ত্র স্বরে চিহ্নিত করে। এখানেই নারীবিশ্ব নির্মাণে ছোটগল্পকার হিসেবে শাহীন আখতারের সার্থকতা ও স্বকীয়তা।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১ শাহীন আখতার রচিত (২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত) গল্পগ্রন্থগুলো হলো: *শ্রীমতীর জীবনদর্শন* (১৯৯৭), *বোনের সঙ্গে অমরলোকে* (২০০১), *১৫টি গল্প* (২০০৪), *আবারও প্রেম আসছে* (২০০৬), *গল্পসমগ্র ১* (২০০৮), *শিস ও অন্যান্য গল্প* (২০১৩) ও *ভালোবাসার পরিধি* (২০২০)। লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহে গল্পসংখ্যা প্রায় চল্লিশটি। এই সময়পর্বে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর পাঁচটি প্রতিনিধিত্বশীল উপন্যাস এবং বেশ কিছু সম্পাদনা-গ্রন্থ। শাহীন আখতারের সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: *জানানা মহ্‌ফিল: বাঙালি মুসলমান লেখিকাদের নির্বাচিত রচনা*, *নারীর একাত্তর ও যুদ্ধপরবর্তী কথাকাহিনি*, *সতী ও স্বতন্তরা: বাংলা সাহিত্যে নারী*। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের এই তালিকা নাতিদীর্ঘ হলেও তাৎপর্যপূর্ণ।

২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নারী', *কালান্তর*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪০০, পৃ. ৩৬৪

৩ আমিনুর রহমান সুলতান, 'শিস ও অনান্য গল্প: সময়, জীবন ও বাস্তবতা', *পাতাদের সংসার*, শাহীন আখতার সংখ্যা, ৯ম বর্ষ, ৩১তম সংখ্যা, সম্পাদক: হারুন পাশা, ঢাকা, ২০২২, পৃ. ১৮৩

৪ দুপুর মিত্র, '*লেখার মাঝপথেই আমি বদলাই বা লেখার ফাঁকে ফাঁকে*', *পাতাদের সংসার*, শাহীন আখতার সংখ্যা, ৯ম বর্ষ, ৩১তম সংখ্যা, সম্পাদক: হারুন পাশা, ঢাকা, ২০২২, পৃ. ২৪৪

৫ Elora Shehabuddin, *Sisters in the Mirror: A History of Muslim Women and the Global Politics of Feminism*, University Press Limited, Dhaka, 2022, p. 6-7

৬ শাহীন আখতার, 'সম্পাদকের নিবেদন', *সতী ও স্বতন্তরা: বাংলা সাহিত্যে নারী (দ্বিতীয় খণ্ড)*, সম্পাদনা: শাহীন আখতার, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১২, পৃ. আঠাশ

৭ আনিসুজ্জামান, 'মুখবন্ধ', *সতী ও স্বতন্তরা: বাংলা সাহিত্যে নারী (দ্বিতীয় খণ্ড)*, পূর্বোক্ত, পৃ. চৌদ্দ

৮ বাংলাদেশ-পর্বে নারী-লেখকদের মধ্যে জাহানারা ইমাম (১৯২৯-১৯৯৪), রাবেয়া খাতুন (১৯৩৫-২০২১), দিলারা হাশেম (১৯৩৬-২০২২), রাজিয়া খান (১৯৩৬-২০১১), মকবুলা মঞ্জুর (১৯৩৮-২০২০), রিজিয়া রহমান (১৯৩৯-২০১৯), আনোয়ারা সৈয়দ হক (জ. ১৯৪০), সেলিনা হোসেন (জ. ১৯৪৭), শামীম আজাদ (জ. ১৯৫২), আকিমুন রহমান (জ. ১৯৬০), শাহীন আখতার (জ. ১৯৬২), তসলিমা নাসরিন (জ. ১৯৬২), নাসরীন জাহান (জ. ১৯৬৪), পাপড়ি রহমান (জ. ১৯৬৫), আফসানা বেগম (জ. ১৯৭২), অদিতি ফাল্গুনী (জ. ১৯৭৪) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

[৯] Peter Barry, `Feminist criticism and language', *Beginning THEORY: An Introduction to Literary and Cultural Theory*, Third Edition, Viva Books Private Limited, New Delhi, India, 2013, p. 121

[১০] Ruth Robbins, *Literary Feminisms*, Palgrave, New York, USA, Reprinted, 2017, p. 71

[১১] হারুন পাশা, 'শাহীন আখতারের গল্পের বিষয়-আশয়', *পাতাদের সংসার*, শাহীন আখতার সংখ্যা, ৯ম বর্ষ, ৩১তম সংখ্যা, সম্পাদক: হারুন পাশা, ঢাকা, ২০২২, পৃ. ১৬৬

[১২] বেগম আকতার কামাল, 'সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নারী', *বীজমন্ত্র*, সপ্তম সংখ্যা, সম্পাদক: রাফাত মিশু, সেপ্টেম্বর ২০১১, ঢাকা, পৃ. ৫

[১৩] সোহানা মাহবুব, 'পরিবেশ-নারীবাদ তত্ত্বের আলোকে অমিয়ভূষণ মজুমদারের *সোঁদাল*: একটি পর্যালোচনা', *সাহিত্য পত্রিকা*, বর্ষ ৫৭, সংখ্যা ১-২, সম্পাদক: সৈয়দ আজিজুল হক, ফেব্রুয়ারি ২০২২, পৃ. ৩৩

[১৪] শাহীন আখতার, *গল্পসমগ্র ১*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৩৮

[১৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

[১৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

[১৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

[১৮] চিমামান্দা এনগোজি আদিচি, *আমাদের সবার নারীবাদী হওয়া উচিত এবং একটি নারীবাদী ঘোষণাপত্র*, অনুবাদ: শিমিন মুশশারাত, বাতিঘর, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, ২০২২, পৃ. ৪২

[১৯] শাহীন আখতার, *ভালোবাসার পরিধি*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০২০, পৃ. ৪৭

[২০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

[২১] Hameeda Hossain, *CLAIMING OUR RIGHTS: Feminist Discourses in Bangladesh and South Asia*, University Press Limited, Dhaka, 2023, p. 136

[২২] শাহীন আখতার, পূর্বোক্ত, ২০১৬, পৃ. ২১৩

[২৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪

[২৪] Rosemarie Tong, *Feminist Thought: A more Comprehensive Introduction*, Fourth Edition, Westview Press, Boulder, USA, 2014, p. 73

[২৫] শাহীন আখতার, পূর্বোক্ত, ২০১৬, পৃ. ৭৯

[২৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

[২৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

[২৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

[২৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

[৩০] অদিতি ফাল্গুনী, *খসড়াখাতা: নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও বিবিধ প্রসঙ্গ*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১৩

[৩১] মাসুদুজ্জামান, *নারী যৌনতা রাজনীতি*, বেঙ্গল পাবলিকেশনস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৪৯

[৩২] শাহীন আখতার, পূর্বোক্ত, ২০১৬, পৃ. ৬৫

[৩৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

[৩৪] 'ট্রান্সফোবিয়া' হচ্ছে একগুচ্ছ নেতিবাদী মনোভঙ্গির সমষ্টি, যা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের জন্য একটি সাম্যমূলক বিশ্ব গড়ে তুলতে প্রতিনিয়ত বাধা প্রদান করে চলেছে। ট্রান্সফোবিয়া শব্দটি একটি সামাজিক বৈষম্য হিসেবে বিবেচনাযোগ্য। এটি একটি সামাজিক আচরণগত সমস্যা, যেখানে প্রথাগত লিঙ্গধারণার ঐতিহ্য মেনে না চলা ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়ে থাকে। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত জেন্ডারপরিচয়-অস্বীকারকারী, লিঙ্গ পরিবর্তনকারী, জেন্ডার-নিরপেক্ষ পোশাক পরিধানকারী, বাংলাদেশে হিজড়া জনগোষ্ঠীভুক্ত বলে পরিচিত তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ – এই শ্রেণিসমষ্টি ট্রান্সফোবিয়ার প্রত্যক্ষ শিকার। বর্তমান প্রবন্ধে শাহীন আখতারের ছোটগল্পে বিধৃত বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের প্রতি ট্রান্সফোবিয়া কীভাবে কার্যকর থাকে, সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

[৩৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

[৩৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

[৩৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

[৩৮] রাশিদা আখতার খানম, 'নারীবাদী তত্ত্ব ও মতিজানের মেয়েরা', *বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্ব*, সম্পাদনা: বেগম আকতার কামাল, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২৪৮

[৩৯] শাহীন আখতার, পূর্বোক্ত, ২০১৬, পৃ. ৮৮

[৪০] মাসুদ রহমান, *নিসর্গ-নারীবাদ*, ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০২২, পৃ. ২১

[৪১] শাহীন আখতার, পূর্বোক্ত, ২০১৬, পৃ. ৪১

[৪২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

[৪৩] মন্দিরা চৌধুরী, 'প্রকৃতি ও নারী: একটি নীতি-দার্শনিক মূল্যায়ন', *দর্শন ও প্রগতি*, বর্ষ ৩৯, ১ম ও ২য় সংখ্যা, সম্পাদক: শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০২২, পৃ. ৯৬

[৪৪] শাহীন আখতার, পূর্বোক্ত, ২০১৬, পৃ. ২৩৪

[৪৫] শাহীন আখতার, 'সূর্যাস্ত আইন: এক দশক আগে-পরে', *গদ্যসংগ্রহ ১*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৭৮

[৪৬] আনু মুহাম্মদ, *নারী, পুরুষ ও সমাজ*, সংহতি, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ২২২

[৪৭] শাহীন আখতার, *শিস ও অন্যান্য গল্প*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১১

[৪৮] শাহীন আখতার, পূর্বোক্ত, ২০২০, পৃ. ১৬

[৪৯] শাহীন আখতার, পূর্বোক্ত, ২০১৬, পৃ. ১৪৫

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বিয়াল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩১/ডিসেম্বর ২০২৪

শিশুদের অঙ্কন বিশ্লেষণ : বোধ ও সৃজনশীলতার পারস্পরিক সম্পর্ক অন্বেষণ

জেনিফার জাহান*

সারসংক্ষেপ

চিত্রাঙ্কন অভাষিক যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম যা শিশুদের জন্য আকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক এবং উপভোগ্য বিষয়। শিশুদের অঙ্কন বিশ্লেষণ তাই একটি কৌতূহলোদ্দীপক ও গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানক্ষেত্র যা একইসাথে তাদের বোধ, মনস্তত্ত্ব এবং সৃজনশীলতা বিকাশের অনন্য দিকগুলো উপস্থাপন করতে পারে। একটি শিশু কীভাবে অঙ্কিত ছবির মাধ্যমে তার বিশ্বকে অনুধাবন এবং মৌখিক ভাষা ব্যবহার না করে তা উপস্থাপন করে, জানতে হলে অঙ্কিত ছবি বিশ্লেষণ হতে পারে একটি চমৎকার মাধ্যম। বর্তমান প্রবন্ধে গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে ২-১৩ বছর বয়সী শিশুদের আঁকা বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ ছবি প্রত্যক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে তাদের ভাষা, অস্ফুট চিন্তা-চেতনা, বোধ এবং সৃজনশীলতার স্বরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। শিশুর অভাষিক সক্ষমতা কীভাবে বোধগত প্রক্রিয়াগুলোকে আকার দিতে পারে বা তার বিপরীত– সেটা এ প্রবন্ধে অনুসন্ধান করা হবে। এই গবেষণার ফলাফল ভাষাবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদদের জন্য হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাক্ষেত্র ও দিকনির্দেশক ।

চাবি শব্দ: শিশু, অঙ্কন, ভাষাবোধ, সৃজনশীলতা, অভাষিক দক্ষতা।

১. ভূমিকা

শিশুদের নতুন ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার জন্য অঙ্কন বিশ্লেষণ একটি গতিশীল মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। গবেষণায় দেখা গেছে, শিশুরা সহজাতভাবে খেলা, ছবি আঁকা এবং অন্যান্য মাধ্যমে তাদের প্রশ্নের সমাধান খোঁজে।[১] ১৯৯৪ সালে সম্পন্ন একটি গবেষণায় দেখা গেছে শিশুরা কথা বলা, লেখা, নড়াচড়া এবং শব্দের সাথে অঙ্কনকেও একীভূত করে এবং ছবি আঁকার সময় তাদের সৃজনশীলতা এবং কল্পনাশক্তি ব্যবহার করার ফলে তাদের বোধের বিকাশও ঘটে একই সাথে।[২] কাগজে আঁকা প্রথম বিচ্ছিন্ন দাগ এবং আকৃতিগুলো থেকে শুরু করে একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি, সবকিছুতেই শিশুরা চেষ্টা করে তাদের অভিজ্ঞতা অনুসারে চারপাশের পৃথিবীকে উপস্থাপন করতে এবং কোনো অর্থ প্রকাশ করতে।[৩] বর্তমান গবেষণাতে তাই শিশুদের আঁকা ছবিকেই প্রাথমিক উপাত্ত হিসেবে গ্রহণ করে বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে অভাষিক ছবির এবং শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের পারস্পরিক সম্পর্ক।

১.১ শিশুদের অঙ্কন অধ্যয়ন

উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকেই শিশুদের অঙ্কিত ছবি এবং এ বিষয়ক গবেষণা শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষকদের আকৃষ্ট করেছে। তখন থেকেই শিক্ষা, শৈলী এবং চিকিৎসাজনিত কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এ জ্ঞান শাখাটি । তবে, লোয়েনফেল্ড সর্বপ্রথম শিশুদের শিল্প এবং শৈল্পিক অভিব্যক্তির

* সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মধ্যবর্তী সম্পর্ক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন; তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশ তাদের সৃজনশীল বিকাশের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।[৪]

লোয়েনফেল্ড এবং তার সহগবেষকদের মতে, শিশুরা কোনো একটি ছবি আঁকার উপকরণ ধরতে শেখা মাত্রই শুরু করে তাদের শিল্প যাত্রা। কাগজ, পেন্সিল বা রং তুলি তার কাছে হতে পারে সবচেয়ে প্রিয় অভিজ্ঞতা বা গভীর কোনো ভীতি প্রকাশের হাতিয়ার। তাঁরা আরও বলেন যে, ছবি আঁকার সময় যখন শিশুরা অন্যদের সাথে সংজ্ঞাপন করে তখন তাদের সামাজিক বিকাশও ঘটে যা শিশুদের সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করে।[৫] লুইস, গ্রিন এবং চেম্বারস তাঁদের গবেষণায় দেখিয়েছেন যে শিশুরা তাদের কল্পনা এবং তাদের চিন্তা-অনুভূতির মাঝে সমন্বয় করতে পারে, তাই একটি অঙ্কিত ছবি বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিশুদের মনে জমে থাকা অব্যক্ত অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ করা সম্ভব।[৬]

১.১.১. সংস্কৃতিভেদে শিশুদের অঙ্কন: শিশুদের অভিব্যক্তি প্রকাশ মূলত তার সহজাত প্রবৃত্তির অংশ। তারা খুব সতর্কতার সাথে রং, আকৃতি, রূপ, উপকরণ নির্বাচন করে তাদের ছবির জন্য। ১৯৭০ সালে রোদা কেলগ নামে একজন গবেষক শিশুদের অঙ্কিত ছবি নিয়ে গবেষণা করেন এবং বলেন যে তাদের অঙ্কনের মধ্যে সার্বজনীনতা আছে, ছবির রূপ কেবল দেশভেদে পরিবর্তিত হয়, কিন্তু শিশুদের হৃদয়ের রূপ একটি থাকে।[৭] তবে ব্রাউন (১৯৯২) বলেন যে সংস্কৃতিভেদে শিশুদের শুধু ছবির বিষয়বস্তুই নয়, ছবি আঁকার রীতি ও ধরনও ভিন্ন হয়; দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি শিশুদের যেভাবে প্রভাবিত করে, তাই তার ছবিতে অভিব্যক্ত হয়।[৮] সোফি তার গবেষণায় ৩৫টি দেশের ২-১৫ বছর বয়সী বাচ্চাদের আঁকা পোর্ট্রেট বিশ্লেষণ করে মোট ১৩ ধরনের বৈচিত্র্যের সন্ধান পান এবং এ থেকে তারা নিশ্চিত হোন যে বয়স, লিঙ্গ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং সংস্কৃতির সাথে শিশুদের আঁকা ছবি সরাসরি সম্পর্কিত।[৯]

বাংলাভাষী শিশুদের চিত্রাঙ্কন বিশ্লেষণ বিষয়ক বাংলাদেশ ও ভারতীয় গবেষকদেরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ পাওয়া যায়। প্রবন্ধগুলো লক্ষ করলে দেখা যায় যে, চিত্রাঙ্কনের সাথে জড়িত শিশুদের অভিজ্ঞতা, আবেগ, বোধ, মানসিকস্বাস্থ্য, আর্ট-থেরাপি ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছে। এছাড়াও শিশুদের অঙ্কনে সাংস্কৃতিক প্রতিবেশের প্রভাব অথবা লিঙ্গ ও আর্থসামাজিক অবস্থানের প্রতিফলনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন প্রবন্ধে। নাসিমা (২০১৭)[১০] এবং রুমা (২০১৮)[১১] তাঁদের প্রবন্ধে দেখিয়েছেন কীভাবে পারিবারিক কাঠামো ও মানসিকস্বাস্থ্য শিশুদের চিত্রাঙ্কনে প্রভাব ফেলে; সত্যব্রত (২০১৯)[১২] আলোচনা করেছেন শিশুদের ছবিতে সাংস্কৃতিক প্রতিফলন। সুপর্ণা (২০২০)[১৩] তুলে ধরেছেন, শিশুদের মানসিকস্বাস্থ্য বিকাশে আর্টথেরাপির ভূমিকা সম্পর্কে এবং অধ্যাপক ফারজানা একই সালে রচিত তাঁর প্রবন্ধে বাংলাদেশি শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুদের অঙ্কনের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন।[১৪] এই প্রবন্ধগুলোতে শিশুদের অঙ্কনকে একটি শিক্ষামূলক ও থেরাপির মাধ্যম হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়েছে যা, তাদের মানসিক ও সৃজনশীল বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও বাঙালি শিশুদের অঙ্কনে মানসিক ট্রমা, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিফলন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব, লিঙ্গ ও আর্থসামাজিক বৈষম্যের প্রতিফলন, জাতীয় প্রতীক ও পরিচয়ের প্রতিফলন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় বিষয়নির্ভর বেশ কিছু গবেষণা প্রবন্ধ রয়েছে।

১.৩. গবেষণার উদ্দেশ্য

উল্লিখিত গবেষণাগুলোতে দেখা গেছে যে শিশুদের চিত্রাঙ্কন দক্ষতা বিকশিত হয় বিভিন্ন ধাপে এবং শিশুদের বোধ, মনোবিকাশ, মোটর-দক্ষতা (motor-skill) এমনকি সামাজিক মনস্তত্ত্বের বিকাশের সাথে এটি সরাসরি সম্পর্কিত। শিশুরা ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি প্রকাশ করা ছাড়াও সংজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসেবে চিত্রাঙ্কন বেছে নেয়; মুখে বলা সম্ভব হয় না যে কথাগুলো, শিশুরা চেষ্টা করে তা ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে। বাক প্রকাশ এবং খেলাধুলার মতোই একটি শিশুর অব্যক্ত ভাষা, মনোভাব, মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা প্রকাশের ক্ষেত্রে মুখের ভাষা ব্যবহারের চেয়ে অঙ্কিত ছবি হয় বেশি কার্যকর।

এ কারণে শিশুদের অঙ্কন বিশ্লেষণ গবেষক, ভাষাবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ বা মনোবিজ্ঞানীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যয়ন ক্ষেত্র। বর্তমান প্রবন্ধে তাই শিশুদের আঁকা কিছু ছবি বিশ্লেষণ করে দেখানো হবে কীভাবে শিশু তার অভিজ্ঞতা, অব্যক্ত ভাষা এবং অভিব্যক্তির প্রতিফলন ঘটাতে পারে ছবির ভাষায়। এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, শিশুদের কল্পিত ছবির কোন ভুল বা ত্রুটি হয় না কারণ, শিশুর নিজস্ব বিশ্ববীক্ষণেরই বহিঃপ্রকাশ তার আঁকা ছবি। বর্তমান গবেষণার লক্ষ্য তাই শিশুদের আঁকা ছবি বিশ্লেষণ করে এর সাথে জড়িয়ে থাকা শিশুর বোধ ও সৃজনশীলতার সম্মিলিত রূপ এবং ছবির ভাষায় সংজ্ঞাপিত শিশুর অভিব্যক্তি অনুসন্ধান।

২. গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণায় ২-১৩ বছর বয়সী ১২টি বাঙালি শিশুকে তথ্যদাতা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে এবং নির্বাচিত শিশুদের আঁকা ছবিই এ গবেষণার মূল উপাত্ত। শিশুদের অধিকাংশই ঢাকায় বসবাস করে, এছাড়া একজন শিশু সোনারগাঁ জেলা এবং আরেকজন শিশু মায়ের কর্মসূত্রে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছে। এক্ষেত্রে ছেলে এবং মেয়ে উভয় শ্রেণির ভিন্ন বয়সী শিশুকেই নির্বাচন করা হয়েছে, তবে নির্দিষ্ট করে 'লিঙ্গ বা বয়সভেদে বৈচিত্র্য' এ গবেষণায় বিশ্লেষণ করা হয়নি। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে গবেষণার সুযোগ রয়েছে। তথ্যদাতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে 'স্নো বল স্যাম্পলিং' পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, এটি একটি গুণগত পদ্ধতির সক্রিয় গবেষণা (action research) এবং এ গবেষণায় বিশ্লেষণের সুবিধার্থে ছবিগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যান্বিত করা হয়েছে যার ফলে ছবিগুলোকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে সূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করা সহজ হয়েছে।

বয়সভেদে তথ্য গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ছিল ভিন্নতা, যেসব শিশু সম্পূর্ণরূপে কথা বলতে শেখেনি কিন্তু পেন্সিল ধরতে শিখেছে এবং কাগজে কেবল আঁকতে পারে আকৃতিহীন রেখা, তাদের ক্ষেত্রে সরাসরি প্রত্যক্ষণ করা হয়েছে যা থেকে শিশুদের চিন্তা পদ্ধতি, বাহ্যিক জগৎ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ, অনুভূতি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব হয়েছে। অর্ধ-কাঠামোগত প্রশ্ন

ব্যবহার করে অভিভাবক এবং শিশুদের কাছ থেকে অঙ্কিত ছবির সাথে জড়িত বিষয়বস্তু, ছবির উদ্দেশ্য, অর্থায়ন প্রক্রিয়া (meaning making) ইত্যাদি তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যগুলো পরবর্তীতে তুলনামূলকভাবেও বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে যার মাধ্যমে শিশুদের অঙ্কিত ছবি ও তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্যও নির্দেশ করা সম্ভব হয়েছে। ব্যক্তিগত তথ্য সম্পৃক্ত না করায় শিশুদের প্রকৃত নাম ব্যবহার করা হয়নি; তাছাড়াও সব ধরনের তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রেই অভিভাবককে জানানো হয়েছে এবং তাদের সময় বা অনান্য নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করা হয়েছে।

৩. উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

বর্তমান প্রবন্ধে উপাত্ত হিসেবে ১২টি ভিন্ন ভিন্ন বয়সের শিশুদের (২-১৩ বছর) আঁকা বিভিন্ন ছবি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যা থেকে কয়েকটি নির্দিষ্ট ধারা নির্বাচন করা সম্ভব হয়েছে যার বিশ্লেষণ পরবর্তী উপাত্ত বিশ্লেষণ অংশে করা হয়েছে। নিচে কয়েকটি ধারায় অন্তর্ভুক্ত করে শিশুদের ছবি উপস্থাপন করা হলো–

ক। প্রাথমিক পর্যায় (রেখা ও রেখাচিত্র)

খ। অনুকরণ

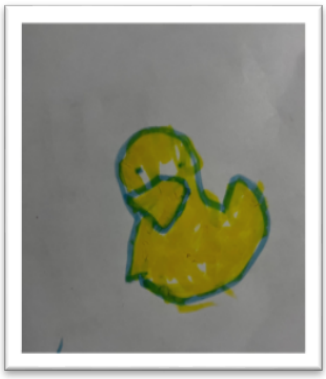

গ। আনন্দিত শিশু (অনেক রঙের ব্যবহার)

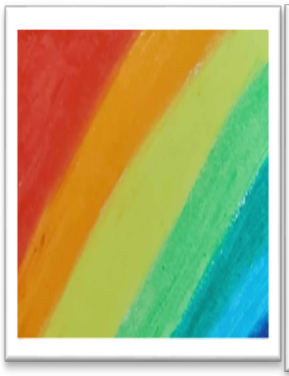

ঘ) মন খারাপ/ ভয়

ঙ) পরিবেশ ও প্রকৃতি (নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ)

চ। কল্পনাশক্তির ব্যবহার (বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা)

ছ। অনেক বেশি সংগঠিত ও তীক্ষ্ম কল্পনাশক্তির বহিঃপ্রকাশ

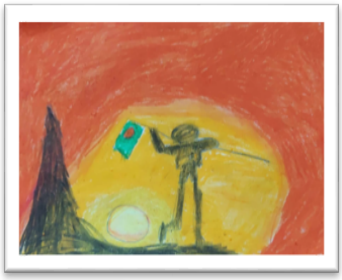

৩.১. উপাত্ত বিশ্লেষণ

অঙ্কন শিশুদের প্রাথমিক পর্যায়ে বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, শিশুরা যখন ছবি আঁকা ও রং করা শুরু করে তখন মূলত তাদের একটি বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক যাত্রার সূত্রপাত হয়। প্রথম ছবির মাধ্যমে শিশু প্রতীকী বস্তু আঁকতে শুরু করে যা পরবর্তীতে তাকে প্রতীক, চিহ্ন এবং ভাষার অঙ্কিত উপস্থাপনা করতে শেখায়।[১৫] ছবি শিশুকে তার অনুভূতি প্রকাশ করতে আগ্রহী করে তোলে ফলে, শিশুর কল্পিত জগৎ এবং বাহ্যিক পৃথিবীর মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি কার্যকরী মাধ্যম হতে পারে ছবি। লোয়েন ফিল্ড তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে প্রথম হিজিবিজি আঁকা বা 'স্ক্রিবল' পর্ব প্রায় ৩ বছর বয়স পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং এ সময় শিশু কেবল তার স্পৃশ্য দক্ষতা (kinesthetic skills) প্রকাশ করতে পারে যেখানে প্রত্যক্ষ করা পৃথিবী উপস্থাপনের কোনো সম্ভাবনা থাকে না এবং এর পরবর্তী পর্যায়েই দেখা যায় শিশু তার আঁকা এই হিজিবিজি দাগগুলোকেই নাম দিতে শুরু করে।[১৬] প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে শিশু তার ছবিতে মনের ভাব অথবা বাহ্যিক জগৎটাকে সে যেভাবে লক্ষ করে ঠিক সেভাবেই উপস্থাপন করতে চেষ্টা করে এবং প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে অঙ্কিত ছবিগুলোও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রথমত (১.৫-২.৫/৩ বছর) কিছু বিচ্ছিন্ন রেখা উপস্থাপিত হলেও পরবর্তীকালে রেখাচিত্রগুলোতেও রং, রঙের মাধ্যম, ধরন, বিভিন্ন বস্তুর বিন্যাস সবই একটি শিশু পরিকল্পিতভাবেই উপস্থাপন করে । উপাত্ত ক-তে দেখা যায় পরিকল্পনাবিহীন এবং পরিকল্পিত কয়েকটি রেখাচিত্র; যেমন: শিশু একটি কাগজে দেওয়া কিছু বিক্ষিপ্ত দাগের ব্যাখ্যা হিসেবে বলেছে যে অনেকগুলো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, আবার নীল রঙের ছবিটিতে শিশুটি রাক্ষস একেঁছে যা সে টিভিতে প্রচারিত কোনো কার্টুনে দেখেছে (৩.৫-৪.৫ বছর বয়সের মধ্যে)। আবার, কাঠি বা রেখাচিত্রের মাধ্যমে ললিপপ, গাড়ি বা ফুলও বোঝাতে চেষ্টা করেছে শিশুরা।

দেখা গেছে কোনো কোনো শিশু বড় কাগজের মধ্যে ছোট ছোট ছবি আঁকে আবার অন্য শিশু সম্পূর্ণ কাগজটি ব্যবহার করে বড় আকারে তার ছবিটি ফুটিয়ে তোলে। আবার একই ছবি (যেমন: কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার) একাধিক শিশু একেকভাবে এঁকেছে (একইসাথে ছবিমালা- ঙ দ্রষ্টব্য)।

একটি ছবিতে শহিদ মিনারের পাশে ভাষার মর্যাদা বোঝাতে বর্ণমালা দিয়ে একটি গাছ আঁকা হয়েছে; লক্ষণীয় যে, বিভিন্ন গাছে শোলা (styrofoam) দিয়ে তৈরি বর্ণমালা দিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারিতে সাজানো হয়, শিশু সেটি উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে। ফুল দিয়ে সজ্জিত শহিদ মিনারটি এভাবে শিশুটি লক্ষ করেছিলো যখন সে স্কুল থেকে ফুল দিতে গিয়ে দেখেছিলো, একুশে ফেব্রুয়ারিতে ফুলেল অর্ঘ নিবেদনের ধারণাটি সে এখানে উপস্থাপন করেছে। অন্য ছবিটিতে একুশে ফেব্রুয়ারি ছাড়া বছরের বাকি সময় যেভাবে শহিদ মিনার দেখা হয়, তার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাচ্ছে। একইসাথে ছবিগুলোর রঙের ব্যবহারও লক্ষণীয়। অর্থাৎ শিশুটি তার অভিজ্ঞতালব্ধ জগতকে বা যেভাবে সে কোনো বিষয়কে অনুধাবন করে তাই তাঁর সৃজনশীল অঙ্কনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে।

ক্রমান্বয়ে শিশু আরও সচেতনভাবে সৃষ্টি করতে শেখে এবং রেখাচিত্র, কাঠিচিত্র তার কাছে অপ্রতুল মনে হয় এবং এক পর্যায়ে শিশু আরও বেশি অভিব্যক্তি প্রকাশক ছবি আঁকতে চেষ্টা করে যাতে সে তার বস্তু বা জগৎ সম্পর্কিত বোধের পরিপূর্ণ প্রকাশ করতে পারে। উল্লেখ্য যে শিশুর পর্যায়ভিত্তিক চিত্রাঙ্কন বিষয়ক যেকোন গবেষণা প্রবন্ধে এ বিষয়গুলো পাওয়া যায়।[১৭] বর্তমান গবেষণার প্রাপ্ত উপাত্তে(খ) দেখা গেছে শিশু তার মন খারাপ এবং বকা খাচ্ছে এমন অভিব্যক্তিও ছবিতে প্রকাশ করতে পারে।

আবার, শিশুর আঁকা ছবিতে ব্যবহৃত রং, মাধ্যম বা ছবির বিন্যাস, সবটুকুই থাকে নির্বাচিত। শিশুর (৭ বছর) একটি ছবিতে দেখা গেছে দুটি গাছ, যার একটি কালো অন্যটি বাদামি রং। এর ব্যাখ্যাস্বরূপ শিশুটি বলেছে যে একটি গাছে পানি দেওয়া হয়নি, শুকিয়ে যাচ্ছে, তাই কালো রং দেওয়া হয়েছে; এই ছবিতে একটি ঘরকেই তিনরকম রং দেওয়া হয়েছে যা তার পছন্দের সব কয়টি রঙের সমাহার। প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকতে গিয়ে একটি শিশু (৯ বছর) এবং অপর শিশু (৮ বছর) দুটো ভিন্ন রঙের ব্যবহার করেছে। একজন দেখিয়েছে লাল আকাশ, কালো পাহাড় অন্যজন নীল আকাশ, কালো পাহাড় (ছবিমালা- ঙ দ্রষ্টব্য)। ব্যাখ্যা হিসেবে পাওয়া গেছে তাদের প্রত্যক্ষণ করা সূর্যাস্তের সময়ের আকাশের লাল আভা এবং রাতের অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশ আর কালো পাহাড়ের রূপ তারা এঁকেছে (ছবি- ঙ দ্রষ্টব্য)।

শিশুদের ছবি উপাত্ত লক্ষ করে কয়েকটি ধারায় সেগুলোকে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে, যেমন: নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ, নির্দেশিত, কল্পনাশক্তির ব্যবহার ইত্যাদি। তেমনি একটি হলো 'যেমন খুশি তেমন আঁকো' বা 'তোমার ইচ্ছেমতো আঁকো'; এটি মূলত শ্রেণিকাজের অংশ হয় অথবা শিশুকে

ব্যস্ত রাখতে কর্মরত মা অনেক সময় শিশুর পছন্দ মতো ছবি আঁকতে বলেন। উপাত্ত সংগ্রহের সময় এমন অনেক ছবিই সংগ্রহ করা হয়েছে, যেখানে দেখা গেছে 'অঙ্কন বই'-তে আঁকা আছে তবে রং করা নেই, এমন একই ছবি দুটি শিশু ভিন্ন আঙ্গিকে রং করেছে। যে ছবি দুটো শিশুরা স্কুলে কেবল রং করেছে, সেখানেও তাদের সৃষ্টিশীলতা এবং জগৎ সম্পর্কিত বোধের সমন্বয় ফুটে উঠেছে। আবার, একটি ছবিতে দেখা গেছে শিশু (১০ বছর) এঁকেছে দরজার চাবির ফুটোর ভেতর দিয়ে ঘরের বাইরের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে (ছবি-চ দ্রষ্টব্য), যেখানে রয়েছে তাদের বাসার অপর পাশের বাড়ি এবং রাস্তার ছবি; চাবির ফুটো দিয়ে বাইরে দেখার যে অনুভূতি এবং সেটা যে শিশুকে অণুপ্রাণিত করেছে এবং এমন একটি অভিনব বিষয় শিশু তার অঙ্কন প্রতিভার মাধ্যমে সংজ্ঞাপিত করতে পেরেছে তা নিঃসন্দেহে তার উন্নত বোধশক্তি ও বুদ্ধিমত্তাকে উপস্থাপিত করে। একটি শিশু (৭ বছর) তার ছবিতে একজন সবজি-বিক্রেতাকে এঁকেছে যে চোখে রোদ চশমা পরে আছে। একজন সবজি বিক্রেতাকে সাধারণত রোদ চশমা পরতে দেখা যায় না; শিশু তার অঙ্কনের বর্ণনা দিয়ে বলেছে 'আঙ্কেলের তো চোখে রোদ লাগে হাঁটার সময়'। শিশুটির বাবা বাইরে বের হলেই রোদ চশমা পরেন যা সে লক্ষ করেছে এবং ছবির ভাষায় সংজ্ঞাপিত করেছে তার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এবং একইসাথে তার এ উপস্থাপন তার মানবিক আবেগ ফুটিয়ে তুলেছে।

শিশুদের ছবি বিশ্লেষণ করে যে বিষয়টি সহজেই লক্ষ করা যায় তা হলো, একটা পর্যায়ে শিশুর অঙ্কিত ছবি অনেক বেশি পরিণত এবং সংগঠিত হয়ে যায়; উপাত্ত-চ এবং ছ-তে অন্তর্ভুক্ত ছবিগুলোতে তার প্রমাণ রয়েছে, যেমন– শিশুর ব্যাখ্যা অনুসারে নীল রংটি একটি দেয়াল এবং গোলাপি রং হচ্ছে একটি গোলাপ ফুল। গোলাপ ফুলটি এখনো ফোটেনি, হালকা গোলাপি অংশটি পাপড়ির ওপরের অংশ, আর ঘন গোলাপি অংশে সব পাপড়ি একসাথে জমে আছে তাই এই অংশের রং গাঢ়। এখানে শিশু তার পরিপক্ব বোধ এবং সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিয়েছে। অথবা অন্য ছবিতে গাছ কেটে ফেললে পৃথিবী কেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবে বা বর্ষাকালে প্রকৃতি কেমন রূপ ধারণ করে তা ছবির ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে হলে বোধ, কল্পনাশক্তির পাশাপাশি সংগঠিত করার তীক্ষ্ণ দক্ষতাও থাকতে হয়।

সর্বশেষ শ্রেণিভুক্ত ছবিগুলোর প্রতিটির গূঢ়ার্থ রয়েছে, দেখা যাচ্ছে দেশ স্বাধীন করে দিন শেষে (ডুবন্ত সূর্যের লাল রঙের প্রতিফলন) ফিরে আসা মুক্তিযোদ্ধা অথবা হানাদার বাহিনীর সাথে সশস্ত্র সমরের চিত্র। এছাড়া একটি ছবি রয়েছে বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ; যেখানে নীল রং শিব ঠাকুরকে বোঝাচ্ছে আর হলুদ ব্যবহৃত হয়েছে দেবী পার্বতীকে বোঝাতে। দেবতা শিব এবং পার্বতী যে বিয়ের সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে এক হয়ে গেছেন এটা বোঝাতে একসাথে আঁকা হয়েছে ছবিটি। তাঁদের দুজনের একসাথে মিলে যাওয়ার মাধ্যমে একটা নতুন রূপের জন্ম হয়েছে (তবে নতুন রূপ বলতে ঠিক কি বুঝেছে সেটা শিশু ভালোভাবে বলতে পারেনি)। মুখের ভাষার অনুপস্থিতে মনের ভাব প্রকাশের এত সুশৃঙ্খল পদ্ধতি উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে শিশুদের চিত্রাঙ্কন বিশ্লেষণের মাধ্যমেই।

এছাড়াও, অঙ্কিত ছবি তুলে ধরতে পারে শিশুর মানসিক অবস্থা। গাঢ়, হালকা, পূর্ণাঙ্গ-অসম্পূর্ণ রং, ছবির বিষয় ইত্যাদি দেখে বোঝা যেতে পারে শিশুটি কী অনুভব করছে। গবেষণায় দেখা গেছে শিশুদের ব্যবহৃত রং– ট্রমা, ডিপ্রেশন, ভয়-উত্তেজনা এবং অন্যান্য মানসিক অস্থিরতার প্রমাণ দিতে পারে।[১৮] বর্তমান গবেষণা উপাত্তে দেখা গেছে একটি শিশু (৫ বছর) আইসক্রিম এঁকেছে যেখানে সে খয়েরি, নীল ও লাল রঙের 'চকোলেট' এঁকেছে আইসক্রিমের ওপর; শিশুটি বলেছে যে, এত রঙের চকোলেট হয় সে দেখেছে, তাই এঁকেছে। তার পছন্দের রংগুলো একইসাথে ব্যবহার করে সে তার মনের আনন্দ সংজ্ঞাপিত করেছে; পূর্বে উল্লেখিত অনেক রঙের ব্যবহার বা মন খারাপ প্রকাশক ছবিগুলোও শিশুর মানসিক পরিস্থিতি উপস্থাপন করেছে। আবার একটি ছবিতে শিশু (১০ বছর) কাঠিচিত্রের মতো করে ফুল গাছ এঁকেছে যাতে কোনো পাতা নেই, শুধু ডাল ও ফুল আঁকা। জানা গেছে যে শিশুটি বিশদভাবে ছবি আঁকতে বা সূক্ষ্ম বিবরণ দিতে পছন্দ করে না, সে চায় দ্রুত ছবি আঁকা শেষ করতে। এ প্রবণতা ফুটিয়ে তোলে তার মানসিক অস্থিরতা এবং চারিত্রিক চঞ্চলতা। এই শিশুটিই মাধ্যম হিসেবে কাঠ-রং পেন্সিল বা ক্রেয়নের চাইতে জলরং বেশি পছন্দ করে। সে বলেছে পানি মিশিয়ে জলরং করলে ছবির সাদা কাগজ দ্রুত ভরিয়ে তোলা যায়। এ থেকে তার ধৈর্যশীলতা সম্পর্কেও আন্দাজ করা যায়। যদিও ১০ বছরের একটি বাচ্চা ছবি আঁকার কাঠামোগত বা স্কেমেটিক পর্যায়ে থাকে এবং তার ছবির ভাষায় জগৎ প্রকাশের দক্ষতা অনেকটাই সুসংগঠিত থাকে।

উল্লেখ্য যে, শিশুর অঙ্কন প্রতিভা প্রতিফলিত হবার নির্দিষ্ট বয়স সীমা আছে।[১৯] তাছাড়াও লিঙ্গভেদে ছেলে বা মেয়ে শিশুর অঙ্কিত ছবি বিশ্লেষণ বিষয়ক আলোচনাও পাওয়া যায়।[২০] যেসব শিশুর আঁকা ছবি এ গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে, তাদেরও রয়েছে বয়স ও লিঙ্গ পার্থক্য এবং এর সাথে তাদের ছবি আঁকাও আলাদাভাবে বৈশিষ্ট্যান্বিত। লক্ষণীয়, বোধের বিকাশ যে বয়সভেদে ভিন্ন হয় এবং তার সাথে শিশুর সৃজনশীলতার সম্পর্ক বিশ্লেষণ, সেটাই শুধু এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বলে সংগত কারণেই এ বিষয়ের প্রতি অধিক দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। তবে লিঙ্গ এবং বয়স ভিন্নতায় বিস্তারিতভাবে শিশুর অঙ্কন বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে একটি আকর্ষণীয় গবেষণাক্ষেত্র; ফলে ভবিষ্যৎ অনুসন্ধানে এই বিষয় দুটি অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব।

৪. ফলাফল

একটি অঙ্কিত ছবি মূলত একটি প্রকৃত বস্তুরই প্রতিফলন। তাই একটি শিশুর অঙ্কন বিকাশ একরকম চ্যালেঞ্জ যা মূলত তার নিজের সাথে নিজেরই বলা যেতে পারে। বস্তু জগতের কোনো বিষয়ের প্রতীকী উপস্থাপন করতে হলে তাকে একদিকে যেমন বস্তুর মূর্ত বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে হবে, অন্যদিকে শিশুর বিশ্ববীক্ষণ ও ছবির বিমূর্ত প্রতিফলনও ফুটিয়ে তুলবে তার বোধ, ভাষা, মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ। তবে শুধু যে শিশুদের অভ্যন্তরীণ বিকাশ ছবির মাধ্যমে উপস্থাপিত হয় তা-নয়; তার মোটর দক্ষতা, হাত-চোখের সমন্বয় (co-ordination) এসব শারীরিক বৈশিষ্ট্য বিকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমও হচ্ছে অঙ্কন।

প্রতিটি শিশুই পর্যায়ভিত্তিক অঙ্কন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়, যেমন: রেখাচিত্র, অনুকরণ, নিজস্ব সৃষ্টিশীলতা ইত্যাদি। কিছু শিশুর ছবি আঁকার প্রতিভা শুরু থেকেই বিকশিত থাকে, অর্থাৎ তার বোধ এবং ছবির মধ্য দিয়ে বস্তুজগৎকে উপস্থাপন করার উন্নত দক্ষতা থাকে, তার অঙ্কিত প্রাথমিক পর্যায়ের ছবিগুলোতেই তার প্রমাণ মেলে। আবার একই শিশুই বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে বিষয় নির্বাচন, ছবির বিন্যাস, রং নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেক বেশি বিন্যস্ত ও সুসংগঠিত হয়; আবার কোনো শিশু প্রথমদিকে ছবি আঁকলেও দেখা যায় যে পরে আর তা ধরে রাখেনি বা ছবি আঁকতে শিশুটি আর পছন্দ করছে না। এক্ষেত্রে বাবা-মা অথবা স্কুল শিক্ষকও তাকে আবার অনুপ্রাণিত করতে পারেনি ।

নিচের ছবি দুটি পূর্বে উপস্থাপিত (রেখাচিত্র এবং মন খারাপ ছবি দ্রষ্টব্য) শিশুদের আঁকা লক্ষ করে দেখা গেছে যে একটি শিশু (বর্তমান বয়স ১২) এখন পূর্বের তুলনায় বেশি সূক্ষ্মভাবে ছবি আঁকছে এবং অন্য শিশুটি (বর্তমান বয়স ১৩) সরাসরি ছবির ধারা পরিবর্তন করে স্কেচিং করছে।

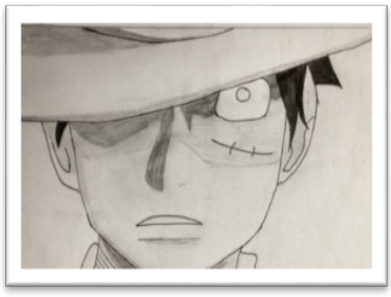

৪.১. শিশুর অঙ্কনে বোধ ও সৃজনশীলতার সমন্বয়

শিশুদের অঙ্কিত ছবির নিজস্ব সংগঠন এবং ব্যাখ্যা থাকে। আপাত দৃষ্টিতে কাগজে আঁকা কিছু বিচ্ছিন্ন দাগ মনে হলেও রং, কাগজ, অঙ্কন উপকরণ বা বিষয় বিন্যাস, সবকিছুই তারা কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেই নির্বাচন করে (প্রাক-প্রাথমিক রেখা বা scribbles বাদ দিয়ে)। উদাহরণ হিসেবে দেখা যায়, কাঠিচিত্রের মাধ্যমেও শিশু ললিপপ, গাড়ি এসব বোঝাতে পেরেছে। আবার, একটি শিশু এঁকেছে সবুজ এবং নীল পাহাড় এবং বাদামি রঙের মেঘ; শিশুটিকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল আকাশের নীল ছায়া পাহাড়ে পড়েছে এবং বৃষ্টি আসবে তাই মেঘ বাদামী (বা কালচে) রঙের। এছাড়াও সবুজ তার প্রিয় রং বলেও বিভিন্ন জায়গায় সবুজ রং দিয়েছে বলে শিশুটি উল্লেখ করেছে। শিশুদের ছবির ক্ষেত্রে প্রকৃত বস্তু বা জগৎ দেখতে কেমন, তার চেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে শিশু কেমন ভাবে জগৎটাকে অনুধাবন করে। প্রতিটি শিশুর অঙ্কিত ছবিই তার বিশ্ববীক্ষণ। একটি ছবিতে ব্যবহৃত দাগ, দাগের গাঢ়তা, রঙের পরিপূর্ণতা থেকে শিশুর মানসিকতা এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও অনুধাবন করা যায়, যেমন– পেন্সিলের হালকা ছাপ, অসম্পূর্ণ রং করার প্রবণতা, মানুষ বা পাখি কাঠির মতো করে আঁকা থেকে বোঝা যায় শিশুটি চঞ্চল, অস্থির। অন্যদিকে একটি পরিপূর্ণভাবে রং করা, স্পষ্ট ছবি শিশুর স্থিরতা, ধৈর্যশীলতার

পরিচায়ক। 'যেমন খুশি তেমন আঁকো'– একটি নির্দেশিত ছবি আঁকার পদ্ধতি যা সাধারণত স্কুলে শিক্ষক শিশুদের সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য দিয়ে থাকেন। উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা গেছে শিশুরা এ পদ্ধতি খুবই পছন্দ করে কারণ সে যা এতদিন আঁকতে পারেনি বা তার অব্যক্ত চিন্তাগুলো এখানে প্রকাশ করতে পারে। এতে শিশুর বোধ ও বুদ্ধিমত্তর পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়।

শিশুর আঁকা যেকোনো বিষয়ভিত্তিক (মুক্তিযুদ্ধ, পহেলা বৈশাখ, ফুটবল ম্যাচ, গ্রামের মেলা) ছবি দেখলে শিশুর বোধের বিকাশ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়, একইভাবে কোনো সংস্কৃতি নির্ভর অনুষ্ঠান একটি শিশু যেভাবে প্রত্যক্ষণ করে সেভাবেই চেষ্টা করে কাগজে উপস্থাপন করতে, যেমন: নিচের ছবিতে আমেরিকা বেড়াতে যাওয়া একটি বাঙালি শিশুর চোখে ফিফা বিশ্বকাপের একটি ছবি দেওয়া আছে, ছেলেটি তার আসন থেকে গোল পোস্টে যেভাবে বল ঢুকতে দেখেছে তা ফুটিয়ে তুলেছে। একইসাথে আরেকটি শিশু তার স্কুলের মাঠে দেখা ফুটবল ম্যাচের ছবি এঁকেছে।

উল্লেখ্য যে, কোনো ছবিকেই বেশি সুন্দর, সঠিক, পরিপক্ব এভাবে মূল্যায়ন করার সুযোগ নেই; কারণ শিশুদের আঁকা ছবির কখনও ভুল-ত্রুটি বিচার বা পরিমাপ করা উচিত নয়। যে শিশু তার পারিপার্শ্বিক জগৎকে যেভাবে দেখে, যেভাবে তার বোধের সাহায্যে বাস্তবতাকে অনুধাবন করে, সেভাবেই সে কাগজে সৃজনশীলতার মাধ্যমে ছবি উপস্থাপন করে ।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছবি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উল্লেখ করতেই হয়, তা হলো যেহেতু শিশুর বিশ্ববীক্ষণ, প্রত্যক্ষণ মূলত তার সংস্কৃতি বা প্রতিবেদননির্ভর, তাই পরিবার, স্কুল ও শিক্ষকের রয়েছে এই প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকা। ২০০১ সালে সম্পাদিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে জাপানি শিশুর আঁকা ছবি বড় আকারের ও বেশি সূক্ষ্ম বিবরণ থাকে; অন্যদিকে আমেরিকান শিশুর ছবিতে হাসিমুখ আঁকা হয় বেশি। গবেষক দেখিয়েছেন সামাজিক বিভিন্ন

উপাদান (factors) এখানে ভূমিকা পালন করেছে।[২১] তেমনি ফুটবল ম্যাচের ছবিতেও স্থানীয় পরিবেশ ভূমিকা পালন করেছে।

ওপরের তথ্যগুলো সংক্ষেপ করে বলা যায়, যেহেতু শিশুর বোধ ও বুদ্ধিমত্তা প্রতিফলিত হওয়ার একটি মাধ্যম শিশুর অঙ্কিত ছবি, তাই ছবি বিশ্লেষণ করলে জানা যায় শিশু কীভাবে বাইরের জগৎকে অনুধাবন করে বা কেমন তার বিশ্ববীক্ষণ! একই বয়সী শিশু একইভাবে একই বিষয় দেখলেও দেখা গেছে তাদের আঁকা ছবি অনেকটাই আলাদা হতে পারে। আবার কোনো শিশু একটা বিষয়কে এতটাই খুঁটিনাটিসহ আঁকতে পারে যা বাস্তব জগতের হুবহু প্রতিচ্ছবি বলে মনে হয়। এছাড়াও একটি শিশু চরিত্রগতভাবে শান্ত, স্থির, অস্থির, চঞ্চল অথবা মানসিকভাবে স্বতঃস্ফূর্ত নাকি চাপের সম্মুখীন তাও বোঝা যায় ছবি দেখে। শিশু ছবির ভাষায় প্রকাশ করে তার অব্যক্ত কথা, মনের অনুভূতি এমনকি রাগ ও দুঃখের মতো গভীর আবেগও। কারণ ছবি আঁকা তার জন্য যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাই চিত্রাঙ্কন বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে একটি আকর্ষণীয় গবেষণার বিষয় যা শিশুদের বোধের বিকাশের সাথে সৃজনশীলতার পারস্পরিক সম্পর্ক তুলে ধরতে পারে।

উপসংহার

শিশুদের অঙ্কন এক প্রকার উপস্থাপনামূলক (representational) বিকাশের মাধ্যম। একটি শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ যেমন তার মৌখিক ভাষাকে প্রভাবিত করে, তেমনি ছবির ভাষাও প্রভাবিত হয় মোটর দক্ষতা, বোধ, বুদ্ধিমত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ দৈহিক ও মানসিক বিকাশের মাধ্যমে। বর্তমান গবেষণায় শিশুর আঁকা ছবির সাথে তার বোধ, সৃজনশীলতা বা সংজ্ঞাপন দক্ষতার প্রভাব এবং সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে, দেখা গেছে– শিশুর বিকাশে মৌখিক এবং লিখিত ভাষা বিকাশের মতোই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ছবির ভাষা। একটি ছবি বলে দিতে পারে শিশুর অনেক অব্যক্ত কথা, মানসিক অবস্থা, সমাজ-বিশ্ববীক্ষণ এবং তার বোধ ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ সম্পর্কে। শুধু যে দৈহিক বিকাশ বা শিশু মনস্তত্ত্ব বোঝা যায় ছবি বিশ্লেষণে তা নয়, সাধারণভাবে একটি শিশুর সার্বিক পরিকল্পনা ও বিন্যাস করার ক্ষমতারও প্রতিফলন হতে পারে এ বিষয়ক অধ্যয়নে। যখন একটি শিশুর ছবিকে ধরে নেয়া হবে তার যোগাযোগ উপস্থাপনের একটি ভাষা হিসেবে, তখন অবশ্যই ছবির ক্ষুদ্র অংশ থেকে পূর্ণাঙ্গ রূপ পর্যন্ত ছবিটির সব কয়টি পর্যায় (যেমন: রং, দাগ, বিষয় নির্বাচন, বিন্যাস, বাস্তব অভিজ্ঞতা) সব কিছুই বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

শিশুদের বোধের বিকাশ অধ্যয়ন অনেক জ্ঞানশাখার ক্ষেত্রেই কার্যকরী, বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে। এ বিষয়ক গবেষণার অনেকগুলি সম্ভাব্য পদ্ধতি রয়েছে, তার মধ্যে একটি শিশুর আঁকা ছবির মূল্যায়ন, যা তাদের প্রতিনিধিত্বমূলক জগৎ ও বোধের একটি দরজা উন্মুক্ত করে দিতে পারে। অঙ্কন এক ধরনের স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি হলেও এটি যোগাযোগের একটি বলিষ্ঠ মাধ্যমও হতে পারে। সব শিশুর বোধ বিকাশের একটি ক্রম থাকে এবং এটি মানসিক বিকাশ, মনোসামাজিক বিকাশ এবং উপলব্ধির বিকাশের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। শিশুদের প্রাথমিক পর্যায়ে বিমূর্ত ভাষাগত অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য পর্যাপ্ত দক্ষতা তৈরি না হলেও, অঙ্কনের মতো প্রতীকী মাধ্যম ব্যবহার

করে তারা যোগাযোগ রক্ষা করে; যা তাদের দক্ষতা তৈরির পাশাপাশি, বোধ, অনুধাবন ক্ষমতা এবং সৃজনশীলতাও বৃদ্ধি করে এবং এটি তার সার্বিক বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ।

পরিশেষে বলা যায়, একটি শিশুর অভ্যন্তরীণ বিকাশ, তার ভেতরের বোধ, অব্যক্ত চিন্তা, অভাষিক অভিজ্ঞতাগুলোকে উপলব্ধি করতে হলে অঙ্কিত ছবি বিশ্লেষণ একটি অত্যন্ত কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বর্তমান গবেষণায় উপাত্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে চেষ্টা করা হয়েছে বাঙালি কিছু শিশুর অঙ্কিত ছবি বিশ্লেষণ করে এর সাথে জড়িয়ে থাকা বিকাশ, বোধ, বৃদ্ধি, সৃজনশীলতা, মোটর দক্ষতা বা সংজ্ঞাপন দক্ষতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে। প্রাপ্ত ফলাফল সাধারণভাবে শিশুদের বিকাশকে প্রতিফলিত করেছে এবং চারপাশের বিশ্বকে শিশু কীভাবে প্রত্যক্ষণ ও অনুধাবন করছে এবং কীভাবে তার সৃজনশীলতার মাধ্যমে ছবির ভাষায় ব্যক্ত করছে সেই অভিজ্ঞতা সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করতে সক্ষম হয়েছে। তবে, নির্দিষ্ট শিশুকে লক্ষ করেও এ গবেষণা করা সম্ভব যা আরও সুনির্দিষ্ট ফলাফল তুলে ধরতে সক্ষম হবে; বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক ছবি বিশ্লেষণ অথবা একটি শিশুকেই দীর্ঘ মেয়াদি (longitudinal study) অধ্যয়ন করারও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা রয়েছে। আবার এটি একটি গুণগত বিশ্লেষণ হলেও সংখ্যাগত পদ্ধতিতেও এ বিষয়টি গবেষণা করা যেতে পারে। সময়, উপযোগিতা (convenience), ব্যক্তিগত কিছু সীমাবদ্ধতা ইচ্ছা থাকলেও এ গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহকালীন এড়িয়ে চলা যায়নি, যা গবেষণার গতি এবং উপাত্ত সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে কিছুটা হলেও ব্যাহত করেছে।

শিশু আঁকে যা তার অভিজ্ঞতালব্ধ, যা তাকে আকৃষ্ট করে এবং বোধের বিকাশের সাথে যা সামঞ্জস্যপূর্ণ। শিশুর বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তার চিত্রাঙ্কন বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিশুর বোধ ও সৃজনশীলতার যে সমন্বয় তা যেমন এ প্রবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে তেমনি প্রতিটি শিশুই তার নিজস্ব অবস্থান থেকে যে অনন্য তাও পুনরায় উপলব্ধ হয়েছে। ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্যও এটি হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ এবং একই সাথে আকর্ষণীয় একটি আলোচনা ক্ষেত্র।

তথ্যনির্দেশ

১. E. Burkitt *et al.*, 'Drawings of emotionally characterised figures by children from different educational backgrounds', *International Journal of Art and Design Education*, Vol. 24, 2005, pp. 71–83
২. A.H. Dyson, 'Multiple worlds of child writers: Friends learning to write', New York: Teachers College Press, 1989, p. 318
৩. J. H. Di Leo, 'Interpreting children's drawings', UK: Routledge, 2013
৪. Viktor Lowenfeld & Lambert W. Brittain, 'Creative and Mental Growth', New York: Prentice Hall, 1987
৫. *Ibid*
৬. G. V. Thomas & A. M. J. Silk, 'An introduction to the psychology of children's drawings,' UK: Harvester Wheatsheaf, 1990
৭. Rhoda Kellogg, 'Analyzing children's art', CA: Mayfield Publishing Company, 1970
৮. Ian Brown, 'A cross-cultural comparison of children's drawing development,' *Visual Arts Research*, V.18(1), 1992, pp. 15-20

৯. নাসিমা রহমান, 'শিশুদের অঙ্কন ও মানসিক অবস্থা: একটি মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ', *বাংলাদেশ মনোবিজ্ঞান পত্রিকা*, খণ্ড ৪(১), ২০১৭, পৃ. ১২-২৫

১০. রুমা চক্রবর্তী, 'শিশুদের অঙ্কনের মাধ্যমে তাদের সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কের প্রতিফলন', *বাংলা মনোবিজ্ঞান পত্রিকা*, খণ্ড ৫(২), ২০১৮, পৃ. ৩৫-৪৭

১১. সত্যব্রত রায়, 'বাঙালি শিশুদের অঙ্কনে সংস্কৃতির প্রতিফলন', *মানববিদ্যা জার্নাল*, খণ্ড ১১(৩), ২০১৯, পৃ. ৫৫-৭০

১২. সুপর্ণা ঘোষ, 'শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যে অঙ্কনের ভূমিকা: চিত্রকলা থেরাপি', *বাংলাদেশ মনোবিজ্ঞান সংকলন*, খণ্ড ৬(১), ২০২০, পৃ. ২১-৩৫

১৩. ফারজানা করিম, 'শিশুদের শিল্প শিক্ষার গুরুত্ব: বাংলাদেশি শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুদের অঙ্কনের ভূমিকা', *বাংলাদেশ শিক্ষা ও গবেষণা পত্রিকা*, খণ্ড ৯(২), ২০১৮, পৃ. ৩৫-৫০

১৪. S. Restoy *et al.,* 'Draw yourself: How culture influences drawings by children between the ages of two and fifteen', *Frontiers in Psychology*, Vol. 13, 2022, pp. 940617

১৫. B. Edwards *et al.,* 'A critical review of the early childhood literature', *Melbourne: Australian Institute of Family Studies*, 2016

১৬. Viktor Lowenfeld & Lambert W. Brittain, 'Creative and Mental Growth', New York: Prentice Hall, 1987

১৭. Z. D. B. Permatasari, & Z. Zulkarnaen, 'Analysis of the drawing stages of children aged 5-6 years', *Early Childhood Research Journal (ECRJ)*, Vol. *5*(2), 2022, pp. 44-50

১৮. C. L. Milne & P. Greenway, 'Color in children's drawings: The influence of age and gender', *The Arts in Psychotherapy*, Vol. 26(4), 1999, pp. 261-263

১৯. S. Sadia & Z. A. Ali, 'Expression beyond Words: An Analysis of Human Figure Drawing of Children and Adolescents with ADHD', *Bahria Journal of Professional Psychology*, Vol. 20(1), 2021

২০. W. J. Chen, & L. A. Kantner, 'Gender differentiation and young children's drawings', *Visual Arts Research*, Vol. 22, pp. 44-51

২১. La Voy *et al.,* 'Children's Drawings: A Cross-Cultural Analysis from Japan and the United States', *School Psychology International*, Vol. 22(1), 2001, pp. 53-63

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বিয়াল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩১/ডিসেম্বর ২০২৪

রসপুরাণ : অষ্টবিধ নাট্যরসে প্রযোজনা নিরীক্ষা

আহমেদুল কবির*

সারসংক্ষেপ

ভারতীয় সাহিত্য তত্ত্বে 'রস'কেই আখ্যানের সার এবং রসাস্বাদই চূড়ান্ত ফল বলে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ সাহিত্যের শ্রেণি-বিভাগ অবলম্বন করেই এই রস তত্ত্বের উদ্ভব, আচার্য ভরত যার প্রবক্তা এবং তাঁর *নাট্যশাস্ত্র* যার আকর গ্রন্থ। *নাট্যশাস্ত্রে*-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভরত রস-এর স্বরূপ, প্রকার এবং স্বভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তবে রস বিষয়ক বহু অমীমাংসিত আলোচনারণ্যে প্রবেশের প্রয়োজন বর্তমান প্রবন্ধে নেই। কেবল মাত্র সাধারণ্যে প্রচলিত *নাট্যশাস্ত্র*-এর মতকে কেন্দ্র করে *রসপুরাণ* প্রযোজনার আলোকে বর্তমান প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। প্রথমে *রসপুরাণ* প্রযোজনার নির্মাণ কৌশল সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করে নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত অষ্টবিধ নাট্যরস নিয়ে প্রযোজনা নিরীক্ষাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই আলোচনার মাধ্যমে হয়তো সংস্কৃত নাট্যের ভিত্তিমূলে রসতত্ত্ব কী প্রকারে কার্যকর হয় তা প্রমাণিত হবে। পাশাপাশি, বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক নাট্যকলা বিভাগসমূহে সংস্কৃত নাট্য প্রযোজনার প্রামাণিক রূপটি কেমন, তাও প্রযোজনা নিরীক্ষার মাধ্যমে উঠে আসবে।

চাবি শব্দ: রস, রসপুরাণ, নাট্যশাস্ত্র, প্রযোজনা, নিরীক্ষা

১

ভারতীয় তথা সংস্কৃত সাহিত্যে নন্দনের একটি উপাদান দৃশ্যকাব্য। এই কাব্য দর্শক শ্রোতাকে অনেক কিছু প্রদানে সমার্থক হলেও রসাস্বাদ-জনিত পরম আনন্দই তার মূল উপাদান। সংস্কৃত নাট্যে রসকেই আখ্যানের সার এবং রসাস্বাদই চূড়ান্ত স্বীকৃতি বলে গণ্য। রসাস্বাদ তাঁরাই গ্রহণে সমর্থ যাঁদের উপযুক্ত মানসিক বৃদ্ধি ও বিকাশ রয়েছে। এই শ্রেণির দর্শককে বলা হয় রসিক জন বা সহৃদয়। সহৃদয় দর্শক নাটলিপি অনুশীলন, বিশ্লেষণ এবং বর্ণিত ভাবে তন্ময় হবার যোগ্যতা রাখেন। নাতিদীর্ঘ সংলাপে চরিত্রের মনের ভাবের সাথে নিজের ভাব মিলিয়ে একাত্মতা অনুভব করতে পারেন এবং উপলব্ধি করতে পারেন রসহীন রচনা নিরর্থক, আর ইতিবৃত্ত হলো নাট্যের শরীর। এখন প্রশ্ন আসতে পারে *রসপুরাণ* কী? উত্তরে বলা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ প্রযোজিত *রসপুরাণ* (২০১৯) একটি সংস্কৃত আখ্যান আশ্রিত নাট্য। অধ্যাপক ড. আহমেদুল কবির-এর নির্দেশনায় তৎকালীন দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সেমিস্টারের শিক্ষার্থীবৃন্দ ২৫ এপ্রিল হতে ০৪ মে ২০১৯ সাল পর্যন্ত নাটমণ্ডল মিলনায়তনে প্রতি সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় নাটকটি মঞ্চায়ন করে।[১] *রসপুরাণ* প্রযোজনাটি মূলত অষ্টরসের মিশ্রণ। মাত্র আটটি এপিসোড মিলে এই নাটক। অষ্টরসাখ্যানস্বরূপ এই প্রযোজনায় যে অদৃশ্য সুতোটি এক এপিসোডের সাথে আরেক এপিসোডের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে তা হলো রস। এপিসোডের আখ্যান-বস্তু নির্মাণে নির্দেশক রামায়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ, প্রচলিত লোক-কাহিনি ও

* অধ্যাপক, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত নাট্যের দৃশ্য সংশ্লেষ করেছেন। এভাবে অষ্টরসের সম্মিলনে তৈরি করা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন আটটি এপিসোড। আর দেখানো হয়েছে কীভাবে সংকটময় পরিস্থিতি থেকে সুন্দর ও নির্মল পরিণতির দিকে এগিয়ে যায় মানুষের সভ্যতা। মাত্র এক ঘণ্টা দশ মিনিটের নাটক *রসপুরাণ*। অথচ দর্শক যেন এক মহাকাল ঘুরে আসেন। নির্দেশক বলেন,

> সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নাটকগুলোই বিভাগ দর্শক সম্মুখে বারংবার মঞ্চায়ন করেছে। কিন্তু *নাট্যশাস্ত্র*-এর আটটি রসকে সমান বা একরূপ প্রাধান্য দিয়ে বিভাগ এ-পর্যন্ত কোনো নাটক মঞ্চায়ন করেনি। তাই শিক্ষার্থীদের নাট্যশাস্ত্র ভিত্তিক অষ্টরস বিষয়ক একটি পূর্ণ অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। এই প্রয়োজনীয়তা থেকেই নাট্যশাস্ত্রবর্ণিত ভাব ও রসনিষ্পত্তি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অষ্টরসের আখ্যানে *রসপুরাণ* মঞ্চায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করি।[২]

নির্দেশকের উপর্যুক্ত উক্তির যথার্থতা খুঁজতে, ১৯৯৪ সালে থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে দর্শক সম্মুখে সংস্কৃত নাট্য প্রদর্শনীর যে তথ্য ব্রুশিয়র মতে পাওয়া যায় সেদিকে দৃষ্টিপাত করি। তা হলো, ১৯৯৫ সালে ড. ইসরাফিল শাহীন-এর নির্দেশনায় মঞ্চায়িত হয় ভাস বিরচিত *ঊরুভঙ্গ*। পরবর্তীকালে অধ্যাপক ওয়াহীদা মল্লিক নির্দেশিত ভাস বিরচিত *মধ্যমব্যায়োগ* মঞ্চায়িত হয় দু'বার, যথাক্রমে ২০০৪ ও ২০১০ সালে। পুনরায় *ঊরুভঙ্গ* ২০০৮ সালে অধ্যাপক ওয়াহীদা মল্লিক-এর নির্দেশনায় এবং আশিকুর রহমান-এর নির্দেশনায় *মৃচ্ছকটিক* ২০০৯ সালে মঞ্চায়িত হয়। এছাড়া আহমেদুল কবির নির্দেশিত বুদ্ধদেব বসু রচিত *প্রথম পার্থ* ২০১২ সালে মঞ্চায়িত হয়। উপর্যুক্ত *ঊরুভঙ্গ*, *মধ্যমব্যায়োগ*, *মৃচ্ছকটিক* ও *প্রথম পার্থ* নাট্যের নাট্যরস বিবেচনা করলে লক্ষ করা যায়, নাটকে সব রসের উপস্থিতি থাকলেও প্রত্যেকটির একটি প্রধান রস বা অঙ্গী রস রয়েছে। যেমন– *ঊরুভঙ্গ*, *মধ্যমব্যায়োগ* ও *প্রথম পার্থ*-এর অঙ্গী রস 'বীর' এবং *মৃচ্ছকটিক*-এর অঙ্গী রস 'শৃঙ্গার'। এক্ষেত্রে নির্দেশকের উক্তির যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যায়। এবং বলা যায়, *রসপুরাণ* প্রযোজনাটি মঞ্চায়নের পেছনে নির্দেশকের সরাসরি যে কারণটি ক্রিয়াশীল ছিলো তা হলো 'নাট্যরস'। এ-প্রসঙ্গে নির্দেশক বলেন,

> বলতে গেলে একধরনের বাধ্য হয়েই বিকল্প পথের সন্ধান করি। নাট্যনির্মাণের শুরুতেই আমাদের চিন্তা ছিলো রসভিত্তিক একটি প্রযোজনা নির্মাণ করা, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃষ্টিশীল সংযোগ স্থাপন এবং উভয়ের উদ্ভাবনী গবেষণার মাধ্যমে রসসমূহকে একই আধারে সংশ্লেষিত করা।[৩]

ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ভারতীয় নাট্যাঙ্গন বহুপূর্ব থেকেই 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' থেকে সাংস্কৃতিক মৌল উপাদান সংগ্রহ করে নাটক মঞ্চায়ন করেছে। বাংলাদেশেও ইসলামিক মিথ (কারবালার) ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাটক মঞ্চায়ন হয়েছে, যেমন– ঢাকা পদাতিকের *বিষাদ সিন্ধু*, দেশজ নাট্য বিশেষ করে 'জারী গান' ও 'বিচার গানে'ও এর প্রভাব বর্তমান রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় নির্দেশক *রসপুরাণ* নাট্যের কাহিনি গ্রহণ করেছেন বিভিন্ন উৎস থেকে। ইউটিউব-এ প্রাপ্ত *রসপুরাণ* প্রযোজনার ভিডিও দেখে বিশ্লেষণ করলে লক্ষ করা যায়, নাট্য নির্মাণে নির্দেশক একক কোনো পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করেননি। এবং ইতিবৃত্ত– স্থান, কাল ও ঘটনার ঐক্য মেনে অগ্রসর হয় না। *রামায়ণ*, *মহাভারত*, *মৃচ্ছকটিক* এবং বিভিন্ন 'পুরাণ' আখ্যানের খণ্ডাংশ ও প্রচলিত লোক-কাহিনি পরিবেশন করেন। এক্ষেত্রে শূদ্রক রচিত *মৃচ্ছকটিক*-ই একমাত্র পূর্ণ সংস্কৃত নাট্য, যেখান থেকে 'জুয়ার আড্ডা'র দৃশ্য সংশ্লেষ করা হয়েছে। নির্দেশক

উৎস থেকে কেবল কাহিনির বীজ গ্রহণ করেছেন, পরিবেশনকালে আপন প্রতিভায় নাটকে অষ্টরস সংযোজন করে প্রযোজনাকে করে তুলেছেন আকর্ষণীয়। এক্ষেত্রে নির্দেশক নাট্য কাহিনি নির্মাণে ছিলেন স্বাধীন। তাইতো *রসপুরাণ* প্রযোজনার কাহিনিতে যেমন বৈচিত্র্য আছে, তেমনি বৈচিত্র্য আছে তার উৎস নির্বাচনেও। পাণ্ডুলিপি নির্মাণ প্রসঙ্গে নির্দেশক বলেন,

> ধ্রুপদী আঙ্গিকের এই প্রযোজনাকে দর্শকের সামনে উপস্থাপনের জন্য পাণ্ডুলিপি নির্বাচনের কাজ শুরু হয় চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে। নাট্যশাস্ত্রের আটটি রসকে প্রাধান্য দিয়ে ধ্রুপদী বিভিন্ন উৎস থেকে পাণ্ডুলিপির কাঠামো নির্মাণ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের দুটি মহাকাব্য 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' এবং অন্যান্য ধ্রুপদী নাটক থেকে আখ্যান-বস্তু চিহ্নিত করা হয়।[৪]

অর্থাৎ নাটকটি কোনো একক পাণ্ডুলিপি থেকে নয় বরং পৃথক উৎস হতে প্রাপ্ত আখ্যানকে সংযোজিত করে। সংস্কৃত নাট্য বিষয়ে পণ্ডিতমহলে অনেক বিচার-বিশ্লেষণ হয়েছে। সে-সকল বিশ্লেষণ অনুযায়ী ভরতের *নাট্যশাস্ত্রে* নাট্যের বিভিন্ন শ্রেণি-বিভাগ করা হয়েছে। আচার্য ভরতের *নাট্যশাস্ত্রে* রূপককে (আধুনিক পরিভাষায় নাটক) দশ ভাগে[৫] ভাগ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে অলংকারগ্রন্থসমূহে আরও আঠারো প্রকার[৬] উপরূপকের কথা বলা হয়েছে। সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ-পূর্বক রূপকের বিভাগের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায়, এদের রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং স্বকীয়তা। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপন হতে পারে *রসপুরাণ*-কে কি পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত নাট্য বলা যায়? এ-প্রসঙ্গে কবির বলেন,

> আচার্য ভরতের *নাট্যশাস্ত্রে* নাট্যের যে শ্রেণি-বিভাগের কথা বলা হয়েছে, সেই বিচারে *রসপুরাণ*-কে পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত নাটক বলা যাবে না। প্রথমেই বলেছি আমার চিন্তা ছিলো রসভিত্তিক একটি প্রযোজনা নির্মাণ করা। সংস্কৃত নাট্য ভাণ্ডার অফুরন্ত নয়। বর্তমান সময়ে সংস্কৃত নাট্যের যে পাণ্ডুলিপি আমাদের নিকট রয়েছে সে-সকল পাণ্ডুলিপি 'নির্দিষ্ট' উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারছেনা। তাছাড়া আমরা বারংবার সেখানে হাত পেতেছি। তাই আমাকে বিকল্প পথ খুঁজতে হয়েছে। সংস্কৃত নাটকের উৎস অনুসন্ধান করলে আমরা– রামায়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ, প্রচলিত লোক-কাহিনি, ইতিহাস ও রাজনীতি, ধর্ম ও দর্শন এবং কবি-কল্পিত বিষয়-বস্তুই পাই। *রসপুরাণ*-এর পাণ্ডুলিপি নির্মাণেও আমরা এসকল উৎসকে গ্রহণ করেছি। সর্বোপরি *রসপুরাণ*-কে সংস্কৃত নাট্য বলার প্রয়োজন নাই। নাট্যশাস্ত্র বর্ণিত অভিনয় রীতি অনুসারে এর কাঠামো অগ্রসর করার চেষ্টা হয়েছে এবং আখ্যানসমূহ প্রাচীন ভারতীয় ধ্রুপদ আশ্রিত। যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে রসসমূহের মধ্যে সৃষ্টিশীল সংযোগ স্থাপন এবং সংশ্লেষ করা।[৭]

নির্দেশকের উপর্যুক্ত উক্তির মৌল উদ্দেশ্য স্পষ্ট ও যথার্থতার পাশাপাশি সমগ্র পরিবেশনা জুড়েই রয়েছে সংস্কৃত নাট্যরীতির ব্যবহার। তাই *রসপুরাণ*-কে পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত নাট্য না বলে নাট্যশাস্ত্র নিঃসৃত প্রযোজনা হিসেবে বিবেচনা করলে ভাষার অর্থগত ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে না। কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে আখ্যানসমূহকে একত্র করা হলো, সে-সম্পর্কে কবির বলেন,

> অষ্টরসাখ্যানস্বরূপ এই প্রযোজনায় যে অদৃশ্য সুতোটি এক দৃশ্যের সাথে আরেক দৃশ্যের মধ্যে ভাবগত সংযোগ স্থাপন করেছে তা হলো রস। ধারণাগত কাঠামো (কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক) রূপে রসনিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার পটভূমিতেই খণ্ড-খণ্ড দৃশ্যের সংশ্লেষণের মধ্যদিয়ে সংকটময় পরিস্থিতি থেকে সুন্দর ও নির্মল পরিণতির দিকে এগিয়ে যায় আমাদের প্রযোজনা *রসপুরাণ*।[৮]

অর্থাৎ নির্দেশকের উক্তির মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, *রসপুরাণ* নাট্য সরাসরি কোনো সংস্কৃত নাট্যের অনুবাদ বা রূপান্তর নয়। আলাদা-আলাদা উৎস থেকে আখ্যান সংগ্রহ করে হাইপারলিংক

(Hyperlink) হিসেবে *নাট্যশাস্ত্র* বর্ণিত অষ্টরস-এর ব্যবহার হয়েছে। নাট্য উপস্থাপনে নির্দেশকের সমগ্র মহড়া পর্বটির উদ্দেশ্য ছিলো সন্ধান– নাট্যরস সন্ধান। পাণ্ডুলিপি, প্রযোজনা ডিজাইন এবং নাট্যের অন্যান্য সকল নাট্য-উপাদান ছিলো উল্লেখিত সন্ধান প্রক্রিয়ার ফসল। এই লক্ষ্যে মহড়ার প্রারম্ভে শিক্ষার্থীদের অভিনয়রীতি ও আখ্যানসমূহের সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানের জন্য বিভিন্ন ধ্রুপদী নাট্যপাঠ, পিটার ব্রুকের চলচ্চিত্র 'মহাভারত'-সহ বিভাগে পূর্বে মঞ্চস্থ সংস্কৃত প্রযোজনার ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। পাশাপাশি 'আঙ্গিকাভিনয়'-এর প্রস্তুতির জন্য অঙ্গসঞ্চালন অনুশীলন যথাযথভাবে শুরু হয়। সাক্ষাৎকারে প্রযোজনার জনৈক অভিনেতা বলেন,

> আমরা নির্ধারিত বৎসরের জানুয়ারি মাস থেকে মহড়া শুরু করি। মহড়ায় 'স্টাইলাইজড' পরিবেশনার কৌশল রপ্ত করা শুরু করি। 'লার্জার দেন লাইফ' ব্যাপারটা বুঝতে আরম্ভ করি। প্রতিটি নাট্যরস বিষয়ে 'ইম্প্রোভাইজেশন' করতে থাকি। এতে করে একসময় উপলব্ধি করি আমরা চরিত্রের প্রয়োজনে আরোপিত অভিনয় করছিনা।[৯]

নাট্যনির্দেশক কবির বলেন, "একজন দক্ষ অভিনেতার দৈহিক উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ তাই *রসপুরাণ* নির্মাণে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয় আঙ্গিকাভিনয়ে।"[১০] শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের যৌথ মিথস্ক্রিয়ায় পাণ্ডুলিপি নির্মাণের পর নির্বাচিত অংশগুলো নিয়ে পুনঃসৃজনের লক্ষ্যে শুরু হয় তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন (ইম্প্রোভাইজেশন) ভিত্তিক মহড়া। 'থিয়েটার গেমস্'সহ অপর কিছু অনুশীলনের লক্ষ্যে, প্রতিটি রসের 'নাট্যক্রিয়া' নির্ধারণ করে চলে মহড়া। যে কোনো সুনির্দিষ্ট ক্রিয়া নিষ্পন্ন করলেই নাট্য সৃষ্টি হয়, তাই ক্রিয়াটি শারীরিক না মানসিক সেদিকেও গুরুত্ব দিয়ে চলে মহড়া। এভাবে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে, সৃজনশীল উপস্থাপনের মধ্যদিয়ে *রসপুরাণ* নাট্য প্রযোজনার বিভিন্ন চরিত্র নির্মাণ ও রূপায়ণ করা হয়। কবির বলেন, "নাটকটির উপজীব্য হলো মানুষের সভ্যতার দ্বান্দ্বিক অগ্রগতির ইতিহাস, যুদ্ধ, হত্যা, ভয়, ক্রোধ শেষে যূথবদ্ধ জীবনে অফুরান ভালোবাসা ও সৌন্দর্যের প্রয়োজনীয়তা।"[১১]

২

নাট্যরস কী? এর সমৃদ্ধ ও যথাযথ উত্তর সরাসরি বা এক বাক্যে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে বলা যায়, রস অপার্থিব বা অতীন্দ্রিয় কিছু নয়, একটা বিশেষ মানসিক অবস্থা। *নাট্যশাস্ত্র*-এর প্রবর্তক ভরত, নাট্যরসের উৎপত্তি ও আস্বাদ প্রক্রিয়াকে লৌকিক রসের উৎপত্তি ও আস্বাদ-প্রকারের সাথে সাদৃশ্য নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। লৌকিক রস নিষ্পন্ন হয়– বিবিধ ব্যঞ্জন, ওষধি ও দ্রব্যের সংযোগে। ঠিক সেভাবেই নানা ভাবের সংযোগে স্থায়ীভাব রসে পরিণত হয়। 'রস' একটি পারিভাষিক শব্দ। রস শব্দের মুখ্য অর্থ আস্বাদ।[১২] রস আস্বাদিত হয় বলেই আলংকারিকগণ 'রস' শব্দের প্রয়োগ করেছেন। ভরত-এর *নাট্যশাস্ত্রে* উল্লেখ রয়েছে,

> [...] নানা ব্যঞ্জনে সংস্কৃত অন্ন ভক্ষণ করতে করতে রসসমূহ আস্বাদন করেন, এবং আনন্দাদি লাভ করেন, তেমনই সহৃদয় দর্শকগণ নানা ভাবের বাচিক, আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়ে ব্যক্ত স্থায়িভাবসমূহ আস্বাদন করেন ও আনন্দাদি উপভোগ করেন। এর থেকে নাট্যরস ব্যাখ্যাত হল।[১৩]

অর্থাৎ, ভরত-এর উক্তিটি যথাযথ বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টই বোঝা যায়, সকল রসিক দর্শকই রস আস্বাদন করে থাকেন। রস হলো চিত্তবৃত্তির এক ধরনের অবস্থা বা পরিণতি। এ-রকম রসই

কাব্যের হৃদয়। নাট্যরসের আশ্রয় নাট্য, অভিনেতা-অভিনেত্রী বা নাট্যকার নয়। সহৃদয় দর্শকের মনই এর আধার। আর রস ব্যতীত কোনো বস্তু বা শিল্পই আনন্দদায়ক হতে পারে না। ভরত বলেন, 'যেমন ভোজনরসিক ব্যক্তিগণ বহু দ্রব্য ও ব্যঞ্জনযুক্ত ভোজ্য ভোজন করতে করতে (রস) আস্বাদন করেন, তেমনই বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভাবের অভিনয়যুক্ত স্থায়ি ভাবসমূহ মনে মনে আস্বাদন করেন। সেইজন্য নাট্যরস খ্যাত।'[১৪] এছাড়া জনৈক সমালোচক রস আস্বাদন সম্পর্কে বলেন, 'সহৃদয়গণের রত্যাদি স্থায়িভাব, বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারিভাবের দ্বারা ব্যক্ত হইয়া (রূপান্তরিত হইয়া) রসতা প্রাপ্ত হয় [...]। যেমন, দুগ্ধ দধিরূপে পরিণত হয় সেইরূপ সহৃদয়গণের বিভাবাদি জ্ঞানই রসে পরিণত হয়।'[১৫]

অতএব, মানুষের চিত্ত গঠিত হয় কতক বৃত্তি দ্বারা। আর চিত্তবৃত্তির মধ্যে রয়েছে স্থায়ীভাব। সহৃদয় দর্শক যখন কোনো শিল্প দর্শন করেন তখন তাঁর স্থায়ীভাবের যে কোনো একটি ভাব এমনভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে যে তখন তিনি ঐ নাট্য বর্ণিত ভাবে তন্ময় হয়ে যান এবং নিজের হৃদয়ে অপূর্ব আনন্দে মগ্ন হয়ে পড়েন, তখনকার অবস্থাকেই বলা যায় রসাস্বাদ। ভাবই পূর্ণ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলে লাভ করে রসরূপতা। রসের মাধ্যমে শিল্পের সর্বশেষ পরিমাপ হয়। আর ভাব রসেই আশ্রিত থাকে। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত তাঁর গ্রন্থের 'রসবিকল্প অধ্যায়ে' নাট্য রসকে আট ভাগে বিভক্ত করেছেন, 'শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত।'[১৬] সাথে সাথে তিনি রস-সমূহের স্থায়ী ভাব, বর্ণ ও দেবতার নাম উল্লেখ করেছেন। স্থায়ী ভাবসমূহ এবং তা থেকে উৎপন্ন রসসমূহ হলো, 'রতি ভাব থেকে শৃঙ্গার, হাস থেকে হাস্য, শোক দ্বারা করুণ, ক্রোধ থেকে রৌদ্র, উৎসাহ যোগে বীর, ভয় দ্বারা ভয়ানক, জুগুপ্সা থেকে বীভৎস ও বিস্ময় থেকে অদ্ভুত।'[১৭] বর্ণসমূহ হলো, 'শৃঙ্গার হয় শ্যামবর্ণ, হাস্য সাদা, করুণ কপোতবর্ণ (অর্থাৎ ধূসর), রৌদ্র লালা, বীর গৌর, ভয়ানক কাল, বীভৎস নীল ও অদ্ভুত হলুদ।'[১৮] দেবতা হলো, 'শৃঙ্গারের দেবতা বিষ্ণু, হাস্যের প্রথম, করুণের যম, রৌদ্রের রুদ্র, বীরের মহেন্দ্র, ভয়ানকের কাল, বীভৎসের মহাকাল ও অদ্ভুতের ব্রহ্মা।'[১৯]

নাট্যশাস্ত্রকার ভরত তাঁর গ্রন্থে নাট্য রসকে যে ক্রমে বিনস্ত করেছেন তার ব্যতিক্রম *রসপুরাণ* প্রযোজনায় লক্ষ করা যায়। *রসপুরাণ* নাট্যের রসভিত্তিক ক্রম হলো– করুণ, বীভৎস, অদ্ভুত, রৌদ্র, হাস্য, ভয়ানক, বীর ও শৃঙ্গার। এছাড়া নাট্যের শুরুতে নান্দী, সূত্রধার (কোনো কোনো প্রদর্শনীতে), আখ্যান এবং শেষে ভরতবাক্য পাঠ যুক্ত করে নাট্যের সমাপ্তি ঘটে। নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখিত আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক অভিনয় রীতির সম্পূর্ণ প্রয়োগ ঘটে *রসপুরাণ* প্রযোজনার নির্মাণ কৌশলে। এ-প্রসঙ্গে কবির বলেন,

> অভিনয়ের 'তত্ত্ব' ও 'রস'-এর ধারণার নির্ভরযোগ্য প্রাচীন প্রামাণিক পাণ্ডুলিপি ভরত মুনি রচিত 'নাট্যশাস্ত্র'। যেহেতু রসভিত্তিক একটি প্রযোজনা নির্মাণ করা আমাদের লক্ষ ছিলো তাই আমরা ধ্যনমগ্ন হয়ে তা পাঠ করেছি। বোঝার চেষ্টা করেছি। নাট্যভাষা নির্মাণ করেছি। পাণ্ডুলিপি নির্মাণ করে নাট্যশাস্ত্র-এর রসভিত্তিক ক্রমের ন্যায় বিনস্ত করে দেখি, কাহিনিতে পূর্ণ নাট্যের সৃজনশীলতা অনুপস্থিত। নাট্যের মূল বক্তব্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তাই ক্রমান্বয়ে সংশোধন ও সংযোজন করে সর্বশেষ স্তরে উপনীত হই। পাশাপাশি, আমরা *রসপুরাণ* প্রযোজনার একটি বক্তব্য খুঁজছিলাম যা অবশ্যই উদার মানবতাবোধের কাছাকাছি হয়। আমাদের

> নাট্যে এমন ভাষা প্রয়োজন, যা হবে ধ্রুপদী কাহিনির বিশালত্ব ধারণে সক্ষম এবং বর্তমান যুগের প্রবাহ উপস্থিত থাকবে। সে দিকে লক্ষ রেখেও আমরা নাট্যভাষার ঘটনাক্রম বিনস্ত করি।[২০]

রসপুরাণ প্রযোজনার সমকালীন বক্তব্য নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয় থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের সহোযোগী অধ্যাপক ড. শাহমান মৈশানকে। তিনি নিবিড় ভাবে নির্বাচিত নাটলিপি ও মহড়া পর্যবেক্ষণ করে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে লিখেন,

> সাতটি তারার তিমিরে ঢাকা অতীতকে দেখো! আর শোন! কালের স্রোতে ভেসে আসা এই মহাপৃথিবীর জীবন-কল্লোল! রক্তে, হত্যায়, ঘৃণায়, ভয়ে, প্রলয়ে, বিস্ময়ে, কৌতুকে, স্তব্ধতায় আর চিৎকারে কত বিচিত্র দাগ উৎকীর্ণ হয়ে আছে আমাদের আত্মায়, মানবের এই প্রাগৈতিহাসিক আত্মায়! তুমি তো তা জানো! তবু এই ঘোরলাগা প্রহরে তোমাদের আত্মার তলদেশে আমাদের চোখ রাখি আর আমরা আমাদের যৌথ মনে ভাবি–মানুষের সভ্যতা কতদূর এগোল? এই কুহকী প্রশ্নে, এই মায়াবী ডানার স্বপ্নে তাড়িত হয়েই তো তুমি আর আমি আলাদা হতে হতেও এক হয়ে যাই, বিচ্ছেদের মেঘ সরিয়ে হয়ে যাই যৌথ জীবনের ঝর্ণাধারা। এভাবে তোমাদের চোখের তলদেশে জেগে ওঠে এই মহাপৃথিবীর অন্তির্গত প্রাণের প্রবাহ। এখানে জীবন ফুরায় না, কেননা এখানে ভালোবাসা অফুরান।[২১]

ইউটিউব-এ প্রাপ্ত *রসপুরাণ* প্রযোজনার ভিডিও বিশ্লেষণ করলে নির্দেশক কবিরের উক্তির যথার্থতা লক্ষ করা যায়। নাট্যে ধ্রুপদী কাহিনির বিশালত্ব ধারণ সাপেক্ষে প্রযোজনাকে করা হয়েছে সমকালীন। কাহিনিতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যুক্ত হয়েছে। নাট্যক্রিয়া সম্পাদনে অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রতিক্রিয়াতেও বিশ্বাসযোগ্যতা লক্ষ করা যায়।

৩

রসপুরাণ প্রযোজনা নির্মাণ কৌশলে 'অষ্টবিধ নাট্যরস' (করুণ, বীভৎস, অদ্ভুত, রৌদ্র, হাস্য, ভয়ানক, বীর ও শৃঙ্গার) কীভাবে দর্শক চিত্তে 'আস্বাদন' এবং 'রসরূপতা' লাভ করে তা নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের নাট্যরস বিচার পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যের রসবক্তব্য নিম্নে আলোচনা করা যেতে পারে–

ক. *রসপুরাণ* প্রযোজনা আখ্যানে করুণ রস

মহাভারত মহাকাব্যের উল্লেখযোগ্য বীর চরিত্র অভিমন্যু। শৌর্যে বীর্যে তিনি তার পিতা অর্জুন এবং পিতামহ ইন্দ্রের সমতুল্য ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে মাত্র ষোল বছর বয়সে তার করুণ মৃত্যু হয়। অভিমন্যু প্রচণ্ড পরাক্রমশালী বীর ছিলেন। তিনি কৌরব সৈন্যবাহিনীর বহুদূরপ্রসারী ক্ষতি করেছিলেন। যা তার পূর্বে আর কেউ সংঘটিত করতে পারেনি। তাই কৌরবরা একত্র হয়ে তাকে আক্রমণ করেন। দ্রোণ, কর্ণ সহ সকলে অধর্মের আশ্রয় নিয়ে একত্রে বিদ্ধ করেন। কৌরব সৈন্যবাহিনী প্রথমে তার ধনুক ছিঁড়েছে, তার সারথিকে হত্যা করে তার রথ গুড়িয়ে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সৈন্য তাকে তীর বিদ্ধ করেছে। এরপরও তিনি মাটি থেকে উঠে– তলোয়ার, গদা এবং রথের চাকা দিয়ে যুদ্ধ করেছেন। অবশেষে তার কাছে যখন কোনো অস্ত্র ছিলো না তখন কৌরব শিবিরের রথী-মহারথীরা একত্র হয়ে তাকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেন। মহাভারতের এই ঘটনাক্রমকে কেন্দ্র করে নির্দেশক *রসপুরাণ* প্রযোজনায় 'করুণ রস' আখ্যান নির্মাণ করেন। নিম্নে উক্ত দৃশ্যের ঘটনাক্রম উল্লেখ করা হলো–

দুর্যোধন : আচার্য দ্রোণ, আপনি নিশ্চয় মনে করেন আমরা বধের যোগ্য। তাই আজ যুধিষ্ঠিরকে একা পেয়েও ছেড়ে দিলেন। একদিন প্রীত হয়ে বর দিয়েছিলেন জয়লাভের। কিন্তু আজ তার অন্যথা করলেন। মনে রাখবেন, সাধুলোক কখনোই তার বচন ভঙ্গ করেন না।

দ্রোণ : আমি সর্বদাই তোমার প্রিয় সাধনের চেষ্টা করি। কিন্তু তুমি তা কখনোই বোঝো না। স্বয়ং কৃষ্ণ যে পক্ষে আছেন এবং অর্জুন যার সেনানী, সে পক্ষের বল ত্র্যম্বক মহাদেব ভিন্ন আর কে অতিক্রম করতে পারে?

দুর্যোধন : আপনি তো পরশুরামের শিষ্য।

দ্রোণ : আমি জানি। তোমায় কথা দিচ্ছি, আজ আমি পাণ্ডবদের কোনো এক মহারথীকে নিপাতিত করবো। আর এমন ব্যূহ রচনা করবো যা স্বয়ং দেবতারাও ভেদ করতে পারবে না। তুমি শুধু যে কোনো উপায়ে অর্জুনকে সরিয়ে রেখ।

দুর্যোধন : তাই হবে।

পাণ্ডব শিবির [যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব ও অভিমন্যুর প্রবেশ]

যুধিষ্ঠির : বৎস

অভিমন্যু : আমাকে আশীর্বাদ করুন তাত। আমি যেন দ্রোণের ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করতে পারি।

যুধিষ্ঠির : দ্রোণকে আর কেউ চক্রব্যূহ রচনায় বাধা দিতে পারবে না। তোমার পিতৃগণ, মাতুলগণ এবং সমস্ত সৈন্য সামন্তের বর তোমার নিকট রয়েছে। যাও, ওদের চক্রব্যূহ ভেদ করে এসো।

অভিমন্যু : আমার পিতৃগণের জয় কামনায় আমি অবিলম্বে দ্রোণের চক্রব্যূহে প্রবেশ করবো। কিন্তু পিতা তো আমাকে কেবলমাত্র প্রবেশের কৌশলই শিখিয়েছেন। যদি ভেতরে গিয়ে কোনো বিপদ হয় বেরিয়ে আসতে পারবো না।

নকুল : অভিমন্যু, তুমি শুধু ব্যূহ ভেদ করে দ্বার তৈরি করো। আমরা তোমার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তোমাকে রক্ষা করবো। পাঞ্চাল, মৎস, কৈকেয় প্রভৃতির যোদ্ধারাও যাবেন। তুমি একবার ব্যূহ ভেদ করলে বিপক্ষের প্রধান প্রধান সেনানীদের নিয়ে ব্যূহ বিধ্বস্ত করবো।

অভিমন্যু : পতঙ্গ যেমন জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে আমি সেই রূপ দুর্ধর্ষ হয়ে ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করবো। আর সকলেই দেখবে, বালক হয়েও অভিমন্যু কিভাবে দলে দলে শত্রু সৈন্য ধ্বংস করে।

ভীম : পুত্র, পাণ্ডবগণ তোমাকে গুরুভার অর্পণ করেছে। দ্রোণাচার্য অস্ত্র বিশারদ, কৃতী যোদ্ধা, যুদ্ধে নিপুণ। আর তুমি সুখে লালিত। বড়োই আদরের।

অভিমন্যু : দ্রোণ কেন সমগ্র ক্ষত্র মণ্ডলকেও আমি ভয় করি না। দেবরাজ ইন্দ্রের সাথে আমি যুদ্ধ করতে পারি। বিশ্বজয়ী মাতুল কৃষ্ণ এবং পিতা স্বয়ং অর্জুনও যদি আসেন তবুও আমি ভয় করবো না। আমাকে আশীর্বাদ করুন। [দুঃশাসন, দ্রোণাচার্য ও দুর্যোধন সহ ব্যূহরচনায় যোদ্ধাদের প্রবেশ]

দুঃশাসন : বীরগণ, অভিমন্যু চক্রব্যূহ ভেদ করতে করতে এগিয়ে আসছে। আপনারা সকলে প্রস্তুত হোন।

দ্রোণাচার্য : এই সুভদ্রা নন্দন তুল্য ধনুর্ধর আর কেউ আছে বলে মনে হয় না।

দুর্যোধন : বীরগণ, অভিমন্যুকে বধ করুন।

দুঃশাসন : আমিই তোকে বধ করবো।

অভিমন্যু : হায়, ভাগ্যক্রমে আজ ধর্মত্যাগী, নিষ্ঠুর, কূটভাষী বীরদেরকে যুদ্ধে দেখছি। আর তুমি, দ্যূত সভায় কটুবাক্যে উন্মত্ত হয়ে যুধিষ্ঠিরাদিকে ক্রোধান্বিত করেছিলে। আজ তোমাকে শাস্তি দিয়ে পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীর নিকট ঋণমুক্ত হবো। (যুদ্ধের আরম্ভ হয়)

অভিমন্যু : পিতো...

(যুদ্ধে অভিমন্যু নিহত হয়)

[পাণ্ডব শিবিরে নিহত অভিমন্যুকে নিয়ে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবের বিলাপ]

নির্দেশক কবির, মহাভারতের অভিমন্যুবধের কাহিনিকে তার প্রযোজনায় যথার্থ ভাবে প্রয়োগ করেছেন। কিশোর বীর অভিমন্যুকে নিষ্ঠুর ভাবে বধ হওয়ার মধ্য দিয়ে 'শোক' ভাব পুষ্ট হয়ে করুণ রসের জন্ম দেয়। *নাট্যশাস্ত্র* মতে, 'প্রিয়জনের বধ, অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ প্রভৃতি ভাববিশেষ দ্বারা করুণরস উদ্ভূত হয়।'[২২] কিশোর অভিমন্যুকে নিষ্ঠুর ভাবে বধের ঘটনা এবং অভিমন্যুর 'পিতো' বলে আর্তনাদের মধ্য দিয়ে শোক ভাব প্রকাশিত হয়েছে। করুণ রসের অভিনয় প্রসঙ্গে ভরত বলেন, 'সশব্দরোদন, মূর্ছা, পরিদেবন, বিলাপ, দেহের কষ্ট বা দেহের আঘাত দ্বারা করুণ রস অভিনেয়।'[২৩] দৃশ্যের শেষে ভীম যেভাবে অভিমন্যুর নিথর দেহ নিয়ে বিলাপ করে আর সজল নয়নে যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব শূন্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাতে রসিক দর্শক করুণ রসে আস্বাদিত হয়। উক্ত দৃশ্যের প্রতিক্রিয়ায় জনৈক নাট্যজন অনলাইন পত্রিকায় লিখেছেন,

> অভিমন্যু অভেদ্য চক্রব্যূহ ভেদ করে করে এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যেতে যেতে একসময় বধ হলো। নিজের অবিশ্বাস্য প্রস্থানের কালে অভিমন্যু শুধু পিতাকেই স্মরণ করতে পারলেন। দুঃশাসনের হাতে মৃত পুত্রকে জড়িয়ে ধরে ঘন নৈঃশব্দ্যের ভেতর ভীমের 'পুত্র' বলে সঘন চিৎকার, করুণ হয়ে কানে বাজে।[২৪]

নাট্য দৃশ্যের– আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য অভিনয়ের মাধ্যমে এবং নাটলিপিতে উপযুক্ত সংলাপের মাধ্যমে ঘটে এই করুণ রসের বহিঃপ্রকাশ। মোট কথা, নির্দেশক *রসপুরাণ* প্রযোজনায় করুণ রস সার্থকভাবে অবতারণা করেছেন।

খ. *রসপুরাণ* প্রযোজনা আখ্যানে বীভৎস রস

মহাভারত মহাকাব্যের উল্লেখযোগ্য বধের মধ্যে দুঃশাসন বধ অন্যতম। *রসপুরাণ* প্রযোজনায় অভিমন্যু বধের পর মঞ্চে নির্দেশক দুঃশাসন বধ-এর আখ্যান 'বীভৎস রস' হিসেবে উপস্থাপন করেন। দ্যূতসভায় দুঃশাসন পাণ্ডব পত্নী দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। দ্রৌপদীর সেই অসহায়ত্বের সময় স্বামী ভীম অপমানের প্রতিশোধ নিতে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যুদ্ধের সময় দুঃশাসনের বুক বিদীর্ণ করে রক্ত পান করবো। এই প্রতিজ্ঞার ফলস্বরূপ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সতেরোতম দিনে ভীমের হাতে দুঃশাসন বধ হয়। *রসপুরাণ* প্রযোজনায় যুদ্ধরত দুঃশাসন ও ভীম-এর সংলাপ এবং আঙ্গিক অভিনয়ে বীভৎস রসের চিত্র পরিষ্কার ভাবে উঠে আসে। দৃশ্যের ঘটনাক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

ভীম : অট্টহাস্য করার খুব ইচ্ছা তাই না তোমার দুঃশাসন? অট্টহাস্য হবে এই যুদ্ধক্ষেত্রে। আমি তোমাকে সেই সুযোগ দেব, তবে তা হবে তোমার মৃত্যুর অট্টহাস্য। মৃত্যু তোমার শত ভাইয়ের ওপর অট্টহাস্য করবে। ইতোমধ্যে অনেক পাপী কৌরবের রক্ত আমার গদা পান করেছে। আজ শ্রেষ্ঠ পাপী, ওরে দুঃশাসন তোর পালা।

দুঃশাসন : অদ্ভুত, অদ্ভুত দৃশ্য! বাহ। আমার এখন ঠিক দ্যূত সভার কথা মনে পড়ে গেল। যেমনটা আমি দ্রৌপদীকে সভায় টেনে এনেছিলাম। বৃকোদর ভীম, দ্রৌপদী আসলে কী হয় তোমার? অর্ধাঙ্গিনী না বৌদি? এক্ষেত্রে তো অঙ্গরাজ কর্ণের কথাই বেশি উপযুক্ত। বেশ্যা..., বেশ্যা...।

[উভয়ের যুদ্ধে দুঃশাসন পরাজিত হয়। ভীম দুঃশাসনকে দ্রৌপদীর কাছে নিয়ে যায় এবং তার সামনে দুঃশাসনের বুক ছিন্ন করে নিজে রক্ত পান করে এবং দ্রৌপদী রক্তে কেশ ধৌত করে]

নাট্যশাস্ত্রকার বীভৎস রসের আলোচনায় বলেন, 'অপ্রিয় বস্তুর দর্শন, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দদোষ এবং বহুপ্রকার উদ্বেগে বীভৎস রস উদ্ভূত হয়।'[২৫] বীভৎস রসের অভিনয় সম্পর্কে বলেন, 'মুখ চোখের সংকুচন, নাসিকাচ্ছাদন, অবনত মুখ এবং অব্যক্ত পাদপ্রচার দ্বারা বীভৎস রস সম্যকভাবে অভিনেয়।'[২৬] এক্ষেত্রে *রসপুরাণ* প্রযোজনায় নির্দেশক বীভৎস রসের যর্থাথ প্রয়োগ ঘটান। প্রযোজনায় অভিনেতা-অভিনেত্রী আঙ্গিক অভিনয়ের মাধ্যমে দুঃশাসনের বক্ষ যেভাবে খড়্গ দিয়ে বিদীর্ণ করেন এবং তার রক্ত পান করেন, তাতে নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত অপ্রিয় বস্তুর দর্শন, রস ও গন্ধ সবকিছুরই উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যখন অভিনেতা দুঃশাসনের বুক বিদীর্ণ করে রক্ত পান করেন এবং দ্রৌপদী রক্ত দিয়ে কেশ বন্ধন করেন তখন অভিনেতাদের অভিনয়ে– মুখ-চোখের সংকুচন, নাসিকাচ্ছাদন, অবনত মুখ এবং অব্যক্ত পাদপ্রচার পরিষ্কার ভাবে লক্ষ করা যায়। ফলশ্রুতিতে দর্শককুল 'জুগুপ্সা' ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে বীভৎস রস আস্বাদন করেন।

গ. *রসপুরাণ* প্রযোজনা আখ্যানে অদ্ভুত রস

রসপুরাণ প্রযোজনায় দর্শক বীভৎস রস আস্বাদনের পরপরই মঞ্চে নির্দেশক উপস্থাপন করেন 'অদ্ভুত রস'। মঞ্চে আবির্ভাব হয় মহাভারতে বর্ণিত চরিত্র যুধিষ্ঠিরের। শ্রীকৃষ্ণ নশ্বর দেহ ত্যাগ করে তার আদি বাসস্থানে যাওয়ার পর, পাণ্ডব এবং দ্রৌপদীও যথাক্রমে দেহ ত্যাগ করে স্বর্গে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমে তারা অনেক ধর্মীয় স্থানে গিয়েছিলেন এবং পরবর্তীসময়ে স্বর্গের দিকে যাত্রা শুরু করেছিলেন। যাত্রাপথে দ্রৌপদী ও পাণ্ডবরা একে একে পড়ে যান। তারা তাদের পূর্বের কৃতকর্মের কারণে মৃত্যু বরণ করেন। শুধু জীবিত ছিলেন যুধিষ্ঠির। কারণ, কথিত আছে যে তার জীবনে কখনো কোনো অন্যায় করেনি সে তার নশ্বর দেহ নিয়ে স্বর্গে যেতে পারে। সবাইকে হারানোর পর একটি কুকুর যুধিষ্ঠিরের সঙ্গী হয়। নাট্যভাষ্যে এ-প্রসঙ্গে ইন্দ্রদেব ও যুধিষ্ঠির কথোপকথন নিম্নরূপ–

ইন্দ্র : হে ধর্ম রাজ যুধিষ্ঠির, তুমি তোমার জন্ম কাল থেকে শুরু করে আজ অবধি সকল কাজ নিষ্ঠার সাথে পালন করেছ। এমনকি তুমি সকল প্রকার লোভ-লালসা হিংসা-বিদ্বেষ এবং সকল পাপ-কার্য থেকে দূরে থেকেছ। তোমার ন্যায় ও নিষ্ঠাবান কাজে আমি মুগ্ধ হয়েছি। হে যুধিষ্ঠির, তুমি তোমার পুণ্যের জোরে আমার তুল্য অমরত্ব, ঐশ্বর্য সিদ্ধি এবং স্বর্গ সুখের অধিকারী হয়েছ। তুমি আমার সাথে ইন্দ্রপুরিতে চলো। সেখানে তোমার জন্য অসীম সুখ ও অপার সৌন্দর্য অপেক্ষা করছে।

যুধিষ্ঠির : হে দেবরাজ ইন্দ্র, আমার সাথে যারা ছিলো প্রত্যেকেই দেহত্যাগ করেছে। বর্তমানে এই কুকুরটি ছাড়া আমার কেউ নেই। আমি ইন্দ্রপুরিতে আমার কুকুরটিকেও সাথে নিতে ইচ্ছে করি।

ইন্দ্র : সঙ্গে শ্বাপদ নিয়ে কেউ স্বর্গে যেতে পারে না। তুমি তুচ্ছ কুকুরের জন্য স্বর্গ সুখ পেয়েও তা তুচ্ছ জ্ঞান করছ? তুমি এই কুকুরকে ত্যাগ করো।

যুধিষ্ঠির : হে সহস্রলোচন, আমি আর্য হয়ে অনার্যের ন্যায় আচরণ করতে পারি না। আমি মনে করি, শরণাগতকে ভয় দেখানো, স্ত্রীবধ, মিত্রবধ এবং ব্রহ্মস্বহরণ, এই চার কার্যে যে রূপ পাপ হয়, ভক্তকে ত্যাগ করলে সেই রূপ হয়। তাই মহারাজ, ভক্ত কুকুরকে ত্যাগ করে আমার পক্ষে স্বর্গসুখ লাভ করা সম্ভব নয়।

ইন্দ্র : হে ধর্মরাজ, তুমি আবারও একবার তোমার সততার পরিচয় দিলে। তোমার মেধা এবং সর্বভূতে দয়া আছে। তুমি এ জগতের মাহাত্ম্যহীন কুকুরের জন্য ঈপ্সিত বস্তু পেয়েও দেবরথ ত্যাগ করতে চেয়েছ। শুরু থেকে আজ অবধি যতো পরীক্ষা আমি তোমার নিয়েছি, তুমি সবগুলোতেই উত্তীর্ণ হয়েছ। আমি সত্যি প্রীত। তাকিয়ে দেখো, তোমার সঙ্গে কুকুরটি আর কেউ নয়, স্বয়ং ধর্ম। তাই হে ভারতশ্রেষ্ঠ, তুমি সশরীরে স্বর্গারোহণ করে অক্ষয়লোক লাভ করবে। [যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ]

উপর্যুক্ত এই দৃশ্য *রসপুরাণ* নাট্যে 'অদ্ভুত রস' রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। অদ্ভুত রস সম্পর্কে নাট্যশাস্ত্রকার বলেন, 'তারপর অদ্ভুতরস, এর স্থায়িভাব বিস্ময়। দিব্য ব্যাপার দর্শন, ঈপ্সিত দ্রব্য লাভ, উত্তম গৃহ ও দেবমন্দিরে গমন, সভানুষ্ঠান, বিমান বিহার, মায়া, ইন্দ্রজাল প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা এই (রস) উৎপন্ন হয়।'[২৭] অদ্ভুত রস অভিনয় সম্পর্কে বলেন, 'এর অভিনয় চক্ষুর বিস্ফারণ, অনিমেষ দৃষ্টি, রোমাঞ্চ, অশ্রু, ঘর্ম, হর্ষ, প্রশংসা, দান, হাহাকার, হস্ত, বাহু, মুখ ও চক্ষুর সঞ্চালন প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা প্রযোজ্য।'[২৮] ভরত আরো বলেন, 'অতিশয়োক্তি, বাক্য, চরিত্র, কর্ম ও রূপের আতিশয্য–এই বিশেষ ব্যাপারগুলি দ্বারা অদ্ভুতরস হয়।'[২৯] *রসপুরাণ* প্রযোজনায় মঞ্চের কেন্দ্র থেকে যে সুসজ্জিত রথ সদৃশ দোলনা নেমে আশে তা ভরতের অদ্ভুত রস সম্পর্কে উক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। দর্শক দিব্য ব্যাপার দর্শন, বিমান বিহার, মায়া, ইন্দ্রজাল প্রভৃতির সাক্ষী হয়। দর্শকের মধ্যে 'বিস্ময়' ভাব উৎপন্ন হয় এবং অদ্ভুতরস আস্বাদন করেন। এ-প্রসঙ্গে অনলাইন পত্রিকায় নাট্যজন লিখেছেন, 'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের জন্য আকাশ থেকে নেমে এল দোলনা, ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মাঝে আলো আর রঙের ভেতর দিয়ে সেই আকাশযানে চড়ে উঁচুতে উঠে যেতে যেতে যুধিষ্ঠিরের শূন্যে মিলিয়ে যাওয়ার স্মৃতি প্রায় সঙ্গীতের মতো, পুনঃপুন দোলা দিয়ে যায়।'[৩০] নির্দেশক কবির, অভিনেতাকেও বেশ দক্ষতার সাথে পরিচালনা করিয়েছেন। অভিনেতার অভিনয়ে– চক্ষুর বিস্ফারণ, অনিমেষ দৃষ্টি, রোমাঞ্চ, অশ্রু, ঘর্ম, হস্ত, বাহু, মুখ ও চক্ষুর সঞ্চালন প্রভৃতি অনুভাবের প্রয়োগ ঘটান। অতএব, যে দর্শক ভাষা বোঝে না বা কানে শোনে না সেও শুধু চোখে দেখেই দৃশ্যের ভাব বুঝে অদ্ভুত রস অনুভব করতে পারে।

ঘ. *রসপুরাণ* প্রযোজনা আখ্যানে রৌদ্র রস

'রৌদ্র রস'-এর আখ্যান ভাষ্য নির্মাণে নির্দেশক ভগবত পুরাণে শিবের তাণ্ডব অংশ ব্যবহার করেন। 'শিব তাণ্ডব' একটি শক্তিশালী এবং ছন্দময় নৃত্য যা মহাজাগতিক শক্তির একটি ঐশ্বরিক নৃত্য বলে মনে করা হয়। পুরাণে বর্ণিত শিব পত্নী সতী যখন রাজা দক্ষ কর্তৃক স্বামী শিবের অপমান সহ্য করতে না পেরে যজ্ঞানুষ্ঠানে অগ্নি কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন, তখন শিব তাঁর শোক এবং ক্রোধে যে ধ্বংসাত্মক রুদ্র তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেছিলেন তাকেই রৌদ্ররস রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে *রসপুরাণ* আখ্যানে। আখ্যান ভাষ্য নিম্নরূপ–

[শিবের ধ্যানরত অবস্থায় মুনি তার কাছে আসে]

মুনি : মহাদেব..., ধ্যান থেকে বেরিয়ে আসুন মহাদেব। দক্ষ কর্তৃক আপনার অপমান সহ্য করতে না পেরে মাতা সতী যজ্ঞাগ্নিতে দেহ ত্যাগ করতে চলেছেন। আর চুপ থাকবেন না হে দেব। না এভাবে চলতে দেয়া যায় না ।

মহাদেব : দুরাচারী দক্ষ, একি করলি তুই। আত্ম দম্ভে মত্ত হয়ে আমার সতীকে দেহ ত্যাগে বাধ্য করলি? এতদিন সকল পাপের ক্ষমা তুই পেয়েছিস । আজ নিজ পাপে নিজের ও জগতের ধ্বংস ডেকে আনলি।

[শিবতাণ্ডব শুরু হয়]

নাট্যশাস্ত্র এই রস সম্পর্কে বলেন, 'যুদ্ধে প্রহার, হত্যা, অঙ্গবিকৃতি, অঙ্গের ছেদন, ভেদন সংগ্রামে বিক্ষোভ প্রভৃতি দ্বারা রৌদ্র রস উদ্ভূত হয়।'[৩১] রৌদ্র রসের অভিনয় সম্পর্কে বলেন, 'নানা অস্ত্রক্ষেপ, মস্তক, কবন্ধ ও হস্তছেদন– এই সকল বিশেষ বিষয়ের দ্বারা এর অভিনয় প্রযোজ্য।'[৩২] পরবর্তী শ্লোকে বলেন, 'এই প্রকার রৌদ্ররস দৃষ্ট হয়; এতে বাক্য, অঙ্গ ও কাজকর্ম হয় ভীষণ, অস্ত্রাঘাত বহুল পরিমাণে থাকে এবং গতিবিধি হয় উগ্র।'[৩৩] *রসপুরাণ* প্রযোজনায় রাজা দক্ষের প্রতি শিবের ক্রোধের ফলে ঘটেছে রৌদ্র রসের পরিবেশ এবং অভিনয় কালে দর্শকচিত্তে এই রস উদ্বুদ্ধ হয়। দৃশ্যে নির্দেশক কবির, যে স্থান-কাল, বেশ-ভূষা ব্যবহার করেছেন তা ছিল যথার্থ। দর্শক চিত্তে 'ক্রোধ' ভাব জাগ্রত করতে দৃশ্যে– বাচিক, আঙ্গিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য অভিনয়ের উপযুক্ত প্রয়োগ ঘটান। উপরিউক্ত রৌদ্র রসের আখ্যান ভাষ্যে শিবের সংলাপে– ক্রোধ প্রকাশ, তিরস্কার, তাড়ন, পাটন ও ভেদন প্রভৃতির প্রকাশ রয়েছে যা রৌদ্র রসোদ্বোধের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। এই রসের অভিনয়ে নির্দেশক চোখ-রাঙান, ভ্রুকুটি ও দন্তে ওষ্ঠে-পীড়ন প্রভৃতি স্বাত্ত্বিক অভিনয়ের প্রয়োগ করেন। নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত রৌদ্র রসের অভিনয় সম্পর্কে যে অস্ত্রক্ষেপ, মস্তক, কবন্ধ ও হস্তছেদন কথা বর্ণনা হয়েছে তা নির্দেশক সার্থক ভাবে ব্যবহার করেন। অবশেষে বলা যায় এই দৃশ্যে, ক্রোধ ভাব যথাযথ ভাবে পুষ্ট হয়ে রৌদ্র রস লাভ করে।

ঙ. *রসপুরাণ* প্রযোজনা আখ্যানে হাস্য রস

রসপুরাণ প্রযোজনার পঞ্চম দৃশ্য 'হাস্য রস' আশ্রিত। আপাতদৃষ্টিতে হাস্যরস যতই চটুল বা লঘু হোক না কেন, সেখানে জীবনের গুরুত্ব ও গভীরতা থাকে। হাস্যরসের গূঢ় রহস্য ব্যক্তিকে নানা দিক থেকে ব্যাপ্ত করে।[৩৪] সাধারণ বুদ্ধিতেও বোঝা যায় যে, উপরিউক্ত অন্যান্য রসের সঙ্গে হাস্যের মিল হয় না। নাট্যে 'ড্রামাটিক রিলিফ' দরকার হয়। নির্দেশক *রসপুরাণ* প্রযোজনার যথাস্থানেই হাস্য রস আখ্যান ব্যবহার করে ড্রামাটিক রিলিফ তৈরির পাশাপাশি নাট্যে গুরুত্ব ও গভীরতা আরোপ করেছেন। উপরিউক্ত রস আশ্রিত দৃশ্যের চরিত্রগুলো ভীষণ মানসিক চাপে পীড়িত। পাশাপাশি দর্শকও সেই ভাব বহন করে চলছিল। নাট্যের এ অবস্থায়ই হাস্যের অবকাশ ছিল। যা নির্দেশক সার্থক ভাবে তুলে ধরেছেন। শূদ্রক বিরচিত *মৃচ্ছকটিক* প্রকরণের দ্বিতীয় অঙ্ক থেকে এর আখ্যান ভাষ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। জুয়ার আড্ডা থেকে জুয়াড়ি জুয়া খেলে হেরে অর্থ পরিশোধ করতে না পেরে পালায়। তার পিছু নেয় জুয়ার আড্ডার মালিক মাথুর। তাদের পরস্পরের বুদ্ধির যুদ্ধে নির্দেশক তৎকালীন সময়ের অসংগতিপূর্ণ ঘটনার আভাস সংলাপে যুক্ত করে হাস্য রস সৃষ্টি করেছেন। আখ্যান ভাষ্য নিম্নরূপ–

সংবাহক : জুয়ো খেলার সাধ আমার মিটেছে। না খেলেই বা কী করবো। বাঁচতে হলে কিছু অর্থ তো চাই। দরিদ্র মানুষের অর্থ উপার্জনের আর কি কোনো পথ খোলা আছে? জিতলে কথা ছিল না। হেরে বসে আছি যে। অঙ্গরাজ কর্ণের শক্তি অস্ত্রে ঘটোৎকচ যেমন মরেছিল তেমনি শক্তি

ঘটিতে মরেছি আমি। দশ স্বর্ণমুদ্রা হেরেছি। যার সঙ্গে হেরেছি সেই জুয়াড়িটা আর জুয়ার আড্ডার মালিক আমাকে তাড়া করেছে। জুয়ারিটা যখন তার হিসাব মিলাতে গেল তখনই আমি চম্পট দিয়েছি। এখন এই বড় রাস্তায় আমি কার আশ্রয় নিই? ঐতো একটি মন্দির, দেব বিগ্রহটিও নেই। ভালোই হলো, পিছুপা হেঁটে মন্দিরে শূন্য বেদিতে দেববিগ্রহ সেজে দাঁড়িয়ে থাকি। পিছু পা করে হেঁটে গেলে ওরা ভাববে, এখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছি।

মাথুর : পালাবি কোথায়? ওকে ধরবোই। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল, কোথাও লুকোতে পারবে না। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এলেও ওর রক্ষা নেই। আমি মাথুর, জুয়ার আড্ডার মালিক। জুয়ো খেলা কেউ কখনো আমায় ধোঁকা দিতে পারেনি। কি পেরেছে?

জুয়ারি : পেরেছে।

মাথুর : পারেনি। এই এদিকে এসো।

জুয়ারি : কী বুঝলে?

মাথুর : ধূর্তটা পিছুপা হেঁটে মন্দিরে প্রবেশ করেছে।

জুয়ারি : চলোতো গিয়ে দেখি। [ভেতরে প্রবেশের পর]

সংবাহক তো এখানে নেই। তুমি আমি ব্যতীত তৃতীয় কোন প্রাণীও দেখছিনা। শুধু দেখছি একটি দেব বিগ্রহ। তাও আবার কাষ্ঠ মূর্তি।

মাথুর : কী বলছ হে প্রস্তর মূর্তি। মা সরে গিয়েছে।

জুয়ারি : মাকে একটু সোজা করে দেই।

মাথুর : ও বেটা সংবাহককে যখন পাওয়া যাবে না, তখন এস দুদান পাশা খেলেনি।

জুয়ারি : বেশতো ভালো বলেছ। [কড়ি বের করে খেলতে থাকে]

সংবাহক : জুয়ো খেলা দেখলেই আমার গা কেমন জ্বলে। জুয়ো খেলাও যা, মেরু পর্বতের চূড়া থেকে ঝাঁপ দেওয়াও তা। তবে কড়ির আওয়াজ শুনলেই মনটা কেমন যেন করে। না মনকে আর নরম হতে দিচ্ছি না। আহ! কড়ির আওয়াজ যেন কোকিলের স্বর।

জুয়ারি : চালটা আমার ছিল।

মাথুর : আমার চাল।

সংবাহক : এ আমার চাল। এক চাল খেলবো না?

জুয়ারি : মূর্তিমান ধরা দিয়েছে যে।

মাথুর : বের কর আমার দশ স্বর্ণমুদ্রা।

সংবাহক : দেবো বলেছি তো।

মাথুর : এক্ষুণি চাই।

সংবাহক : এখন অর্ধেক দিচ্ছি। বাকি অর্ধেক তুমি মাফ করে দাও।

মাথুর : দিবি তো?

সংবাহক : দেবো।

মাথুর : ঠিক আছে।

সংবাহক : তুমিও শোনো। এখন অর্ধেক দিচ্ছি বাকি অর্ধেক তুমি মাফ করে দাও।

জুয়ারি : ঠিক আছে। যথা লাভ।

সংবাহক : বেশতো! অর্ধেক তুমি মাফ করলে আর বাকি অর্ধেক তুমি। এবার আমি যাই।

মাথুর : বোকা ঠাউরেছো?

জুয়ারি : ব্যাটা বদমাশ। এক্ষুণি মুদ্রা বের কর।

সংবাহক : কোত্থেকে দেবো নেই তো।

মাথুর : তোর বাপকে বেচে দে।
সংবাহক : বাপ নেই তো।
জুয়ারি : মাকে বেচে দে।
সংবাহক : মাও নেই।
মাথুর : তাহলে নিজেকে বেচ ব্যাটা।
সংবাহক : নিজেকে? আচ্ছা ঠিক আছে। আমি নিজেকে বেচে মুদ্রা শোধ করব। আমাকে বড় রাস্তায় নিয়ে চলো। [বাজারে যাওয়ার পর]
এই যে ভাই শুনছেন, মানুষ কিনবেন? মাত্র দশটি স্বর্ণমুদ্রা। কী বলছেন কিনবেন না? কেউ কিনছে না। কেউ কিনছে না, মানুষ হিসেবে কি কোন দাম নেই আমার?
মাথুর : দেখাচ্ছি মজা চল ব্যাটা।

হাস্য রস বিষয়ে *নাট্যশাস্ত্রে* বিবৃত হয়েছে,

> হাস্যের স্থায়ীভাব হাস। এই (হাস্য) বিকৃত বেষ, অলংকার, ধৃষ্টতা, লোভ, কুহক, অসৎ প্রলাপ, বিকলাঙ্গদর্শন, দোষখ্যাপন প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন হয়। ওষ্ঠদংশন, নাসিকা ও গণ্ডস্থলের কম্পন, নেত্রের বিস্তার ও আকুঞ্চন, ঘর্ম, মুখরাগ, পার্শ্বদেশ হস্তস্থাপন প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় প্রযোজ্য। এর ব্যভিচারিভাব আলস্য, অবহিত্থা, তন্দ্রা, নিদ্রা, স্বপ্ন, জাগরণ ও অসূয়া প্রভৃতি। এই (রস) দ্বিবিধ– আত্মগত ও পরগত। যখন কেউ নিজে হাসে তখন আত্মগত। যখন অপরকে হাসানো হয় তখন পরগত।[৩৫]

পরের শ্লোকে উল্লেখ রয়েছে, 'বিপরীত অলংকার, বিকৃত আচার, কথা, বেষ, বিকৃত অঙ্গভঙ্গী হেতু কেউ হাসলে যে রস হয় তা হাস্য নামে কথিত। বিকৃত রূপ, বাক্য অঙ্গভঙ্গী ও বেষের দ্বারা লোককে হাসায় বলে (এই) রস হাস্য নামে জ্ঞাত।'[৩৬] হাস্য রসের দৃশ্যে নির্দেশক যে স্থান-কাল, বেশ-ভূষা ব্যবহার করেছেন তা ছিলো নাট্যশাস্ত্র আশ্রিত। মাথুর, জুয়ারি ও সংবাহক চরিত্রে যারা অভিনয় করেছেন তাদের– আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য ছিলো যথাযথ। মুখের বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রায়ণের মাধ্যমে অভিনেতারা হাস্য রস ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। সংবাহক চরিত্রের রূপদানে– বিকৃত বেষ, ধৃষ্টতা, লোভ, কুহক, অসৎ প্রলাপ, বিকলাঙ্গ আচরণ সবকিছুই 'হাস' ভাব জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছে। বাস্তবতা হলো চরিত্রের অবয়বের বিকৃতি মানুষের চিত্তে হাস্যরস জাগিয়ে তুলতে পেরেছে। এ-প্রসঙ্গে নাট্য সমালোচক বলেন, '[...] অভিনেতাদের শারীরিক নমনীয়তার সাথে রসঘন সংলাপ, দৃশ্যকে হাসির কড়াইয়ে ভেজে মচমচে রাখে।'[৩৭] অভিনেতাদের অভিনয়েও নাট্যশাস্ত্র বর্ণিত– ওষ্ঠদংশন, নাসিকা ও গণ্ডস্থলের কম্পন, নেত্রের বিস্তার ও আকুঞ্চন, ঘর্ম, মুখরাগ, পার্শ্বদেশে হস্তস্থাপন প্রভৃতি অনুভাবের লক্ষণ বর্তমান ছিলো। মোট কথা এই দৃশ্যে, হাস ভাব যথাযথ ভাবে পুষ্ট হয়ে হাস্য রস লাভ করে। সর্বোপরি, হাসির একটা বিশেষ উপযোগিতা আছে এবং এই উপোযোগিতা *রসপুরাণ* নাট্যে অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত হয়েছে।

চ. *রসপুরাণ* প্রযোজনা আখ্যানে ভয়ানক রস

হাস্যরসাত্মক দৃশ্যের পর মঞ্চে রামায়ণ থেকে গৃহীত জনপ্রিয় কাহিনি রাক্ষসরাজ রাবণ কর্তৃক রাম পত্নী সীতা হরণের দৃশ্যটি সংঘটিত হয়। যা *রসপুরাণ* প্রযোজনার ষষ্ঠ দৃশ্য ও 'ভয়ানক রস' রূপে নাট্যে উপস্থাপিত হয়েছে। রামায়ণে রাম সীতার অনুরোধে সোনার হরিণ ধরতে গভীর জঙ্গলে

প্রবেশ করেন। যখন সোনার হরিণ ছদ্মবেশধারী মারীচ রামকে গভীর বনের মধ্যে নিয়ে যায়, তখন সীতার চারপাশে নিরাপত্তার জন্য রেখা একে দিয়ে লক্ষ্মণ রামের খোঁজে বের হয়। রাবণ এই সুযোগে সন্ন্যাসী বেশে সেখানে পৌঁছে কৌশলে সীতাকে লক্ষ্মণ রেখা অতিক্রমণে বাধ্য করেন। সীতা রেখা অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে রাবণ তাকে অপহরণ করেন। প্রযোজনার আখ্যান ভাষ্য নিম্নরূপ–

রাবণ : মাতা..., কিছু অন্ন দান করুন। মাতা... ।

সীতা : প্রণাম ব্রহ্মচারী।

রাবণ : এই পথশ্রমে আমি অনেক ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত। বনের মধ্যে এই কুটির দেখে বড় আশা নিয়ে এসেছি। আমায় কিছু অন্ন দান করো মাতা।

সীতা : নিশ্চয়ই , আপনি কিছুন বিশ্রাম করুন। আমি আপনার জন্যে ভোজন নিয়ে আসছি। আসন গ্রহণ করুন ব্রহ্মচারী। [রাবণ ধ্যানে বসে এবং পরিক্রমণ শেষে অন্ন সংগ্রহ করে সীতা অন্ন নিতে অনুরোধ করে]

রাবণ : ধ্যানরত অবস্থায় আমি উঠে যেতে পারি না। তুমি আমায় এসে দিয়ে যাও।

সীতা : কিন্তু আমি তো এই রেখার বাহিরে যেতে পারবো না।

রাবণ : তুমি আমায় তিরস্কার করেছো দেবী। অতিথি নারায়ণ। আর নারায়ণ অসন্তুষ্ট হলে তা গৃহস্থের জন্যে মঙ্গলকর কিছু হবে না। [রাবণ চলে যেতে উদ্যত হন]

সীতা : যাবেন না ব্রহ্মচারী। অপরাধ মার্জনা করুন। আমি নিজেই আসছি। [অন্ন দান করা হয়]

রাবণ : হে রৌপ্যব্যঞ্জনবর্ণা, তোমাকে পঙ্খিনীর ন্যায় দেখছি। তোমার নেত্র নির্মল ও আয়ত। তারকা কৃষ্ণবর্ণ। উরুদ্বয় হস্তিশূন্ডের ন্যায়। নিতম্ব বিশাল ও স্থূল। তোমার পতিকে ধন্য মনে করি। কে তুমি? কার নারী? কোথায় থেকে এসেছ? এই রাক্ষসবেষ্টিত পঞ্চবটী বনে একাকী কী করছো?

সীতা : আমি রামের পত্নী, সীতা। পিতৃসত্য, পালনের জন্যে তিনি অযোধ্যা ত্যাগ করে এখানে এসেছেন। লক্ষ্মণ তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। তিনিও ব্রহ্মচারী হয়ে জ্যেষ্ঠকে অনুসরণ করেছেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আপনি ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন। আমার স্বামী শীঘ্রই রুরু, বরাহ প্রভৃতি পশু বধ করে আসবেন। আপনার পরিচয় বলুন? এই বনে একাকী বিচরণ করছেন কেন?

রাবণ : আমি মহাপ্রতাপশালী রাক্ষসরাজ রাবণ। দেবাসুর ও মানুষ যক্ষ আমি সেই রাক্ষসরাজ রাবণ। তোমাকে দেখার পর আমার আর নিজ পত্নীদের প্রতি আর কোন অনুরাগ নেই। আমি বহুস্থান থেকে উত্তম পত্নী সংগ্রহ করেছি। তুমি তাদের সকলের উপরে আমার প্রধান মহিষী হও। লঙ্কা নামে আমার মহাপুরী আছে। তা সাগরে বেষ্টিত এবং পর্বতের চূড়ায় অবস্থিত। তুমি সেখানকার কাননে আমার সঙ্গে বিচরণ করবে। আমার পত্নী হলে পাঁচ হাজার সুবেশা দাসী তোমার পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকবে।

সীতা : যিনি মহাগিরির ন্যায় স্থির। মহাসমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর। সেই মহেন্দ্র সদৃশ রামের পতিব্রতা পত্নী আমি। তুমি শৃগাল হয়ে সিংহীকে কামনা করছো? রাক্ষস, তুমি ক্ষুধিত সিংহ ও সর্পের মুখ থেকে দন্ত উৎপাটন করতে চাইছো। সূচী দ্বারা চক্ষু মার্জন ও জিহ্বা দ্বারা ক্ষুর লেহন করতে চাইছ। মক্ষিকা ঘৃত ভোজন করলে ঘৃত জীর্ণ হয় না বরং মক্ষিকাই মরে।

রাবণ : আমি কুবেরের বৈমাত্রের ভ্রাতা। মহাপ্রতাপশালী রাবণ। লোকে আমাকে মৃত্যু তুল্য ভয় পায়। আমি কুবেরের আকাশগামী পুষ্পকরথ সবলে হরণ করেছি। এই তুচ্ছ তপস্বীকে নিয়ে তুমি কী করবে। আমার সঙ্গে লঙ্কায় চল। আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে তোমাকে পস্তাতে হবে।

[রাবণ সীতাকে হরণ করে]

ভয়ানক রস সম্পর্কে ভরত বলেন,

> ভয়ানক রসের স্থায়ীভাব ভয়। তা উদ্ভূত হয় বিকৃতস্বর, সত্ত্ব দর্শন, শেয়াল বা পেঁচার ভয়, উদ্বেগ, শূন্যগৃহ, অরণ্যপ্রবেশ, স্মরণ, আত্মীয়ের বধ, বন্ধন দেখা বা শোনা প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা। তার অভিনয়ে করণীয় হস্ত পদের কম্প, নেত্র ঘূর্ণন, রোমাঞ্চ, মুখের বিবর্ণতা, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা। এর ব্যভিচারী ভাবসমূহ হল অবশ ভাব, ঘর্ম, গদ্‌গদ বাক্য, রোমাঞ্চ, কম্প, স্বরভঙ্গ, বিবর্ণতা, ভয়, মোহ, দীনতা, আবেগ, চপলতা জড়তা, ত্রাস, মূর্ছা, মরণ প্রভৃতি।[৩৮]

ইউটিউব-এ প্রাপ্ত *রসপুরাণ* প্রযোজনার ভিডিও বিশ্লেষণ করলে নাট্যশাস্ত্র বর্ণিত ভয়ানক রসের কারণগুলো লক্ষ করা যায়। যেমন শুরুতেই নির্দেশক আঙ্গিকাভিনয়ের মাধ্যমে দৃশ্যের নাট্যক্রিয়া, বিষয়, স্থান ও চরিত্র স্পষ্ট করেছেন। মঞ্চে লক্ষ্মণ রেখায় আবদ্ধ সীতা এবং সন্ন্যাসী বেশে রাবণ অভিনয়ের মাধ্যমে নাট্যশাস্ত্র বর্ণিত– শরীর, মুখ ও চক্ষুর বিকৃতি, উরুর অবশতা, অবনত মুখের শুষ্কতা, হৃদয়ের স্পন্দন ও রোমাঞ্চ দ্বারা ভয় ভাব প্রকাশ করে নাট্য-মুহূর্তের ভাবমূর্তিকে দর্শকের সামনে ফুটিয়ে তোলেন। ভয়ানক রসের উদ্বোধক কারণগুলোর একটি হলো– অট্টহাস্য, ভূত-প্রেত জাতীয় কিছু দেখা যা নির্দেশক রাবণ চরিত্র চিত্রায়ণে সার্থক ভাবে প্রয়োগ করেছেন। রাবণ যখন সন্ন্যাসী বেশ ত্যাগ করেণ তখন নির্দেশক মঞ্চে একাধিক রাবণ চরিত্রের উন্মোচন করেন এবং চরিত্রের ছায়াগুলোকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাদা ব্যাক ড্রপের ওপরে প্রতিস্থাপন করেন। এর ফলে রাবণ চরিত্রের প্রচলিত মিথ 'দশমুখ' এবং 'কুড়ি-হস্ত' বিষয়টাও পরিষ্কার হয়। পাশাপাশি রাবণ চরিত্র প্রকাশে মুখোশের ব্যবহার করেন এবং চরিত্র অট্টহাস্য করতে থাকেন যা ছিল চমৎকার এবং একই সাথে ভয়ানক। উক্ত দৃশ্যের প্রতিক্রিয়ায় নাট্যজন লিখেছেন, 'রাক্ষসগণ রামের পত্নী সীতাকে অপহরণে যে ভয়ানক দৃশ্যের অবতারণা করে তা ভয়ংকর, রাক্ষসদের মুখ ও মুখোশের ব্যবহার দৃশ্যকে আরও দৃষ্টিগোচর করে তোলে।'[৩৯] নির্দেশক, দৃশ্য উপস্থাপনে আলো-ছায়ার ব্যবহার, রাবণ চরিত্রের বিকৃতস্বর, আবহ সংগীতে শেয়াল বা পেঁচার ধ্বনি এবং অরণ্যের মাধ্যমে ভয় ভাবের পরিবেশ সৃষ্টি করেন। এক্ষেত্রে চরিত্র, স্থান ও পরিবেশকে এমনভাবে নির্দেশক চিত্রিত করেছেন যাতে দর্শক দৃশ্যের মেজাজ বুঝে ভয় ভাবে পুষ্ট হয়ে ভয়ানক রস আস্বাদন করেন।

ছ. *রসপুরাণ* প্রযোজনা আখ্যানে বীর রস

রসপুরাণ প্রযোজনার সপ্তম দৃশ্য 'মেঘনাদ বধ' আখ্যান-আশ্রিত। মঞ্চে দেখা যায় নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যজ্ঞরত মেঘনাদ, সেখানে অন্যায়ভাবে বিভীষণের সাহায্যে লক্ষ্মণ উপস্থিত হয়। বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতায় অন্যায় যুদ্ধে বীর মেঘনাদ প্রাণ হারায় লক্ষ্মণের হাতে। যা নাট্যে 'বীর রস'-এর উপস্থাপন করে। কাহিনি গৃহীত হয়েছে মাইকেল মধুসূদন দত্ত কর্তৃক রচিত *মেঘনাদবধ কাব্য*-এর ষষ্ঠ সর্গ থেকে। তবে মহাকাব্য রামায়ণ হচ্ছে এই বিষয়বস্তুর মূল প্রেরণা। প্রযোজনায় বীর রসের আখ্যান ভাষ্য নিম্নরূপ–

লক্ষ্মণ : মেঘনাদ

মেঘনাদ : অস্ত্রহীন, নিঃসহায়ের জাগতিক্ষাবৃত্তের ওপর তোর এই পরাক্রম? যজ্ঞ ভঙ্গ করেছো, তাই বলে ভেব না, সমর মাঝে বিজয় লাভ হবে লক্ষ্মণ ।

লক্ষ্মণ : বড় বীর হয়ে, যুদ্ধ না করে, মায়াজালে চোখ ধাঁধিয়ে এখানে বসে যজ্ঞ সাধন করছো? তোমার এ শ্রম ব্যর্থ হয়েছে, দিব্যবর ধ্বংস হয়েছে মেঘনাদ।

মেঘনাদ : একে তোমার প্রভাব বলে গৌরব করো না সৌমিত্রি। তোমার এই সাময়িক গৌরব শুধু আমার খুল্ল-তাত বিভীষণেরই বিশ্বাসঘাতকতার ফলাফল।

লক্ষ্মণ : প্রকৃত বীর হলে বাক্যে নয়, অস্ত্র ধারণ করো।

মেঘনাদ : স্বেচ্ছায় মৃত্যুদেবতাকে আহ্বান করছো। অজেয় পরাক্রমশালী বীর মেঘনাদকে জয় করা তোমার মতো বালকের কর্ম নয়। আজই তোমার আমার শেষ যুদ্ধ। [বিভীষণের প্রবেশ]

বিভীষণ : দাঁড়াও ধীমান।

মেঘনাদ : মহাদেবের মতো বীর তোমার ভাই কুম্ভকর্ণ। নিকষা সতী তোমার জননী। সেই তুমি এ কাজ কি করে করলে তাত? একটিবার, শুধু একটিবার দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াও। ছাড়ো দ্বার। যাবো অস্ত্রাগারে।

বিভীষণ : রাঘবের দাস হয়ে তোমায় ছাড়ি কী করে বলো?

মেঘনাদ : এ কী বললে তুমি তাত? তুমি রাঘব দাস? তুমি কে? কোন বংশে জন্মেছ তার সবই কি ভুলে গেছ?

বিভীষণ : মেঘনাদ, বৃথাই বকছো আমায়। ধর্মকে আশ্রয় করার জন্য আমি রঘুকুলপতি রামের আশ্রয় নিয়েছি। অন্যায় তো কিছু করিনি।

লক্ষ্মণ : অস্ত্র ধারণ করো মেঘনাদ।

মেঘনাদ : কাপুরুষের মতো ক্ষত্র ধর্ম ভঙ্গ করে আমায় যুদ্ধে আহ্বান করছো! মনে রেখো, এতে কোনো বীরত্ব নেই। তোমার আমার শেষ যুদ্ধ হোক তবে। [উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং মেঘনাদ নিহত হয়]

নাট্যশাস্ত্র-এর বিবরণ মতে,

> বীর রস হয় উত্তম প্রকৃতির ও উৎসাহমূলক; অসংমোহ, অধ্যবসায়; নয়, বিনয়, বল, পরাক্রম, শক্তি, প্রতাপ ও প্রভাব প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা এই রস উৎপন্ন হয়। এর অভিনয় স্থৈর্য, শৌর্য, ধৈর্য, ত্যাগ, নৈপুণ্যাদি অনুভাবের দ্বারা প্রযোজ্য। এর সঞ্চারী ভাব ধৃতি, মতি, গর্ব, বেগ উগ্রতা, ক্রোধ, স্মৃতি ও রোমাঞ্চ প্রভৃতি।[৪০]

অন্য শ্লোকে পাওয়া যায়, 'উৎসাহ, অধ্যবসায়, বিষাদহীনতা, বিস্ময় ও মোহহীনতা–এই বিবিধ ভাববিশেষ থেকে বীর রস উদ্ভূত হয়।'[৪১] বীর রসের অভিনয় সম্পর্কে নাটশাস্ত্র বলে, 'স্থিতি, ধৈর্য, বীর্য, গর্ব, উৎসাহ, পরাক্রম, প্রভাব ও নিন্দাসূচক বাক্য দ্বারা বীররস সাম্যকরূপে অভিনেয়।'[৪২] নিদের্শক নাটকের এই (বীর রস) দৃশ্যে দর্শকের প্রত্যাশা পূরণের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। মেঘনাদ, লক্ষ্মণ এবং বিভীষণ চরিত্রের অঙ্গসঞ্চালন, দেহের ও চোখ সাজসজ্জা, রঙ ইত্যাদি সব কিছু নাট্যশাস্ত্র বর্ণিত সেই– স্থিতি, ধৈর্য, বীর্য, গর্ব, উৎসাহ, পরাক্রমসহ রনং-দেহী মূর্তিকে প্রকাশ করছে। নির্দেশক এই দৃশ্যে সংলাপের চেয়ে, শারীরিক অবস্থান ও ভাব দ্বারা দৃশ্যকে পরিস্ফুটিত করেছেন। সেহেতু বলা যায় কেবলমাত্র 'উৎসাহভাব' দ্বারা দৃশ্যে চরিত্রের অধ্যবসায়, বিষাদহীনতা, বিস্ময় ও মোহহীনতা ইত্যাদিকে প্রকাশের মধ্যমে নাট্য কাহিনিকে অর্থপূর্ণভাবে এগিয়ে নিয়ে যায়। এবং দর্শক চরিত্রের বিনয়,পরাক্রম, শক্তি, প্রতাপ ও প্রভাব প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা দৃশ্যের মেজাজ বুঝে ভাবে পুষ্ট হয়ে বীর রস আস্বাদন করেন।

জ. *রসপুরাণ* প্রযোজনা আখ্যানে শৃঙ্গার রস

রসপুরাণ প্রযোজনার সর্বশেষ দৃশ্য 'রাধা-কৃষ্ণ' আখ্যান-আশ্রিত। লোকসমাজে প্রচলিত 'রাধা-কৃষ্ণ'র প্রেম সম্পর্কিত লোক গল্প অবলম্বনে বড়ু চণ্ডীদাস রচিত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্য অবলম্বনে এই দৃশ্য। লোকসমাজে প্রচলিত রাধা-কৃষ্ণ কীভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রণয় করতেন, গল্প করতেন; খুনসুটি করতেন একে অপরের সাথে; দুজন দুজনার সাথে সাক্ষাৎ না হলে কীভাবে রাধা তার বাঁশির সুরে মোহিত হতেন; কী প্রকারে একে ওপরের জন্য অপেক্ষা করতেন যমুনার পারে; তাঁদের– সেইসব মনে মনে কথা বলা, চোখে চোখ রাখা এবং অনুভবের কাহিনি নিয়ে নির্দেশক সার্থক ভাবে চিত্রিত করেন শৃঙ্গার রস। মণিপুরী নৃত্য আঙ্গিকে নির্মিত এই দৃশ্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয় আখ্যান দেখানো হয় যেখানে পরমাত্মা ও জীবাত্মার মিলনে জীবনে অপার সুখ-শান্তির ইঙ্গিত করা হয়। মঞ্চে সকল অভিনেতা-অভিনেত্রী রাধা-কৃষ্ণ রূপে যুক্ত হয় এই দৃশ্যে; জন্ম দেয় শৃঙ্গার রসের। বাঁশির সুরে মঞ্চ পরিকল্পনার শূন্যয়াতন বৃন্দাবন কাননে পরিণত হয়। এই বাঁশির সুর শুনে মঞ্চে প্রবেশ করেন শ্রীরাধা। আখ্যান ভাষ্য নিম্নরূপ–

কৃষ্ণ : চন্দ্রাবতী রাধে, দেখো বৃন্দাবন আজি ফুলে ফলে শোভিত হয়েছে। সেখানে ভ্রমরের সুললিত গুঞ্জন শুনে মানুষতো দূরের কথা, দেবতারাও মোহিত হয়ে যায়। এ স্থানে যে অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্যাবলি রয়েছে, তা আমি ছাড়া কেউ জানেনা। অনুমতি করো, তোমাকে সে সব দেখাই। সে স্থানে আমাকে ছাড়া কাউকে সঙ্গে নিও না।

রাধা : তোমাকে সঙ্গী করেই বনে যাবো। কিন্তু, আমার সখীদের সঙ্গ কেমন করে এড়াবো? ওগো কানাই, আমার যতো সখীদের তুমি দেখছ, তাদের কারো মন ভালো নেই। যেন সখীদের এই আকুলতা দূর হয়, তুমি এমন কোনো উপায় স্থির করো।

কৃষ্ণ : ওলো রাধে, তুমিতো আমার মনের কথাই বলেছ। আমি বহু শরীর ধারণ করে গোপীদের মাঝে কেলিবিলাস করবো। তাদের সকলের হৃদয় জয় করে নেবো। তুমি যেনো রুষ্ট হয়ো না।

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে *রসপুরাণ* প্রযোজনায় নির্দেশক নাট্যতত্ত্বের দিকে দৃষ্টি রেখে আখ্যানে শৃঙ্গার রস দৃশ্যটির অবতারণা করেছেন। এই দৃশ্যটি এভাবে না থাকলে গোটা নাটকটাই হয়ে পড়তো– যুদ্ধ বর্ণনা, আস্ফালন, কোলাহল প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। কোন বৈচিত্র্য থাকতো না। সুতরাং নির্দেশক বৈচিত্র্য আনার জন্যও দৃশ্যে শৃঙ্গার রসের অশ্রয়ে রাধা-কৃষ্ণ প্রণয় উপাখ্যান যথাযথ ভাবে ব্যবহার করেছেন। নাট্যশাস্ত্রে শৃঙ্গার রস সম্পর্কে ভরত বলেন,

> [...] শৃঙ্গার রস শৃঙ্গার রতিনামক স্থায়ীভাব থেকে উদ্ভূত ও উজ্জ্বল বেষাত্মক। যথা– পৃথিবীতে যা কিন্তু শুভ্র, পবিত্র, সুদর্শন তা শৃঙ্গারের সঙ্গে উপমিত হয়। যে উজ্জ্বলবেষ পরিহিত সে শৃঙ্গারবান্ বলে অভিহিত হয়। যেমন, লোকের নাম গোত্র, বংশ ও আচার থেকে উৎপন্ন ও প্রামাণ্য ব্যক্তির উপদেশানুসারে হয়, তেমনই নাট্যসংক্রান্ত এই রস ও ভাবসমূহের এবং অন্যান্য বিষয়ের নাম হয় আচার থেকে উৎপন্ন এবং প্রামাণ্য লোকের উপদেশ অনুসারে সিদ্ধ। এইরূপে এই আচারসিদ্ধ হৃদয়গ্রাহী রস উজ্জ্বলবেষাত্মক বলে শৃঙ্গার (নামে অভিহিত)। ঐ (রস) স্ত্রীপুরুষ থেকে উৎপন্ন এবং উত্তম যুবাপুরুষের প্রকৃতিসম্পন্ন।[৪৩]

অন্য শ্লোকে পাওয়া যায়,

> ঐ (রসের) স্থান দুইটি, সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। তার মধ্যে সম্ভোগ (শৃঙ্গার) ঋতু, মালা, অনুলেপন, অলংকার, প্রিয়জনসঙ্গ ও অতিসুন্দর গৃহের উপোভগ, প্রমোদোদ্যানে গমন, অনুভূতি, শ্রবণ, দর্শন, ক্রীড়া, লীলাদি বিভাব

> দ্বারা উৎপন্ন হয়। নেত্রচাতুর্য, ভ্রূবিক্ষেপ, কটাক্ষ সুন্দর গতি, মধুর অঙ্গহার ও বাক্যাদি অনুভাব দ্বারা সেই (রসের) অভিনয় প্রযোজ্য। ব্যভিচারী ভাবগুলি হয় ভয়, আলস্য ও জুগুপ্সাবর্জিত। বিপ্রলম্ভকৃত (শৃঙ্গার) নির্বেদ, গ্লানি, শংকা, অসূয়া, শ্রম, চিন্তা, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, স্বপ্ন, জাগরণ, রোগা, উন্মাদ, অপস্মার, জড়তা, মোহ, মরণাদি অনুভাব দ্বারা অভিনেয়।[৪৪]

নির্দেশক শৃঙ্গার রস-আশ্রিত এই দৃশ্যে সংলাপের চেয়ে, শারীরিক অঙ্গভঙ্গি ও ভাব দ্বারা দৃশ্যকে পরিস্ফুটিত করেছেন। এখানে নাট্য মুহূর্ত সৃষ্টির জন্য নির্দেশক পুরো মিলনায়তনকে বৃন্দাবন তথা প্রমোদোদ্যানে রূপান্তর করেন। ফলে দর্শকদের মধ্যে তাৎক্ষণিক আবেগ এবং আবেগীয় সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এ-প্রসঙ্গে নাট্যজন বলেন,

> [...] রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মনোরম দৃশ্যে নরম রঙিন আলোর জ্যোৎস্নায় চারদিক থেকে ঝুলে পড়া ফুলের লহরি পুরো মিলনায়তনকে বৃন্দাবন করে তুলল, প্রেমে মোহিত দর্শকরা হয়ে উঠল রাসলীলার অংশ। রস থেকে 'রাস' শব্দের উৎপত্তি। 'রাস' হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সর্বোত্তম মধুর রস। এই মধুর রস দিয়েই রসপুরাণের সমাপ্তি ঘটে, বা বলা চলে মধুরেণ সমাপয়েৎ।[৪৫]

শৃঙ্গার রস উদ্ভূত করার লক্ষ্যে নির্দেশক দৃশ্যে– ঋতু, মালা, অলংকার, প্রিয়জনের সঙ্গ, সংগীত ও কাব্যের উপভোগ, প্রমোদোদ্যানে গমন রূপটি সার্থক ভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি অভিনয়াংশ ঠিক করার সাথে সাথে দৃশ্যের– মঞ্চ, আলোক, পোশাক, মেক-আপ ও বাঁশির আবহ সংগীত যুক্ত করে মুহূর্তটিকে আরো তীব্র করে তোলেন। নির্দেশক, রাধা-কৃষ্ণ চরিত্রের অভিনয়ের মাধ্যমে নাট্যশাস্ত্র বর্ণিত– নেত্র বদনের প্রসন্নতা, স্মিতহাস্য, মধুর বাক্য, ধৈর্য প্রমোদ ও মধুর অঙ্গভঙ্গী দ্বারা 'রতি' ভাব প্রকাশ করে নাট্য-মুহূর্তের ভাবমূর্তিকে দর্শকের সামনে ফুটিয়ে তোলেন।

৪

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, নির্দেশক *রসপুরাণ* প্রযোজনার অনেক ক্ষেত্রে শাস্ত্রবচন মানেননি। তিনি 'বীর' বা 'শৃঙ্গার' একটি রসকে অঙ্গী করতে হবে নাটকে এই অনুশাসন প্রত্যাখ্যান করেছেন। এক কথায়, নির্দেশক *রসপুরাণ* নাট্যে অষ্ট রসকেই সমান প্রাধান্য দিয়েছেন। *রসপুরাণ* প্রযোজনায় প্রতিটি দৃশ্যের একটি লক্ষ্য থাকে এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোকে বলা হয় 'ফললাভ'। এই লক্ষ্যের প্রতি ইঙ্গিত দৃশ্যের গোড়ার দিকেই দেওয়া হয়। এটা না দিলে দর্শকের কৌতূহলই জন্মে না। এভাবে স্বল্প কথায় উপস্থাপিত এই ইংগিতটিই ক্রমে বিস্তারিত হয়ে দীর্ঘ কলেবরে অষ্টরসের আটটি দৃশ্যে *রসপুরাণ* নাট্য আকার ধারণ করে। নাট্যজন আসাদুল ইসলাম লিখেছেন, 'পুরো নাটক জুড়ে ভিন্ন ভিন্ন কাহিনির দৃশ্যপট, সবগুলো দৃশ্যকে রসের সুতো দিয়ে গেঁথে একটা মালা বানিয়েছে অভিনেতাদের দল।'[৪৬] নির্দেশক কবির, সত্যিই একধরনের বিকল্প পথের সন্ধান করেছেন। অনুসন্ধান শেষে অষ্ট রসভিত্তিক একটি প্রযোজনা নির্মাণ করে নতুন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যুক্ত করে অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে এক মেলবন্ধন সৃষ্টি করেছেন। যা সংস্কৃত নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক। বর্তমানে বাংলাদেশে সংস্কৃত নাট্যের যে চর্চা রয়েছে তা বহুলাংশেই বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক। এই প্রযোজনার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক নাট্যচর্চায় সংস্কৃত নাট্যের রূপটি প্রকাশিত হলো এবং সমসাময়িক বিশ্বের ভাষ্য হিসেবে *রসপুরাণ* প্রযোজনার ভূমিকাও স্পষ্ট হলো। *রসপুরাণ* নাট্যের নিরীক্ষা দর্শক সাদরে গ্রহণ করেছে যা এই নাট্য রীতির অবদান ও

সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে। নাট্যটি উপভোগ করে অনলাইন পত্রিকা ব্লগে জনৈক সমালোচক লিখেছেন,

> দ্বান্দ্বিক সভ্যতার প্রধান যে লক্ষ্য সেই সুন্দর ও নির্মল জীবনের জন্য অষ্টরসের সমন্বয়ে নির্মিত 'রসপুরাণ' নাটকটি তাই সমকালীন বাংলাদেশের একটি অন্যতম ধ্রুপদী নাটকে রূপ নিয়েছে। নাটকটির চরিত্র নির্মাণ ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে সমকালীন দ্বান্দ্বিক সমাজের চিত্রই শেষ পর্যন্ত দর্শকের কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে [...]।[৪৭]

মেঘচিল নামে একটি অনলাইন পত্রিকায় জনৈক নাট্যজন লিখেছেন,

> [...] নাটক দেখতে এসে শাস্ত্রসম্মত রসের সন্ধান পাওয়া এবং সেই রসে নিমজ্জিত হওয়া, এটি আনন্দে আটখানা হওয়ার মতো একটি ব্যাপার। শৃঙ্গার হাস্য করুণ রৌদ্র বীর ভয়ানক বীভৎস অদ্ভুত, এই সমস্ত নামের সাথে পরিচিত হতে পারাটা কম কথা নয়। নাটকের মধ্য দিয়ে যারা দর্শককে রসসিক্ত ও রসশিক্ষিত করল, তাদের রসবোধ অপরিমেয়। তারা আমাদের নিরস নিরাসক্ত জীবনে রসের আধার, তাদের জীবন রসে টইটম্বুর হোক এই প্রত্যাশা রইল।[৪৮]

বর্তমান বিশ্ববাস্তবতায় সংস্কৃত নাট্যের ভাষ্যসমূহ কীভাবে প্রাসঙ্গিক হতে পারে সে সম্পর্কে উত্তর মেলে দর্শক নাট্যজন আসাদুল ইসলাম-এর প্রতিক্রিয়াতে। তিনি বলেন, '*রসপুরাণ* নাটকে রসের ভেতরে বিরস বিষয়ের পরোক্ষ উপাদান, রসকে রাজনৈতিক রসায়নে জারিত করেছে শুধু, রসের ঘাটতি ঘটায়নি কিছু।'[৪৯] এ-প্রসঙ্গে সমালোচক রেজা ঘটক আরো বলেন,

> [...] নাটকটি শেষ পর্যন্ত দর্শকের কাছে যেন এক প্রবহমান মহাকালের দ্বান্দ্বিক ঘটনাপ্রবাহের অন্তরালে এক চিরসবুজ অফুরান জীবনের প্রতীক হয়ে ওঠে। যেখানে ভলোবাসা কখনো ফুরায় না। দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মৃত্যু-ক্ষুধা, ভয়-আতংক, বীরত্ব-আনন্দ, ক্রোধ-শোক শেষে যেখানে মানুষ খুঁজে পায় কেবল অফুরান ভলোবাসা আর সুন্দর ও নির্মল এক জীবন। যে জীবনের লক্ষ্যেই পৃথিবীতে মহাকাল ধরেই এই দ্বান্দ্বিকতা।[৫০]

পরিশেষে, উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রযোজনাটি নাট্যশাস্ত্র মতে অষ্টবিধ নাট্যরস ও ভাব-ব্যঞ্জক অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। নানা প্রকার রস ও ভাবের উদ্রেকে সমর্থ এমন অভিনয়ের সুযোগও বর্তমান প্রযোজনায় রয়েছে। আটটি রসের সবগুলো যে থাকতেই হবে এমন কোনো কঠোর বিধান নাট্যশাস্ত্রে নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে নির্দেশক নিরীক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশে সংস্কৃত নাট্য চর্চার সম্ভাবনাকেও তিনি জাগ্রত করেছেন। ফলে এই প্রযোজনা আগামীর বাংলাদেশের সংস্কৃত নাট্যচর্চার পথকে আরো মসৃণ করবে বলে আশা রাখা যায়। অবশেষে বলা যায় *রসপুরাণ* প্রযোজনায় অষ্ট ভাব পুষ্ট হয়ে দর্শক রসতা লাভ করে।

তথ্যনির্দেশ

১ মলয় বিকাশ দেবনাথ, "অষ্টরসের রসপুরাণ", *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা: ২৫ এপ্রিল ২০১৯, পৃ. ১০

২ আহমেদুল কবির, *গবেষণার প্রয়োজনে গৃহীত সাক্ষাৎকার*, ঢাকা: ৩ জুলাই ২০২৪, পৃ. অনুল্লেখিত

৩ আহমেদুল কবির, "রামায়ণ, মহাভারত ও ধ্রুপদী বিভিন্ন নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যের সংশ্লেষ 'রসপুরাণ' ক্রুশিয়ার", *থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ*, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, ঢাকা: ২৫ এপ্রিল ২০১৯, পৃ. অনুল্লেখিত

৪ আহমেদুল কবির, প্রাগুক্ত, পৃ. অনুল্লেখিত

[৫] দুলাল ভৌমিক, *সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. ২০

[৬] দুলাল ভৌমিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

[৭] আহমেদুল কবির, *গবেষণার প্রয়োজনে গৃহীত সাক্ষাৎকার*, ঢাকা: ৪ জুলাই ২০২৪, পৃ. অনুল্লেখিত

[৮] আহমেদুল কবির, "রামায়ণ, মহাভারত ও ধ্রুপদী বিভিন্ন নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যের সংশ্লেষ 'রসপুরাণ' ব্রুশিয়ার", *থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ*, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, ঢাকা: ২৫ এপ্রিল ২০১৯, পৃ. অনুল্লেখিত

[৯] তানভীর আহম্মেদ, *গবেষণার প্রয়োজনে গৃহীত সাক্ষাৎকার*, ঢাকা: ২ জুলাই ২০২৪, পৃ. অনুল্লেখিত

[১০] আহমেদুল কবির, *গবেষণার প্রয়োজনে গৃহীত সাক্ষাৎকার*, ঢাকা: ৪ জুলাই ২০২৪, পৃ. অনুল্লেখিত

[১১] আহমেদুল কবির, "রামায়ণ, মহাভারত ও ধ্রুপদী বিভিন্ন নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যের সংশ্লেষ 'রসপুরাণ' ব্রুশিয়ার", *থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ*, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, ঢাকা: ২৫ এপ্রিল ২০১৯, পৃ. অনুল্লেখিত

[১২] রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, *রসসমীক্ষা*, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০১, পৃ. ৪৩

[১৩] ভরত, *ভরত নাট্যশাস্ত্র*, খণ্ড ১, [সম্পা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়], কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৯৭, পৃ. ১৩৭

[১৪] ভরত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

[১৫] শ্রীরামচরণ তর্কবাগীশ, *সাহিত্যদর্পণঃ*, [সম্পা. শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়], কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, মাঘ ১৩৮৬, পৃ. ৬৮

[১৬] ভরত, *ভরত নাট্যশাস্ত্র*, খণ্ড ১, [সম্পা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়], কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৯৭, পৃ. ১৩৩

[১৭] ভরত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

[১৮] ভরত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

[১৯] ভরত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

[২০] আহমেদুল কবির, *গবেষণার প্রয়োজনে গৃহীত সাক্ষাৎকার*, ঢাকা: ৪ জুলাই ২০২৪, পৃ. অনুল্লেখিত

[২১] শাহমান মৈশান, "রামায়ণ, মহাভারত ও ধ্রুপদী বিভিন্ন নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যের সংশ্লেষ 'রসপুরাণ' ব্রুশিয়ার", *থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ*, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, ঢাকা: ২৫ এপ্রিল ২০১৯, পৃ. অনুল্লেখিত

[২২] ভরত, *ভরত নাট্যশাস্ত্র*, খণ্ড ১, [সম্পা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়], কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৯৭, পৃ. ১৪৬

[২৩] ভরত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

[২৪] আসাদুল ইসলাম, *রসপুরাণ : শাস্ত্রীয় সুধায় মধুরেণ সমাপয়েৎ* (ঢাকা: মেঘচিল, ৫ মে ২০১৯), পৃ. অনুল্লেখিত

[২৫] ভরত, *ভরত নাট্যশাস্ত্র*, খণ্ড ১, [সম্পা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়], কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৯৭, পৃ. ১৫০

[২৬] ভরত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

[২৭] ভরত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

[২৮] ভরত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

[২৯] ভরত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

[৩০] আসাদুল ইসলাম, *রসপুরাণ : শাস্ত্রীয় সুধায় মধুরেণ সমাপয়েৎ*, ঢাকা: মেঘচিল, ৫ মে ২০১৯, পৃ. অনুল্লেখিত

[৩১] ভরত, *ভরত নাট্যশাস্ত্র*, খণ্ড ১, [সম্পা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়], কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৯৭, পৃ. ১৪৮

[৩২] ভরত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

[৩৩] ভরত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

[৩৪] আহমেদুল কবির, "কার্টুনে হাস্যরস : অন্তর্দৃষ্টি", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা* [সম্পা. এস এম মাহফুজুর রহমান], ঢাকা: ডিসেম্বর ২০২২, পৃ.২৪৪

[৩৫] ভরত, *ভরত নাট্যশাস্ত্র*, খণ্ড ১, [সম্পা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়], কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৯৭, পৃ. ১৪৩

৩৬ ভরত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

৩৭ আসাদুল ইসলাম, *রসপুরাণ : শাস্ত্রীয় সুধায় মধুরেণ সমাপয়েৎ*, ঢাকা: মেঘচিল, ৫ মে ২০১৯, পৃ. অনুল্লেখিত

৩৮ ভরত, *ভরত নাট্যশাস্ত্র*, খণ্ড ১, [সম্পা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়], কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৯৭, পৃ. ১৪৯

৩৯ আসাদুল ইসলাম, *রসপুরাণ : শাস্ত্রীয় সুধায় মধুরেণ সমাপয়েৎ*, ঢাকা: মেঘচিল, ৫ মে ২০১৯, পৃ. অনুল্লেখিত

৪০ ভরত, *ভরত নাট্যশাস্ত্র*, খণ্ড ১, [সম্পা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়], কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৯৭, পৃ. ১৪৮

৪১ ভরত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

৪২ ভরত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

৪৩ ভরত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

৪৪ ভরত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

৪৫ আসাদুল ইসলাম, *রসপুরাণ : শাস্ত্রীয় সুধায় মধুরেণ সমাপয়েৎ*, ঢাকা: মেঘচিল, ৫ মে ২০১৯, পৃ. অনুল্লেখিত

৪৬ আসাদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. অনুল্লেখিত

৪৭ রেজা ঘটক, *অষ্টরসের সমাহার 'রসপুরাণ'*, ঢাকা: বাঁধ ভাঙার আওয়াজ, ২ মে ২০১৯, পৃ. অনুল্লেখিত

৪৮ আসাদুল ইসলাম, *রসপুরাণ : শাস্ত্রীয় সুধায় মধুরেণ সমাপয়েৎ*, ঢাকা: মেঘচিল, ৫ মে ২০১৯, পৃ. অনুল্লেখিত

৪৯ আসাদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. অনুল্লেখিত

৫০ রেজা ঘটক, *অষ্টরসের সমাহার 'রসপুরাণ'*, ঢাকা: বাঁধ ভাঙার আওয়াজ, ২ মে ২০১৯, পৃ. অনুল্লেখিত

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বিয়াল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩১/ডিসেম্বর ২০২৪

গ্রন্থ-পর্যালোচনা

মুহম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক, *নিদ্রিত শিলার মুখরিত লিপি : বাংলায় আরবী-ফার্সী লেখমালা (১২০৫- ১৪৮৮)*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২১
পৃষ্ঠা ৬৫২, মূল্য: ১,৫০০ টাকা

মুহাম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক রচিত আলোচ্য গ্রন্থখানি সম্প্রতি প্রকাশিত শিলালিপিভিত্তিক একখানি অতি মুল্যবান গ্রন্থ। বিজ্ঞ গবেষকের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে কঠিন শিলা বা প্রস্তরের ওপর রচিত শিলালিপি। মধ্যযুগের আরবি-ফারসি শিলালিপিগুলি বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অমূল্য সম্পদ। শিলা বা পাথরের মসৃণতল খোদাই করে অভীষ্ট বাণী লিপিবদ্ধ করা হয়, যা শিলালিপি নামে অভিহিত হয়ে থাকে। মধ্যযুগে কাগজের প্রচলন শুরু হলেও তা ছিল অতিব দুর্লভ ও ব্যয়বহুল; উপরন্তু তা সহজপাচ্য ও ক্ষয়িষ্ণু ছিল। এজন্য সে যুগের রাজা-বাদশাহ তাঁদের কীর্তিকলাপ সংরক্ষণে টেকসই মাধ্যম হিসেবে শিলালিপি প্রযুক্তি বেছে নিয়েছিলেন। সংগত কারণেই শিলালিপির ভাষণ হতো সংক্ষিপ্ত। মুসলিম শাসনামলে (১২০৪-১৭৫৭) বাংলায় এযাবৎ এরূপ চার শতাধিক শিলালিপির সন্ধান পাওয়া গেছে। দেশ-বিদেশের পণ্ডিতগণ বিভিন্ন সময়ে এসব শিলালিপি সংগ্রহ, পাঠোদ্ধার ও আলোচনা-গবেষণা করে বাংলার ইতিহাস নির্মাণে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন। এগুলির অধিকাংশই আরবি ও ফারসি ভাষায় লিপিকৃত; অনেক শিলালিপিতে আরবি-ফারসি ভাষার মিশ্রণও রয়েছে। দু' একটি বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার শিলালিপিও পাওয়া গেছে।

শিলালিপিগুলি প্রণীত হয়েছে মূলত বিভিন্ন স্থাপনানির্মাণ উপলক্ষ্যে। এগুলি হলো মসজিদ, মাদ্রাসা, দুর্গ, রাজপ্রসাদ, তোরণ বা নগরের প্রবেশদ্বার, ফটক বা দুর্গের প্রবেশদ্বার, রাজপ্রাসাদের প্রবেশদ্বার, মিনার বা স্মৃতিস্তম্ভ, সমাধিভবন, সমাধিবেদী, খানকাহ, মাজার বা পীরের দরগাহ, ঈদগাহ, ইমামবাড়া, সিকায়াহ্ বা জলসত্র, দিঘি, পুল, রাস্তা ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে মসজিদ-মাদ্রাসার সংখ্যা সর্বাধিক; এরপরে আছে সুফি পির-দরবেশদের খানকাহ, দরগাহ, ও সমাধিগৃহ। ব্যয়বহুল এসব স্থাপনা নির্মাণের ও শিলালিপি মুদ্রণের কাজে মুখ্যত শাসকশ্রেণি ও ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ জড়িত ছিলেন। শিলালিপির বাণীতে নির্মাতা ও পৃষ্ঠপোষক রূপে তাঁদেরই নাম-ধাম-কাল পাওয়া যায়।

সাড়ে পাঁচশো বছর ধরে এদেশে এরূপ মূল্যবান স্থাপনা, শিলালিপি, মুদ্রা ইত্যাদি নির্মিত হলেও সেযুগের পণ্ডিতগণের এগুলির ঐতিহাসিক তাৎপর্য উপলব্ধি ও মূল্যায়ন করার জ্ঞান ও মানসিকতা ছিল না, যার ফলে সমকালের ও পরবর্তীকালের অনেককিছু ধ্বংস হতে বসেছিল। প্রথমে দেশীয় পণ্ডিত গোলাম হুসেন সলিম যোধপুরী ও তাঁর শিষ্য সৈয়দ ইলাহি বকশ গৌড়-পান্ডুয়ার শিলালিপির

প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রথমজন রিয়াজ-উস-সালাতিন' (১৭৮৮) এবং দ্বিতীয়জন 'খুরশিদ-ই-জাহাননামা' নামক ইতিহাসগ্রন্থে তাঁদের সংগৃহীত শিলালিপির উপাদান ব্যবহার করেন। ইলাহি বকশ তাঁর রচনায় পূর্বের এবং নিজের সংগৃহীত মোট ৪২টি শিলালিপির উপাদান ব্যবহার করেন। (পৃ. ৭৯)। ইংরেজ শাসনামলে প্রাচ্যবিদ্যানুরাগী কতিপয় আমলা উদ্যোগী হয়ে এসব ঐতিহাসিক নিদর্শন অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে প্রথম লোকচক্ষুর সামনে নিয়ে আসেন। এক্ষেত্রে ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিল্টন, এইচ ব্লকম্যান, উইলিয়াম ফ্র্যাঙ্কলিন, হেনরি ক্রেইটন, হেনরি বেভারিজ প্রমুখের নাম করা যায়। তারপর দেশীয় পণ্ডিতগণ এগিয়ে আসেন; বিশ শতকে তাঁরা শিলালিপি বিষয়ক কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো আবিদ আলি খানের *Memoirs of Gour Pandua* (১৯৩১), শামসউদ্দিন আহমদের *Inscriptions of Bengal* (১৯৩৩-৩৪), আহমদ হাসান দানির *Bibliography of Muslim Inscriptions,* আবদুল করিমের *Corpus of Arabic-Persian Inscriptions* (১৯৯২) ইত্যাদি। এরূপ গবেষণার ও গ্রন্থরচনার ধারা থেমে যায়নি। একুশ শতকের গোড়ার দিকে মহম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক লিখেছেন *Arabic and Persian Inscriptions of Bengal* (২০১৭) গ্রন্থ; এতে সর্বাধিক সংখ্যক ৪২৫টি শিলালিপির বিবরণ রয়েছে, যা অন্য সকল গ্রন্থের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। আরবি-ফারসি শিলালিপি নিয়ে দেশি ও বিদেশি পণ্ডিত দ্বারা এযাবৎ যা কিছু রচিত হয়েছে, তার সবই ফারসি ও ইংরেজি ভাষায়; বাংলা ভাষায় অনুরূপ কোন গ্রন্থ প্রণীত হয়নি। মহম্মদ ইউসুফ সিদ্দিকই প্রথম 'নিদ্রিত শিলার মুখরিত লিপি' (২০২১) গ্রন্থ প্রণয়ন করে দীর্ঘ দুশো বছরের এরূপ শূন্যতা দূর করেন। এরজন্য তিনি মাতৃভাষাপ্রেমিক সকলের কাছে ধন্যবাদের পাত্র।

আরবি-ফারসি শিলালিপি সংক্রান্ত বৃহৎ আকারের এই গ্রন্থের 'নিদ্রিত শিলার মুখরিত লিপি' নামকরণটি প্রথমেই পাঠকের নজর কাড়ে। কঠিন শিলা বা পাথর নিদ্রিত, নিস্তব্ধ; কিন্তু তার গায়ে খোদাইকৃত লিপিগুলি মুখর বা সরব। রোমান্টিক শিরোনামের এই গ্রন্থে কী আছে? আরবি-ফারসি বিভাষা, তার ওপর আরবি হরফের অলংকৃত লিখনশৈলী দেশীয় পাঠকের কাছে কঠিন শিলার মতই দুর্বোধ্য ও রহস্যময় ছিল। কিন্তু লেখকের ভাষার সৌকর্যে এবং স্বচ্ছ বর্ণনার গুণে তা অনেকটাই সরস ও উপাদেয় হয়ে উঠেছে।

শিলালিপির বহুমাত্রিক দিক রয়েছে। প্রথমত সংশ্লিষ্ট স্থাপনার শোভাবর্ধন ও দৃষ্টিনন্দন রূপদান এর একটি বিশিষ্ট দিক। এর গঠনপ্রকৃতি ও লিখনশৈলী দর্শনসুখকর। দ্বিতীয়ত শিলালিপিতে উৎকীর্ণ বা খোদাইকৃত বাণী, যার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। স্থাপনার প্রকৃতি অনুযায়ী শিলালিপির এরূপ বাণীতে নানাবিধ তথ্য রয়েছে, যেমন স্থাপনার নাম, নির্মাতার নাম, সমকালের শাসনকর্তার অথবা পৃষ্ঠপোষকের নাম-ধাম, শাসকের বর্ণাঢ্য পদবি, উপাধি স্থাপনা ও স্তুতিবচন, কোরান-হাদিসের সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতি, স্থাপনা বা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি অনুযায়ী রাজনৈতিক, ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক,

শৈক্ষিক, দান-অনুদান প্রভৃতির বার্তা, নির্মাণস্থান, নির্মাণকাল ইত্যাদি। সংখ্যায় কম হলেও বাণীপ্রণেতা ও লিপিকরের নামও পাওয়া যায়। তথ্যপ্রযুক্তির শূন্যতার যুগে এসব উপাদানের মূল্য ছিল অসীম ও অতুলনীয়। বস্তুত মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস রচনায় শিলালিপিগুলি অন্যতম উৎস্যরূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

শিলালিপি একটি যৌথশিল্পকর্ম। একটি পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শ শিলালিপি নির্মাণে একাধিক ব্যক্তির ভূমিকা থাকে। এর নির্মাণ প্রক্রিয়া ও বিভিন্ন ব্যক্তির ভূমিকা সম্পর্কে লেখক বলেন, "কোনও সুলতান একবার কোন শিলালিপি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলে প্রথম কাজ ছিল পংক্তি ক'টি রচনা করা। এ কাজে তখনকার মক্তব বা মাদ্রাসার অধ্যাপকদের মধ্যে কবিপ্রতিভা আছে এমন কাউকে নিয়োগ করা হত। তাঁদের রচনা সুলতানের মনোমত হলে তা যেত একজন চারুলিপিকর অর্থাৎ ক্যালিওগ্রাফারের কাছে। চারুলিপিকর (আরবি) অক্ষরকে শৈল্পিক রূপ দিতেন। সে রূপ ফুটত সে যুগের তুলট কাগজের ওপর। এরপর ফলকের গায়ে কাঠকয়লা দিয়ে সেই কাগজে আঁকা ছাঁদ ফুটিয়ে তোলা হত পাথরে, এবং শেষে দক্ষ খোদাইকর তা খোদাই করতেন। অক্ষরকে কি মুনশিয়ানায় এক-একটা থিমের আওতায় আনতেন সেই শিল্পী। বোঝাই যায়, প্রতিভাবান লিপিকরদের মর্যাদা ছিল সুউচ্চ, তাঁদের কেউ কেউ খ্যাত ছিলেন যারিন দাস্ত বা স্বর্ণহস্ত নামে।" [পৃ. ১৫]। নির্মাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছাড়াও বাণীরচয়িতা, লিপিকর ও খোদাইশিল্পী রয়েছেন। এর অতিরিক্ত পাথর-কাটা কারিগরও নিয়োগ করা হতো। তার কাজ ছিল পাথর ঘসামাজা করে সমতল ও মসৃণ করা এবং পাথর কেটে লেখাগুলি উঁচু বুটিদার রূপে ফুটিয়ে তোলা। [ঐ, পৃ. ৬৫]।

এখন গ্রন্থের সূচিপত্রের দিকে নজর দেওয়া যাক। গ্রন্থে মোট ৮টি অধ্যায়ে মূলবিষয় আলোচিত হয়েছে: অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রারম্ভে আছে প্রতীকচিহ্ন, বর্ণান্তর নীতি, শব্দ সংক্ষেপ, পটভূমি, মুখবন্ধ, প্রাক্‌কথন, বই সম্পর্কে কিছু কথা, ইসলামী শিল্পকলা ও বঙ্গীয় সংস্কৃতি, আর অন্তভাগে আছে পরিশিষ্ট, গ্রন্থপঞ্জী, নির্ঘন্ট ও মানচিত্র। মূল বিষয়বস্তুর মুখ্য দু'টি অংশ- প্রথমাংশের ৬টি অধ্যায়ে (পৃ. ৪১-২৫৬) আছে শিলালিপি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য, তত্ত্ব, বৈচিত্র, বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাস সম্পর্কিত বিশ্লেষণমূলক আলোচনা এবং দ্বিতীয়াংশে দুটি অধ্যায়ে (পৃ. ২৫৭-৫৫৫) আছে সংকলিত শিলালিপির মূল টেক্সটসহ কন্টেক্সট ও টেক্সচারের বর্ণনামূলক আলোচনা। উল্লেখ থাকে যে, গ্রন্থে ১২০৫ থেকে ১৪৮৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ বখতিয়ার খলজি থেকে ইলিয়াস শাহী রাজবংশের শাসনামল পর্যন্ত প্রাপ্ত ১০৬টি শিলালিপি সংকলিত ও আলোচিত হয়েছে।

প্রথমাংশের ৬টি অধ্যায় লেখকের মৌলিক গবেষণার ফল। এখানে তিনি দেশের ও বিদেশের শিলালিপি সংক্রান্ত বহু বিষয়ের অবতারণা ও তুলনামূলক আলোচনা করেছেন; বিশেষ করে দেশের শিলালিপি সম্বন্ধে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর আলোচনার মধ্যে যে দুটি মুখ্যবিষয় গুরুত্ব পেয়েছে, তা হলো আরবিলিপিবিদ্যা ও চারুলিপিশৈলী বা চিত্রকলা।

হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি হোক, ঢালাইকৃত তাম্রলিপি অথবা খোদাইকৃত হোক, প্রাচীনকালের কোনো ভাষায় রচিত কোনো লেখার পাঠোদ্ধার একটা বৈজ্ঞানিক বিদ্যা বলে পরিগণিত হয়। মধ্যযুগের হস্তলিখিত বাংলা পাণ্ডুলিপিগুলি এযুগের পণ্ডিতের কাছেও গ্রিক ভাষা বলে প্রতিভাত হয়, তার প্রধান কারণ বাংলা হরফের লিখনপদ্ধতি ছিল বিভিন্ন প্রকৃতির। প্রাচীন ও মধ্যযুগের আরবি-ফারসি শিলালিপির ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। আরবি ও ফারসি দুটি ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভাষা হলেও উভয় ভাষার হরফ বা লিপি অভিন্ন। প্রাচীন পুস্তকাদিতে যে লিপি ব্যবহার করা হয়, শিলালিপিতে ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায়শই বিশেষ বিশেষ লিখনপদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। এরূপ লিখনরীতির ভিন্ন ভিন্ন নামও পাওয়া যায়, যেমন না, সুলস্, কুফি, তুঘরা ইত্যাদি। লেখকের বিবরণ অনুযায়ী নাস্খ হলো 'নমনীয়তা বিশিষ্ট জড়িয়ে লেখা পদ্ধতি', সুল্স হলো বাঁকা টান দিয়ে লেখার ধরন, কুফি জ্যামিতিক আকৃতির সোজাসুজি ও খাড়াখাড়ি কৌণিক লেখার পদ্ধতি এবং তুঘরা সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উল্লম্বভাবে মোটা হরফ। [পৃ. ৪৮-৪৯] লেখকের মতে, উক্ত চারটি প্রধান পদ্ধতি ছাড়াও বাংলায় এযাবৎ প্রাপ্ত শিলালিপির অন্যান্য লিখনরীতি বা ধরন হলো রিকা, রুক'আ, তাওকী, রায়হানী, মুহাক্কাক্, বিহারি, ইজাযাহ ইত্যাদি। [পৃ. ১৭১] তিনি 'বাংলার স্থাপত্যে আরবী-ফার্সী চারুলিপির বৈচিত্র্য' শিরোনামে পঞ্চম অধ্যায়ে মূল শিলালিপি, বর্ণ ও বর্ণগুচ্ছের চিত্রের উল্লেখসহ এসব লিখনপদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। ১৩৭৪ সালে নির্মিত পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদের কেন্দ্রীয় মিহরাবের ওপর স্থাপিত শিলালিপিতে কুফি ও সুল্স উভয় লিপির মিশ্রণ রয়েছে। লেখক বলেন, "এই শিলালিপিতে যুগপৎ দুই প্রকার লিখনরীতি ব্যবহৃত হয়েছে। মোটা অক্ষরে লিখিত সুল্স রীতির লেখাগুলো পুরো প্যানেলের প্রেক্ষাপট জুড়ে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। সুল্স লেখার দণ্ডায়মান খাড়া রেখাগুলোর উপরের প্রান্তে ক্ষুদ্রাকৃতি সরল ছাঁদের কূফীঢঙে লিখিত একটি লাইন শিলালিপির সৌন্দর্যকে দারুণভাবে বৃদ্ধি করেছে।" [পৃ. ১৭২] উল্লেখ্য যে, মক্কার পবিত্র কাবার কালো কাপড়ের আচ্ছাদনে (কিওয়া) কোরানের আয়াত বুনন-প্রক্রিয়ায় সুল্স রীতি অনুসৃত হয়েছে। [পৃ. ৪৮] ১২২১ সালে বীরভূমের সিয়ানে প্রাপ্ত বাংলার প্রথম শিলালিপিতে কিছুটা রিকা রীতির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। তবে এদেশে তুলনামূলকভাবে নাস্খ ও তুঘরা পদ্ধতির লিপিশৈলী অধিক জনপ্রিয় ছিল। গ্রন্থের এই অধ্যায়টি সম্পূর্ণ অভিনব ও অতীব মূল্যবান।

'বাংলার শিলালিপিতে উৎকীর্ণ উপাধি ও পদবির বৈচিত্র্য' শিরোনামে ষষ্ঠ অধ্যায়টিও সম্পূর্ণ অভিনব, তথ্যসমৃদ্ধ ও জ্ঞানগর্ভ। লেখক আরবি-ফারসি ভাষায় বর্ণিত সর্বমোট ২৫২টি এরূপ উপাধি-পদবির উল্লেখসহ সেগুলির অর্থ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। শিলালিপির নির্মাণ কাজে যাঁরা জড়িত ছিলেন, প্রধানত তাঁদেরই 'ইসম' বা মূলনামের নসব বা বংশগত উপাধি, বিবিধ 'লকব' বা উপাধি ও পদবি সংযুক্ত হয়েছে। পদবি দু' প্রকার- বংশগত, যেমন খলজি, সূর, কররানি এবং নিসবা বা স্থানবাচক পদবি, যেমন তাব্রিজি, কিরমানি জুনিয়াঈ ইত্যাদি। অধিকাংশ শিলালিপিতে রাজপুরুষ ও ধার্মিক ব্যক্তির নামের সাথে এরূপ উপাধি ও পদবি ব্যবহৃত হয়েছে। রাজপুরুষ বলতে প্রধান

শাসক ও তাঁর সহযোগীশ্রেণি এবং ধার্মিক ব্যক্তি বলতে ইসলামি শাস্ত্রজ্ঞানী ও সুফি পির-দরবেশদের বোঝায়। ধার্মিক ব্যক্তির নামের আগে শায়খ, শাহ, মৌলানা, মখদুম এবং নামের পরে বংশগত ও জন্মস্থানগত পদবি সংগ্রথিত হয়েছে। বাংলার স্থাপনা ও শিলালিপি নির্মাণে তাঁদের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে। বলা বাহুল্য, সুলতান বা প্রধান শাসক দীর্ঘ ও বর্ণাঢ্য উপাধি ধারণ করতেন অন্যাদের উপাধি সংক্ষিপ্ত হতো। গ্রন্থকার উপাধি ও পদবির প্রকারভেদ সম্বন্ধে বলেন, "লকব বা উপাধির শ্রেণীবিভাগ করা হত পেশা, পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও ক্ষমতার ভিত্তিতে। মুসলিম উপাধিসমূহকে শিথিলভাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে, যেমনঃ ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, রাজকীয়, পার্থিব, দাপ্তরিক, আনুষ্ঠানিক, প্রশাসনিক, পেশাগত, সামরিক, অবৈতনিক, সম্মানসূচক প্রভৃতি।" [পৃ. ২০৫]

'সুলতান' রাজকীয় উপাধি; বাংলার স্বাধীন সুলতানদের নিকট এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। দিল্লির শাসকগণও একই উপাধি গ্রহণ করতেন। এজন্য এটি অধিক লোভনীয় উপাধি ছিল। আরবি সুলাতা শাব্দজাত সুলতান-এর আক্ষরিক অর্থ ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, অধিকার ইত্যাদি। বিবিধ গুণ ও গৌরববাচক উপাধি ধারণ করে তাঁরা প্রজার কাছে নিজেদের ক্ষমতা ও মর্যাদা জাহির করতেন। ধার্মিক পুরুষদের ক্ষেত্রে শায়খ (অর্থ- গুরু) উপাধির অধিক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। আরবি মখদুম শব্দের অর্থ শিক্ষক, সম্মানিত ব্যক্তি। শায়খ আলাউল হক ও তাঁর উত্তরসূরিরা এই উপাধিতে ভূষিত হন। ১৫৭২ সালে প্রাপ্ত শিলালিপিতে মখদুম শায়খ নূর কুতব-ই-আলমের গুণবাচক ৮ প্রকার উপাধি উৎকীর্ণ হয়েছে, যেমন- 'সুলতান আল-আরিফিন' (সাধকদের অধিপতি), "কুতব আল আকতাব" (স্তম্ভসমূহের মুখ্যস্তম্ভ), 'কাতিল-ই-ওয়াহাব' (সর্বদাতা আল্লাহর প্রেমে উৎসর্গীকৃত), হজরত-ই-আলম (জগতে সম্মানিত ব্যক্তি নূর-অল-হক ওয়াল শরা ওয়াল দীন) (সত্য, শাস্ত্র ও ধর্মের জ্যোতি) ইত্যাদি। এরূপ জানা-অজানা বিবিধ ও বিচিত্র উপাধি ও পদবির সন্ধান পাওয়া যায় এই অধ্যায়ে। নিঃসন্দেহে এটি অতি উৎকৃষ্ট ও আকর্ষণীয় অধ্যায়।

আমরা বলেছি যে, লেখক ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে ১২০৫-১৪৮৮ সাল পর্যন্ত ১০৮টি শিলালিপির টেক্সট (মূলপাঠ)-সহ (প্রসঙ্গ) ও টেক্সচার বা মূলপাঠভুক্ত যাবতীয় তথ্য সুচারুরূপে আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন। শিলালিপির শুদ্ধ পাঠোদ্ধার একটি দুরূহ কাজ। আরবি-ফারসি ভাষাজ্ঞান ও লিপিবিদ্যা উভয় বিষয়ে পারদর্শী না হলে সম্ভব নয়। তিনি প্রতিটি শিলালিপির অনুবাদসহ আদি প্রাপ্তিস্থান বর্তমান অবস্থান উপকরণ ও পরিমাপ, লিখনরীতি ও সারিসংখ্যা, রাজত্বকাল, ভাষা ও ছন্দ, ধরন, প্রকাশনা, আলোচনা ইত্যাদি উপশিরোনামে জ্ঞাতব্য বিবিধ তথ্য পরিবেশন করেছেন। তাঁর আলোচনা অংশ তথ্যবহুল ও মনোজ্ঞ। তিনি ক্ষেত্রবিশেষে পূর্বসূরির সাথে যুক্তিতর্কসহ দ্বিমত পোষণ করেছেন।

পরিশিষ্টে 'বাংলার মুসলিম শাসকদের কালানুক্রম' ও 'বাংলার ইসলামি শিলালিপির তালিকা' শিরোনামে দুটি মূল্যবান তালিকা রয়েছে। দ্বিতীয় তালিকায় সুলতানি যুগ ও মুঘল যুগ মিলে সর্বমোট ৪২৪টি শিলালিপির উল্লেখ রয়েছে, যা পূর্বে প্রকাশিত ইংরেজি গ্রন্থে প্রদত্ত তালিকার চেয়ে অনেক বেশি।

গ্রন্থশেষে যথাবিহিত গ্রন্থপঞ্জি ও নির্ঘণ্ট রয়েছে। সুবিস্তৃত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ তালিকা লেখকের বহুলপাঠের ও জ্ঞানানুসন্ধিৎসার এবং নিবিড় নির্ঘন্ট নিষ্ঠার ও মনীষার স্বাক্ষর বহন করে।

গ্রন্থখানি পাঠ করে আমাদের মনে হয়েছে, শিলালিপির খুঁটিনাটি যাবতীয় বিষয় লেখকের নখদর্পণে। বাংলায় প্রবাদ আছে : "সাপের হাঁচি বেদেয় চিনে।", যার অর্থ- অভিজ্ঞ ব্যক্তি কোনো বিষয়ের অন্তর্গত মর্ম বুঝতে পারেন। গ্রন্থকার আরবি-ফারসি শিলালিপি দেখেই এর ভিতর-বাইরের অন্তর্নিহিত খবর বলে দিতে পারেন। এটি তাঁর নিষ্ঠার ও প্রজ্ঞার ফল, যা তিনি সারাজীবন সাধনা দ্বারা আয়ত্ত করেছেন। সুবৃহৎ এই গ্রন্থ পাঠ করে বিজ্ঞ পাঠকসমাজ একদিকে যেমন দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করবেন, অন্যদিকে তেমনি নির্মল আনন্দ ও বৌদ্ধিক সৌন্দর্য (intellectual beauty) উপভোগ করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। এরূপ জ্ঞানসমৃদ্ধ একখানি গ্রন্থ পাঠকসমাজকে উপহার দেওয়ার জন্য আমি গবেষক মুহম্মদ ইউসুফ সিদ্দিককে অশেষ ধন্যবাদ জানাই এবং গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

ওয়াকিল আহমদ*

* প্রাক্তন উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ